দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় সার্লীয় উদ্ভবতত্ত্ব

ও

তার বিকল্পের অনুসন্ধান

সৌতি বসু

পি এইচ ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

দর্শন বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

Certified that the Thesis entitled

‘দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় সার্লীয় উদ্ভবতত্ত্ব ও তার বিকল্পের অনুসন্ধান’

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Soumitra Basu, Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata – 700 032 and neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : ……………………………… ………………………………

Candidate

Dated : ………………………… Dated :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণাপত্রের শিরোনাম পৃষ্ঠায় গবেষক হিসেবে আমার নাম ছাপা হলেও, এই গবেষণার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কখনোই আমার একার নয়। এই কাজটি করার জন্য আমাকে অনেকেই সাহায্য করেছেন, তাদের ঋণ স্বীকার না করলে আমি অপরাধী হয়ে থাকব।

আমার এই কাজে আমায় সবথেকে বেশি সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সৌমিত্র বসু। তিনি আমার লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশোধন করে না দিলে এই গবেষণাপত্র জমা দেওয়া আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। শেফালীদি (অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্র) প্রতিনিয়ত আমাকে এই গবেষণা সম্পূর্ণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যখনই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছি, হাল ছেড়ে দিয়েছি, শেফালীদি কখনো আদর করে বুঝিয়ে, কখনো বা ভর্ৎসনা করে, আমার মনোবল ফিরিয়ে দিয়েছেন। শেফালীদিকে নতুন করে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই, আমি ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ; শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা— আমি এবং আমার মতো ওঁর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা যেন আরও অনেক বছর ওঁকে একইভাবে বিরক্ত করতে পারি, এবং উনি যেন সুস্থ শরীরে, হাসিমুখে আমাদের এই অত্যাচার সহ্য করে যেতে পারেন।

আমার এই গবেষণার মধ্য পর্যায়ে যখন আমি দিশা হারিয়ে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তখন মঞ্জরীদি (অধ্যাপিকা মঞ্জরী চক্রবর্তী) নিজের সময় ব্যয় করে দিনের পর দিন সামনে বসিয়ে আমায় নানা প্রবন্ধ বুঝিয়ে দিয়েছেন; ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এছাড়াও মৌসুমীদি (অধ্যাপিকা মৌসুমী গুহ) এবং রুবাইদি

(অধ্যাপিকা রুবাই সাহা) তথ্যসূচী তৈরীর ক্ষেত্রে আমার বিভিন্ন বিভ্রান্তি নিরসন করে আমার অশেষ উপকার করেছেন। মধুচ্ছন্দাদি (অধ্যাপিকা মধুচ্ছন্দা সেন) ধৈর্য ধরে আমার গবেষণার বিষয়টি শুনে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন।

আমার সহকর্মী ও বন্ধুরা আমার গবেষণার উপযোগী বিভিন্ন তথ্যের হদিশ দিয়েছেন এবং সেই সব তথ্যের উৎসও অনুসন্ধান করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয় বুঝতে যখনই আমার অসুবিধা হয়েছে, আমি তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছি, এবং তাঁরা কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে আমার মতো বিজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ছোট্ট তিতির যেভাবে শারীরবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয় অনুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং সেই বিষয়ক তথ্য খুঁজতে সাহায্য করেছে, তার জন্য আমি ওর কাছে ঋণী।

সবশেষে, আমার পরিবারের কাছে আমি চিরঋণী। সবসময় আমার পাশে থেকে, দৈনন্দিন জীবনের বাধা-বিপত্তি থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখে, তাঁরা আমায় একনিষ্ঠভাবে লেখাপড়া করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমার এই গবেষণা কখনোই সম্ভব হত না।

সৌতি বসু

জানুয়ারি, ২০২১

সূচীপত্র

ভূমিকা	এক-উনিশ
প্রথম অধ্যায়	১-৭৪
দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৭৫-১২২
দেহ-মনের সমস্যা : জন সার্ল	
তৃতীয় অধ্যায়	১২৩-১৭৪
সার্লের তত্ত্বের সমালোচনা	
চতুর্থ অধ্যায়	১৭৫-২১৪
উদ্ভবতত্ত্ব ও সার্ল	
পঞ্চম অধ্যায়	২১৫-২৬২
বিকল্প উদ্ভবতত্ত্বের অনুসন্ধান	
উপসংহার	২৬৩-৩০৪
গ্রন্থপঞ্জী	৩০৫-৩১৩

ভূমিকা

বিজ্ঞানের পরিসরে থেকে দেহ-মনের সম্বন্ধকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। মনোদর্শনের জগতে এই বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এই সম্বন্ধকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। একটি জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে মনোদর্শনের জগতে তা থেকেই গেছে। দেহ-মনের সম্বন্ধ সমস্যায় রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম মূল কারণ হল, মনের প্রকৃতি বিষয়ে দ্বন্দ্ব। সম্বন্ধ সবসময়ই নির্ভর করে তার সম্বন্ধীদের উপর; কারণ, সম্বন্ধীদের প্রকৃতি সম্বন্ধের প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য তাই সম্বন্ধীদের প্রকৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেহ ও মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য মন বিষয়ক আলোচনাও তাই আবশ্যিক।

মনোদর্শনের জগতে মনকে নানাভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন চিন্তার আগমন ঘটছে। দর্শনেরই বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তর্বিষয়ক (interdisciplinary) গবেষণাও আধুনিককালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শনও মনকে বা আত্মাকে তাদের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের জগতেও অস্তিবাদী দর্শন (existentialism) বা প্রতিভাসবিজ্ঞান (phenomenology) তাদের নিজের নিজের মতো করে মনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকটি তত্ত্বের গুরুত্বই দর্শনের জগতে অপরিসীম। কিন্তু এই গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই আলোচনাকে সীমায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলধারার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ, বিজ্ঞান যেসব নীতি মেনে চলে, যে ধরনের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রূপে স্বীকার করে, সেই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যেই আলোচনাকে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। দার্শনিক জন সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেই দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সার্লের তত্ত্বকে সামনে রেখেই আমরা দেহ-মনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। বৈজ্ঞানিক নীতিগুলো রক্ষা করে মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে সার্ল দাবী করেছেন। তিনি তাঁর এই প্রচেষ্টায় কতখানি সফল হয়েছেন বা তাঁর ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে নতুনভাবে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, তা দেখাই এই গবেষণার লক্ষ্য। মন, যা স্বাভাবিকভাবেই দেহ থেকে ভিন্নধর্মীরূপে প্রতীয়মান হয়, তা দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে কিনা, দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য মনের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব কিনা, মনকে জড় জগতে পর্যবসিত না করেও দেহ-মনের সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কিনা, — এইরকম নানা প্রশ্নের উত্তর আমরা এখানে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মন বিষয়ক আলোচনা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভারতীয় দর্শনের মতো, পাশ্চাত্য দর্শনের আদি যুগে কিন্তু মন আর আত্মার মধ্যে কোনো ভেদ করা হয়নি। আত্মা ও মন সেখানে এক অর্থেই গৃহীত হয়েছে। পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে মন বা আত্মার ধারণা সম্ভবতঃ প্রথম আসে প্রাক্‌সক্রেটীয় 'nous'-এর ধারণা থেকে। পরবর্তীকালে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনে আত্মা বিষয়ক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। প্লেটোর মতে, আত্মা হল স্বয়ং গতিশীল।

অস্তিত্বশীল জগতে আত্মা হল একমাত্র বস্তু যা সঠিক অর্থে বুদ্ধির অধিকারী, যদিও তা ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের মতো প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়।

প্লেটো আত্মাকে আধ্যাত্মিক সত্তা রূপে গণ্য করেছিলেন। ফিডো গ্রন্থে (*Pheado*) তিনি আত্মার অমরত্বের কথা স্বীকার করেছেন, একইসঙ্গে সক্রেটিসের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, দেহ বিযুক্ত আত্মায় বুদ্ধি থাকে, তাই সে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। দেহ বিযুক্ত আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিনা,— এই প্রশ্ন চিরকালীন। কিন্তু এই আশঙ্কা যে নিতান্তই অমূলক, তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্লেটো দুধরনের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন,— (১) প্রত্যক্ষযোগ্য (perceptible) বস্তু যা অংশ সহযোগে সৃষ্ট এবং অংশ বিয়োগে যার ধ্বংস অনিবার্য। (২) অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু যা কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারা গৃহীত হতে পারে এবং যার অংশ নেই, তাই অংশ বিয়োগে ধ্বংসের সম্ভাবনাও নেই। এই দুটি প্রকার যে পরস্পর বর্জনকারী (mutually exclusive) তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিভাজনের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয় যে, প্লেটো দেহ বা জড় জগত ও আত্মার মধ্যে কী ধরনের ভেদ স্বীকার করতেন। দেহ বা জড়বস্তুমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এবং ধ্বংসশীল; কিন্তু আত্মা কোনোভাবেই তা নয়। প্লেটোর মতে, আত্মা যা বিশুদ্ধ বুদ্ধিশীল তা কোনোভাবেই দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, তা দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেহ নশ্বর হলেও আত্মা অবিনশ্বর। জীবদ্দশায় আত্মা দেহের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে। দেহের মৃত্যু হলে আত্মা দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। প্লেটোর এই চিন্তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি জগতে দুটি মৌলিক বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন,-- দেহ (জড়) আর আত্মা (অজড়)।

প্লেটো মনে করতেন, জৈবিক দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটায় আত্মা। অর্থাৎ আত্মার প্রবেশের ফলেই দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়; আবার আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হলে দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু আত্মা অবিচল থাকে। একইসঙ্গে প্লেটো মানতেন যে, দেহের বিভিন্ন কার্যকারিতার জন্য আত্মাই দায়ী। এখন, প্লেটো যদি স্বীকার করেন যে, জীবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জনক হল আত্মা, তাহলে এর থেকে অবশ্যই প্রতিপাদিত হয় যে, প্লেটো মনে করতেন, আমাদের আবেগ, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার মতো মানস দশাগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত দ্রব্য কখনোই জড় পদার্থ হতে পারে না, কারণ প্লেটোর মতে, দ্রব্যমাত্রই নিত্য আর জড় বস্তু যেহেতু উৎপত্তি-বিনাশশীল, তা কখনোই নিত্য হতে পারে না। এই কারণেই প্লেটো জড়বস্তুকে কোনোভাবেই দ্রব্যের মর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন না। প্লেটো ধারণাকেই (Forms) প্রকৃত সত্তাবান বলে মনে করেছেন, আর এই জগতের যাবতীয় বস্তুকে ধারণার অপূর্ণ অনুকরণমাত্র বলে মনে করেছেন। এই প্রকৃত সত্তাবান ধারণাগুলি যে কেবলমাত্র এই জগতকে সম্ভব করে তুলেছে, তাই নয়, এই জগতকে বোধগম্য (intelligible) করে তুলেছে, কারণ, এই ধারণাগুলি জাতির ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই প্লেটো ধারণাকে সামান্য বা 'universal' হিসেবে গণ্য করেছেন। ধারণার সঙ্গে বোধগম্যতার এই সম্বন্ধই মনোদর্শনের জন্য প্রাসঙ্গিক। এই জগতের যেকোনো বিষয়কে বোঝার জন্য ধারণার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ যেকোনো বিষয়কে বোঝার অর্থই হল, ধারণাকে জানা। প্লেটো আত্মাকে (soul) অমর বলে গণ্য করেছিলেন। আত্মার অমরত্ব

সিদ্ধ করার জন্য তিনি একাধিক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধিকে তিনি অজড় বলে গণ্য করতেন। ধারণাও অজড়। ধারণার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ অনস্বীকার্য, কারণ বুদ্ধি দিয়েই একমাত্র ধারণাকে জানা যায়। দেহ পিঞ্জরে আত্মা আবদ্ধ হয়ে থাকলেও প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, আত্মা সবসময়ই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে ধারণার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। দেহ ও আত্মার এই দূরত্ব ও বিভাজন প্লেটোর দর্শনে দ্বৈতবাদের ছাপকে স্পষ্ট করে। তবে, প্লেটোর এই দ্বৈতবাদী তত্ত্বে সমস্যা হল, যদিও আত্মাকে তিনি দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ বলে মনে করতেন কিন্তু, জড়দেহে অজড় আত্মা কীভাবে আবদ্ধ হতে পারে, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি।

প্লেটোর পর অ্যারিস্টটল তাঁর *De Anima* গ্রন্থে আত্মা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আত্মা হল প্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া। জীবদেহের আকারগত কারণ হিসেবে অ্যারিস্টটল আত্মা স্বীকার করেছিলেন। আত্মা হল দেহের আকার, তার চালিকাশক্তি এবং তার লক্ষ্য। অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুসারে, জৈবিক দেহে পরিবর্তনের কারণ হল আত্মা। আত্মাই জৈবিক দেহের এমন এক প্রকৃতি যা দেহের যাবতীয় গতিপ্রকৃতির নীতিনির্ধারক। অ্যারিস্টটলের কাছে, দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, আবার অভিন্নও নয়। তিনি আকার (form) ও উপাদানের (matter) ভেদ স্বীকার করা সত্ত্বেও যেমন মনে করেছেন যে আকারবিহীন উপাদান এবং উপাদানবিহীন আকার বাস্তবে থাকতে পারে না, তেমনি দেহ ও মনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একটি জৈবিক দেহে যে ক্রিয়াগুলি সাধারণভাবে ঘটে থাকে, যেমন পাচনক্রিয়া বা পুষ্টি, চলন বা গতি, চিন্তা বা অন্যান্য মানস প্রক্রিয়া প্রভৃতি

যখন ঘটে, তখন সেগুলি অবশ্যই দেহের সঙ্গে আত্মা যুক্ত থাকার কারণেই ঘটে। কিন্তু অ্যারিস্টটল কখনোই দেহ এবং আত্মাকে অভিন্ন বলেননি। এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত। যদিও আত্মার ক্রিয়াশীলতা জৈবিক দেহ ব্যতিরেকে সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন। এদিক থেকে দেখলে তিনি প্লেটোর বিরোধী মতই পোষণ করতেন।

প্লেটো মন বা আত্মাকে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে করেছিলেন, যদিও একইসঙ্গে তিনি মানতেন যে, আত্মাযুক্ত হলেই জড় দেহ প্রাণ পায়, জীবনীশক্তি পায় এবং আত্মা বিযুক্ত দেহ মৃত জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। চিন্তা বা যৌক্তিকতাকে প্লেটো আত্মার গুণ বলে মনে করতেন। প্লেটোর মতে, এই গুণগুলি কোনোভাবে দৈহিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। অ্যারিস্টটল আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করলেও, চিন্তনশক্তি যে অনেকাংশেই ইন্দ্রিয়জ তথ্যনির্ভর (sensory image), তা অ্যারিস্টটল স্বীকার করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের মন সংক্রান্ত আলোচনা থেকে মনে হয়, তিনি দেহে অধিষ্ঠিত মনকে জৈবিক প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের এই মত আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে অনেকবেশী সাজুয্যপূর্ণ বলে মনে হয়। প্লেটোর মত অনুসরণ করে সম্পূর্ণ বিদেহী, অতীন্দ্রিয়, দেহাতিরিক্ত সত্তার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয় না। যদিও অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব দেহ ও মনকে অনেকবেশী কাছাকাছি এনেছে। মনকে জৈবিক প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে দেখলে দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা হয় কিনা তা ভেবে দেখা যেতেই পারে।

আধুনিক যুগে এসে ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্তের আধিবিদ্যক আলোচনায় মন বিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর ব্যতীত, দেকার্ত জড় ও মন নামক দুটি দ্রব্য স্বীকার করেছিলেন। জড় ও মনকে তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আধার রূপে গণ্য করেছিলেন। জড়ের বিস্তৃতি আছে, মনের চেতনা আছে। দেকার্ত মনে করেছিলেন, জড় পদার্থ কখনো চেতন হতে পারে না, আর মন বিস্তৃতিযুক্ত হতে পারে না। দেকার্তের এই তত্ত্বই দেহ-মনের দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। দেহ ও মনের মধ্যে এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই দুটি বিষয় যে, মানুষের ক্ষেত্রে সহাবস্থানে থাকে, তা তিনি অস্বীকার করেননি। মানবজীবনে দেহ ও মনের মধ্যে একটা যোগাযোগের অনুভব হয় তাও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাই, জড় ও মনের মধ্যে বিরুদ্ধতা স্বীকার করেও তিনি তাদের মধ্যে উভয়মুখী কার্যকারণ সম্বন্ধের কথা বলেছিলেন। দুটি বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট দ্রব্য কীভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যুক্ত হতে পারে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। দেকার্তের এই তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, কার্তেসীয় দর্শনের অনুগামীরা দেকার্তের তত্ত্বকে অন্যভাবে বাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। দেহ-মনের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার না করে তাঁরা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দৈহিক দশা ও মানস দশার পারস্পরিক সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এই তত্ত্ব উপলক্ষবাদ বা occasionalism নামে পরিচিত। যদিও এই অলৌকিক সমাধান দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি।

দার্শনিক জন সার্ল (John Searle) দেহ-মনের সম্বন্ধকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। মনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে তিনি দেহ-মনের

সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সার্লের আগেও দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার নানা প্রচেষ্টা হয়েছে। সার্ল লক্ষ করেছেন যে, এইসব তত্ত্বগুলিতে হয় দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, অথবা মনের স্বাতন্ত্র্যকেই অস্বীকার করা হয়েছে। দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সার্ল কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা যেমন মানতে রাজী নন, তেমনি মনের স্বাতন্ত্র্যকেও তিনি অস্বীকার করতে চান না। বিজ্ঞান মনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে চায় না। মনকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিধির বাইরে রাখতে চায়। কিন্তু, সার্ল মনে করেন, বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেও, মনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও, দেহ-মনের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা সম্ভব। এখন, সার্লের এই ব্যাখ্যা কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আমরা বিচার করে দেখব। এবং তাঁর তত্ত্বের অপূর্ণতা পূরণ করে বিকল্প একটি ব্যাখ্যার অনুসন্ধানই এই গবেষণার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে।

মন বিষয়ক আলোচনা দর্শনের জগতে সুপ্রাচীন হলেও, দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা ব্যাপকভাবে সর্বপ্রথম রেনে দেকার্তের (Rene Descartes) দর্শনেই দেখতে পাওয়া যায়। দেকার্তের সময় এবং তার পরবর্তীকালে এই সম্বন্ধকে ব্যাখ্যার নানা প্রচেষ্টা হয়েছে। বিগত চারশো বছর ধরে বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে তা অগ্রসর হয়েছে। এই চারশো বছরে মনোদর্শনের জগতে দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক যেসব তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে সেগুলি সংক্ষেপে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস আমার চর্চার বিষয় নয়। শুধুমাত্র সমস্যাটির প্রেক্ষিত এবং বর্তমান অবস্থানটি সুস্পষ্ট করাই আমার লক্ষ্য। দার্শনিক জন সার্লের (John Searle) তত্ত্বকে

সামনে রেখেই আলোচনা করা হয়েছে। সার্ল এইসব তত্ত্বগুলিকে যেভাবে বুঝেছেন এবং সার্লীয় প্রেক্ষিত থেকে যেভাবে তাদের সমালোচনা করেছেন, তাও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সার্ল যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাঁর তত্ত্বের প্রস্তাবনাও করেছেন, তা বুঝে নেওয়াই এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য।

দেকার্ত দেহ ও মনকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, যা জড় (দেহ) তা কখনো চেতন নয়, আর যা চেতন (অজড়) তা জড় নয়। অথচ, এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি তাদের মধ্যে উভয়মুখী কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেছিলেন। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মী দুটি দ্রব্যের মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ কীভাবে সংগঠিত হয়, তা যদিও তিনি ব্যাখ্যা করেননি। স্বাভাবিকভাবেই দেকার্তের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ দার্শনিকরা কার্তেসীয় সমস্যাকে এড়ানোর জন্য দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকারই করলেন না, বরং মনে করলেন যে দৈহিক দশা ও মানস দশা পরস্পর সমান্তরালভাবে চলে। উপবস্তুবাদীরাও জড় জগত অতিরিক্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন অর্থাৎ উপবস্তুবাদীরাও দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজের মতো দ্বৈতবাদেরই সমর্থক, কিন্তু তাঁরা মানস দশাকে উপবস্তু হিসেবে গণ্য করেন, মানস দশার কোনো কারণিক ভূমিকাই তাঁরা স্বীকার করেন না। আবার, আধুনিক যুগের অনেক বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক দেহ-মনের সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করে ফেললেন। তাঁরা জড়বাদী। তাই মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকার করতে চাইলেন না। মনকে তাঁরা জড়দেহে পর্যবসিত করলেন। জড়দেহের অতিরিক্ত যদি কোনো মন নাই থাকে, তাহলে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার

কোনো প্রসঙ্গই থাকে না। জড়বাদী তত্ত্ব আবার নানারকম। যেমন, আচরণবাদ (behaviourism)। এই তত্ত্ব মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকার করে না। মানব আচরণের অতিরিক্ত কোনো মানস জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলেই আচরণবাদীরা মানতে চান না। দেহ-মনের অভেদতত্ত্ব বা অভিন্নতাতত্ত্ব (identity theory) অবশ্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু মনকে সেখানে দেহের সঙ্গে অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে করা হয়। ক্রিয়াবাদীরা (functionalism) আবার মনকে মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন না করে মস্তিষ্ক দশার দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হয়, তার সঙ্গে অভিন্ন

বলে মনে করেছেন। প্রত্যেকটি জড়বাদী তত্ত্বই নিজের নিজের মতো করে মনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে, যদিও প্রত্যেকটি তত্ত্বেই মন জড় জগতে পর্যবসিত হয়েছে। মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করে, দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ, কারণিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করা আবশ্যিক। মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতাও স্বীকার করা সম্ভব নয়।

দার্শনিক জন সার্ল (John Searle) এই সব তত্ত্বগুলির সমস্যাকে এড়িয়ে দেহ ও মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সার্লের তত্ত্বটি বিশদে আলোচিত হয়েছে। সার্লের মতে, দেহ-মনের সমস্যার মূল কারণ হল, কার্তেসীয় দ্বৈতবাদী চিন্তা। দ্বৈতবাদী হোক, বা জড়বাদী, সব তত্ত্বই কার্তেসীয় দেহ ও মনের বিরুদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকেই মেনে চলে বলে তিনি মনে করেন। সার্লের মতে, দ্বৈতবাদ বা জড়বাদের বক্তব্য বিষয়গুলি সর্বাংশে সঠিক নয়, আবার, সম্পূর্ণ ভ্রান্তও নয়। সার্ল তাই তত্ত্বগুলির সঠিক

অংশগুলি গ্রহণের এবং ভ্রান্ত অংশগুলি বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। দ্বৈতবাদ যখন বলে যে, চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তখন দ্বৈতবাদ সঠিক কথাই বলে। কিন্তু দেহাতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্বের যে দাবী দ্বৈতবাদ করে, তা সার্লের মতে সঠিক নয়। আবার, জড়বাদ যখন চেতনাকে জড় জগতে পর্যবসিত করতে চায়, তার ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity) বা বিষয়মুখিনতার (intentionality) মতো গুণগুলিকে অস্বীকার করতে চায়, তখন সার্ল তাকে সঠিক বলেন না। কিন্তু জড়বাদ যখন চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে দাবী করে, তখন সার্ল তা সমর্থন করেন। এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তিনি একটি মধ্যবর্তী পথ খুঁজে বের করার কথা ভেবেছিলেন। চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভবের দিকটিকে তিনি অস্বীকার করতে চাননি। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা সম্ভব বলেও মনে করেছেন। তাই, এ প্রসঙ্গে তিনি দুধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন,— উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী। সার্ল মনে করেছেন, প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও, চেতনাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়, যেহেতু চেতনার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কারণ চেতনার এমন কিছু গুণ আছে (ব্যক্তিনিষ্ঠতা প্রভৃতি) যা কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়, তাই চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার্য নয়। কিন্তু চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় এবং স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণিক ভূমিকার অতিরিক্ত চেতনার কোনো কারণিক ভূমিকা থাকতে পারে না। অর্থাৎ, চেতনা কারণিক দিক থেকে তার উপাদান কারণের কার্যক্ষমতায় পর্যাবসানযোগ্য। সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন না,

কিন্তু মানস কারণতা সম্ভব বলে দাবী করেন, যদিও তার এই দাবী কতখানি ন্যায্য তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ। সার্ল চেতনাকে একটি জৈবিক

প্রক্রিয়া রূপে দেখতে চেয়েছেন। অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখিয়ে সার্ল দেহ ও মনের দূরত্বকে কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে তাঁর এই তত্ত্বকে তিনি 'biological naturalism' আখ্যা দিয়েছেন।

সার্ল সত্তাগত স্তরে চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী করেন। চেতনাকে জৈবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাতে চান। একইসঙ্গে তিনি দুধরনের ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদ সমর্থনের আপত্তি ওঠে। ধর্মদ্বৈতবাদীরা এ জগতে দুটি ভিন্ন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও, দুটি ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে ঐ দুটি ধর্মের কোনো ধর্মই অন্য ধর্মে পর্যাবসানযোগ্য নয়। সার্ল মনে করেন, ধর্মদ্বৈতবাদ দুটি দ্রব্য স্বীকার না করলেও, যেহেতু দুটি স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাই এই তত্ত্ব কোনোভাবেই দ্বৈতবাদের সমস্যাকে এড়াতে পারে না। সেজন্যই তিনি ধর্মদ্বৈতবাদকে কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন না। সার্লের মতে, ধর্মদ্বৈতবাদ সবসময়ই দুটি ধর্মের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করে। কিন্তু তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন না, তাই তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি যথাযথ নয়।

সার্ল যদি চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার না করেন, এবং সেই কারণে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে, ধর্মদ্বৈতবাদ সমর্থনের আপত্তি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলেও উপবস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ওঠে, তা থেকে

তিনি মুক্ত হতে পারবেন না। চেতনার স্বতন্ত্র অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার না করে তিনি কীভাবে চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন— এই প্রশ্ন থেকেই যাবে। যদিও সার্ল মনে করেন যে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বতন্ত্র অর্থক্রিয়াকারিত্বের প্রকাশক নয়। কোনো বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে মানেই যে, তার স্বতন্ত্র কার্যোৎপাদন সামর্থ্য থাকবে, এমন নাও হতে পারে।

সার্ল যদি চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার না করেন, তাহলে তিনি মানস কারণতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? দেহ-মনের সম্বন্ধকেই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সার্ল মনে করেন, প্রথাগত দ্বৈতবাদী চিন্তাধারা বর্জন করতে পারলেই তা করা সম্ভব। তাঁর মতে, যখন আমি হাত তুলি, তখন আমার এই ইচ্ছা কিন্তু স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয়, বরং সমগ্র মস্তিষ্কতন্ত্রের এটি একটি উচ্চস্তরীয় বর্ণনামাত্র। ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভব আর স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে তিনি মস্তিষ্কতন্ত্রের দুটি ভিন্নস্তরীয় বর্ণনারূপে গণ্য করেছেন। প্রশ্ন ওঠে যে, চেতনাকে কেবলমাত্র বর্ণনার স্তরে স্বীকার করে তিনি কি স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারেন? স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত চেতনার যদি স্বতন্ত্র কার্যোৎপাদন সামর্থ্য না থাকে, তাহলে মানস কারণতা ব্যাখ্যাত হয়েছে বলে কি তিনি সঙ্গতভাবে দাবী করতে পারেন? সার্লের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই ধরনের বিভিন্ন আপত্তিগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সার্ল চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন একটি ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চেতনায় তিনি এমন কিছু গুণের উপস্থিতি স্বীকার করেছেন, যা স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে অনুপস্থিত। সার্লের এই

বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে তিনি চেতনার উৎপত্তিকে সাধারণ উৎপত্তি হিসেবে গণ্য করেননি।

দর্শনের জগতে উৎপত্তিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। উৎপত্তি লাভ করা বস্তুটির ধর্মটি যদি তার উৎপত্তির পূর্বেই তার মূলগত জড় উপাদান স্তরের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য হয়, এবং তার ভিত্তিতে পূর্বাভাসযোগ্য হয়, তাহলে সেইসব ধর্মকে পরিণামমূলক (resultant) ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, যদি কোনো ধর্ম অভিনব বা নতুন হয় অর্থাৎ, কোনোভাবেই তার উৎপত্তির পূর্বে পূর্বাভাসযোগ্য না হয়, এবং মূলগত স্তরের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্যও না হয় তাহলে সেইসব ধর্ম উদ্ভূত ধর্মরূপে (emergent property) চিহ্নিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ভূত ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং সার্লের তত্ত্বে উদ্ভবের ধারণার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সার্ল যখন চেতনার ক্ষেত্রে তার মূলগত স্তরের ধর্মের অতিরিক্ত ধর্মের কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি চেতনাকে উদ্ভূত ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। সার্ল নিজেও উদ্ভবতত্ত্ব সমর্থনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি দুধরনের উদ্ভূত ধর্মের কথা বলেছেন,-- (১) Emergent 1 এবং (২) Emergent 2। Emergent 1 বলতে তিনি সেইসব ধর্মকে বুঝেছেন যেগুলি উদ্ভূত হলেও তাদের নিম্নস্তরীয় উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য অর্থাৎ, নতুন উদ্ভূত ধর্মটিতে তার নিম্নস্তরীয় উপাদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নস্তরীয় উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (causal interaction) ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য। কাঠিন্য বা তরলতার মতো ধর্মগুলোকে তিনি ‘emergent 1’ রূপে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে,

'emergent 2' বলতে তিনি এমন ধর্মকে বুঝেছেন, যে ধর্ম তার নিম্নস্তরীয় উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। তাঁর মতে, কোনো ধর্মই এই জগতে 'emergent 2' হতে পারে না। চেতনাও সেই কারণে তাঁর মতে 'emergent 1', কখনোই তিনি চেতনাকে 'emergent 2' হিসেবে গণ্য করতে রাজী নন, যেহেতু কোনো ধর্মই তাঁর মতে সম্পূর্ণ অভিনব (novel) বা পূর্বাভাস অযোগ্য হতে পারে না। কারণিক দিক থেকে উদ্ভূত ধর্ম সবসময়ই তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। ফলে, সার্লের পক্ষে চেতনার কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করাই স্বাভাবিক।

সার্ল উদ্ভূত ধর্ম স্বীকার করলেও, উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন না। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে, তিনি উদ্ভবের ধারণা স্বীকার করলেও, তাকে সীমিত অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করলেন না, তাই চেতনাকে 'emergent 2' বলেও গণ্য করলেন না। সেই কারণে সার্ল নিম্নমুখী কারণতা (downward causation) দেখাতেও ব্যর্থ হলেন। সার্লের তত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যা ও অপূর্ণতাগুলি দূর করে দেহ-মনের সম্বন্ধকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করাই যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, তাই সেই প্রচেষ্টায় সফল হবার জন্য আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্ল পপারের (Karl Popper) তত্ত্ব থেকে কিছু সাহায্য নিয়েছি। পপারের তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে কীভাবে সার্লের তত্ত্বের ত্রুটিগুলিকে পূরণ করা যায়, তা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করব। সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ক্ষমতা স্বীকার করতে চাননি কারণ, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি মেনে, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণবাদী চিন্তার

গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে এই জগতের সব বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু, বাস্তবে পদার্থবিজ্ঞান এই জগতের সব বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। পদার্থবিজ্ঞানকে সার্ল স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য করলেও, প্রকৃতপক্ষে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রশ্নাতীত নয়। পদার্থবিজ্ঞান যদি এই জগতের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ না হয়, তাহলে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতায় আর ভরসা রাখা যায় না। তাকে আদর্শ মেনে চলারও কোনো অর্থ হয় না। তাই পদার্থবিজ্ঞানের পরিবর্তে জীববিজ্ঞানকে আদর্শ মেনে উদ্ভবের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা, তা দেখা যেতে পারে। পপারের তত্ত্বেও আমরা এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই। পপার, ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের সাহায্যে উদ্ভবের ধারণাকে বুঝতে চেয়েছেন। এই জগতে বিবর্তনের ধারায় এমন অনেক বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে, যা তার উপাদান কারণে পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। যেমন, জড় জগত থেকে একদিন হঠাৎ একটি প্রাণের আবির্ভাব হল। পপারের মতে, এটি অবশ্যই একটি উদ্ভবের দৃষ্টান্ত কারণ, উৎপত্তির পূর্বে প্রাণ তার জড় উপাদান কারণে কোনোভাবেই পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। চেতনাকেও পপার উদ্ভবের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করেছেন কারণ, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে চেতনার উদ্ভব হলেও তা কোনোভাবেই উৎপত্তির পূর্বে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। পপারের মতে, চেতনা মস্তিষ্ক দশায় পর্যাবসানযোগ্যও নয়।

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে নিম্নমুখী কারণতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হলেও, জীববিজ্ঞানের সাহায্যে হয়তো তা করা যেতে পারে। পপারের তত্ত্বে দেখা যায় যে, তিনি জীব জগতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে নিম্নমুখী কারণতাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বে মনে করা হয় যে, জীবদেহ যেসব জিন বা

ডি.এন.এ দিয়ে গঠিত, সেই জিন বা ডি.এন.এ-র দ্বারাই জীবদেহের যাবতীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পপারের তত্ত্বে আমরা দেখতে পাই যে, পপার মনে করেছেন, জীবদেহ মূলতঃ তার জিন বা ডি.এন.এ-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কখনো কখনো জীবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তার যে জৈবিক চাহিদা গড়ে ওঠে, সেগুলিও আবার তার জিনের বা ডি.এন.এ-র গঠন পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

আমরা দেখতে পাই, পপার স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চেতনার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কীভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে,— এই প্রশ্ন দেকার্তের বিরুদ্ধেও উঠেছিল। পপারের বিরুদ্ধেও সেই একই প্রশ্ন যে উঠবে, সে বিষয়ে পপার সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই, তিনি দেহ আর মনের মধ্যে এমন একটি যোগসূত্রস্থাপনকারী মাধ্যমের খোঁজ করার চেষ্টা করেছেন যা বিজ্ঞানসম্মতও হবে, আবার একইসঙ্গে দেহ ও মনকে কাছাকাছি আনতেও সাহায্য করবে। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে দেহ ও মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার এই প্রচেষ্টা আমাদের জন্য উপযোগী হতে পারে বলেই মনে হয়।

দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার পথে প্রধান অন্তরায় হল, তাদের চারিত্রিক বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতাকে দূর করতে না পারলে দেহ-মনের সম্বন্ধকে কোনোদিনই সফলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। সার্ল কার্তেসীয় দ্বিকোটিক বিভাজনের চিন্তাকেই এর জন্য দায়ী করেছিলেন। পপারও এদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কমানোর চেষ্টা করেছেন। দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে হলে, আমাদের ভাবতে হবে যে, কার্তেসীয় চিন্তা

থেকে মুক্ত হয়ে কি একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যায় না? জড় আর চেতনের যে দ্বিকোটিক বিভাজন দেকার্ত স্বীকার করেছিলেন, তা থেকে মুক্ত হয়ে, দেহ আর মনকে কি অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়? সাদা-কালোতে কি সত্যিই জগতকে ভাগ করা যায়? বাস্তব জগতে তো ধূসর বস্তুর সংখ্যাই বেশী। এমন কোনো ধূসর এলাকা কি আমরা চেষ্টা করলে খুঁজে পাবো না, যা দেহ ও মনের যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম?

চেতনাকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ বিজ্ঞান তার স্বীকৃত নীতিগুলিকে রক্ষা করেই তা করতে চেয়েছে। কাঁটা চামচ (fork) দিয়ে জল খেতে গেলে আমাদের যে অবস্থা হবে, চেতনাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানেরও সেই পরিণামই হয়েছে। কার্তেসীয় নীতি মেনে বিজ্ঞান চেতনাকে জড় জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং বিরুদ্ধ একটি বিষয়রূপে গণ্য করে জড় জগতের নিয়ম দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। ফলতঃ খুব স্বাভাবিকভাবেই সফল হতে পারেনি। সুতরাং, এক্ষেত্রে আমাদের মানতে হবে যে, আমাদের এই চিন্তায় কোথাও গলদ থেকে যাচ্ছে। চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে, তাকে জড় জগতে পর্যবসিত করে দিলে, সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে, বিজ্ঞানের হয়তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অন্ততঃ আপাত অর্থে হচ্ছে না, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয় যেমন, নৈতিকতা (morality) বা সৃজনশীলতার (creativity) মতো বিষয়গুলি অব্যাখ্যাতই থেকে যাচ্ছে। অথচ এগুলি কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে, তার কোনো উত্তরও বিজ্ঞান দিতে পারছে না। এই জগতের সবই যদি নিছক যান্ত্রিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়, তাহলে যন্ত্রের কাজের যেমন নৈতিক মূল্যায়ন হয় না, তেমনি মানুষের কোনো কাজেরও নৈতিক বিচার করা সম্ভব হয় না,

মানুষের কোনো কাজকেই আর ভালো বা মন্দ বলা যাবে না। আর সব কাজ যদি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয়, তাহলে নতুন সৃষ্টি বা অভিনবত্বের কোনো প্রসঙ্গই থাকতে পারে না। ফলে, সৃজনশীলতা অর্থহীন হয়ে যায়।

জলকে কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া যায় না বলে যেমন জল খাওয়া ছেড়ে দেবার কোনো অর্থ হয় না, বরং জল খাওয়ার অন্য উপায় খুঁজতে হয়, তেমনি চেতনাকে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত উপায় বা অনুসারী নীতিও বিজ্ঞানকে অনুসন্ধান করতে হবে। বিজ্ঞান কেবলমাত্র জড় জগত নিয়েই কাজ করে বলে, মন তার গন্ডীর বাইরে স্থান পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সব প্রাকৃতিক বিষয়কেই নিজের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। চেতনাকে যদি প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলেই তাকে আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীভুক্ত করতে কোনো বাধা থাকবে না। আর কোনো বিষয় অজড় হলেই যে অপ্রাকৃতিক হবে, এমন তো নাও হতে পারে। চেতনাকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, তাকে বিজ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা, তা এই গবেষণাপত্রে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গ্রীকযুগে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শনে দেহ-মন বা জড় ও আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায়নি। যদিও তাঁরা এই দুটি বিষয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেছিলেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে মনে হতে পারে যে, এই দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায়ই বা কী আছে। কিন্তু মনোদর্শনের জগতে সব দার্শনিকই যে এই দুটি বিষয়কে মৌলিক সত্তারূপে গণ্য করেছেন, এমন নয়। এ প্রসঙ্গে, দার্শনিক আলোচনা মূলতঃ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে বলা যায়,— (১) দ্বৈতবাদ ও (২) অদ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদী তত্ত্বে জগতকে দুটি মৌলিক তত্ত্বে বিভক্ত করা হয় এবং সেই দুটি মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই জাগতিক সব বৈচিত্র্য ব্যাখ্যাত হয়। অন্যদিকে, অদ্বৈতবাদে একটি মাত্র তত্ত্বের ভিত্তিতেই জাগতিক সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অদ্বৈতবাদ আবার দুধরনের হতে পারে — জড়বাদ এবং ভাববাদ। যে তত্ত্ব কেবলমাত্র জড় জগতের অস্তিত্বই স্বীকার করে, তা জড়বাদ নামে স্বীকৃত। অন্যদিকে, ভাববাদ এই জগতের সব বস্তুকেই মনযুক্ত বলে মনে করে। এই তত্ত্ব অনুসারে কোনোকিছুই বিশুদ্ধ জড় হতে পারে না। প্লেটো, আত্মা এবং জড় — দুটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন বলে প্লেটোর তত্ত্বকে দ্বৈতবাদী তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে, অ্যারিস্টটলের মত

দ্বৈতবাদী হলেও তা বোধহয় অদ্বৈত জড়বাদী চিন্তারই সূচক। পরবর্তীকালের বিভিন্নপ্রকার মনোদার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে দেখা যাক, সেখানে দেহ-মনের সম্বন্ধ কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'দ্বৈতবাদ' বা 'dualism' শব্দটি দর্শনের জগতে একটি বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে, দ্বৈতবাদে মনে করা হয়, কোনো একটি জগতে মূলগতভাবে দুধরনের বস্তু আছে। এই মতবাদ দুটি মৌলিক তত্ত্বে জগতকে ভাগ করে ফেলে এবং তার সাহায্যেই জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। জড় তত্ত্ব আর চেতন তত্ত্ব। মূলগতভাবে দ্বৈতবাদ দু-রকমের হতে পারে — দ্রব্যদ্বৈতবাদ ও ধর্মদ্বৈতবাদ।

প্লেটোর তত্ত্ব যে দ্রব্যদ্বৈতবাদের একটি প্রকার তা *'Phaedo'*-র বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্লেটো আত্মার (soul) অমরত্ব স্বীকার করতেন এবং মনে করতেন যে, মানব দেহের জীবদ্দশায় আত্মা দেহে আবদ্ধ থাকে; পরে তা দেহ বিযুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে এবং আবার অন্য দেহে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, অ্যারিস্টটলের বক্তব্য দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। দেহের কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতা ব্যতিরেকে আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না — অ্যারিস্টটলের এই মত অদ্বৈতবাদী বলেই মনে হয়, কিন্তু একইসঙ্গে অ্যারিস্টটল মনে করতেন, আত্মার বুদ্ধি আছে, যা দেহের অন্য কোনো অঙ্গে থাকতে পারে না। (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dualism. History of Dualism.) বুদ্ধি যদি দৈহিক কোনো অঙ্গের বিষয় হত, তাহলে তা অন্যান্য দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো সীমিত ক্ষমতাযুক্ত

হত। কিন্তু যেহেতু তা নয়, সুতরাং মানতে হয় যে, বুদ্ধি অবশ্যই অজড়। ("... if the intellect were in a physical organ it could be sensitive only to a restricted range of physical things; but this is not the case, for we can think about any kind of material object." (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dualism. History of Dualism.) অ্যারিস্টটলের এই চিন্তাই প্রমাণ করে যে, তিনি জড় এবং অজড় — দুটি বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকার করেন।

দ্রব্যদ্বৈতবাদে সবসময়ই দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যাদের একটিকে কোনোভাবেই অন্যটিতে পর্যবসিত করা যায় না, বা একটির সাহায্যে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু জাগতিক যে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য এদের কোনো একটির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক যুগে দ্বৈতবাদী হিসেবে সবথেকে বেশী প্রসিদ্ধ হলেন রেনে দেকার্ত। দেকার্ত দ্রব্যদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত এই জগতে দুধরনের দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন — জড়দ্রব্য ও মন। জড়দ্রব্যের আবশ্যিক ধর্ম হল বিস্তৃতি, আর মনের ধর্ম হল চেতনা। জড়ের চেতনা নেই, মনের বিস্তৃতি নেই। অর্থাৎ, দেকার্ত দেহ ও মনকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। দেকার্তের মতে, চিন্তাশীল মন দেহে অবস্থান করে না। দেকার্তও প্লেটোর মতো মনে করতেন যে, দেহের মৃত্যু ঘটে কিন্তু আত্মার বা মনের মৃত্যু ঘটে না। আত্মা অমর এবং অবিনশ্বর। দেকার্ত দেহ-মনের সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্য জাহাজের সঙ্গে তার নাবিকের সম্বন্ধের উপমা ব্যবহার করেছেন। জাহাজের সঙ্গে তার নাবিকের সম্বন্ধ কেবলমাত্র বাহ্যিক, কিন্তু দেহের সঙ্গে মন অনেক বেশী

অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। নাবিক কেবলমাত্র জাহাজকে চালনা করেন। কিন্তু মন, দেহকে শুধু চালনা করে না, দেহের বিভিন্ন পরিবর্তনকে সে অনুভব করে (Descartes 1986)।

এখন, দেহ ও মনের মধ্যে এই নিবিড় সম্বন্ধ কীভাবে স্থাপিত হতে পারে, তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেকার্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। দেহ আর মন পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী হওয়া সত্ত্বেও দেকার্ত তাদের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করেছিলেন। এই নিবিড় সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি লৌকিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা প্রভৃতি অনুভূত হয়। এগুলি মনে অনুভূত হলেও এগুলির সঙ্গে সংবেদনেরও যোগ থাকে। এই সংবেদনগুলি নিছক মন থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। সংবেদনের উৎপত্তির জন্য জড়জগতের সংস্পর্শ প্রয়োজন। সুতরাং দেকার্তকে মানতে হয়েছে যে, মন অবশ্যই জড়জগতের সঙ্গেও যুক্ত। এই সংবেদনগুলি দেহ ও মনের সম্মিলিত ফল। লৌকিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই দেকার্ত দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করেছিলেন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (interactionism) অনুসারে, দৈহিক ক্রিয়ার ফলে মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, আবার, মানসিক ক্রিয়ার ফলে দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে দেকার্ত পিনিয়াল গ্রন্থির কথা বলেছিলেন (Halden & Ross 1955)। দৈহিক ক্রিয়া ও মানস ক্রিয়ার রূপান্তরের ক্ষেত্রে পিনিয়াল গ্রন্থির কার্যকারিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে দেকার্ত মনে করেছিলেন। যদিও এ বিষয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি।

এখন, একটি দৈশিক অবস্থানবিশিষ্ট বিস্তৃতিযুক্ত বস্তুর সঙ্গে দৈশিক অবস্থানহীন অজড় বস্তুর সম্বন্ধ কীভাবে হতে পারে তা নিয়ে অনেক দার্শনিকই সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন, গিলবার্ট রাইল দেকার্তের এই চিন্তাকে প্রকার বিভ্রম (category mistake) রূপে আখ্যায়িত করেছেন। দেকার্ত দেহকে একটি যন্ত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। যার চালক বা যন্ত্রী হল মন। নাবিক যেমন জাহাজকে চালনা করেন, মনও তেমনি দেহকে চালনা করে, মনের অনুপস্থিতিতে তাই দেহ অচল হয়ে পড়ে। দৈশিক বিস্তৃতিযুক্ত দেহযন্ত্রে বিস্তৃতিহীন মনের কর্তৃত্বকে রাইল 'the dogma of the ghost in the machine' বলে কৌতুক করেছেন (Ryle 1949)। দৈশিক অবস্থানবিশিষ্ট জড় দেহ যে কীভাবে অশরীরী মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, তা সত্যিই বোঝা যায় না বলেই রাইল মনে করেছেন।

জন সার্ল মনে করেছেন, কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ দেহ ও মনের কারণিক সম্বন্ধের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। তাঁর মতে, এই সমস্যাটি প্রায় সব দ্রব্যদ্বৈতবাদী তত্ত্বেই সাধারণভাবে উপস্থিত। কিন্তু এই সমস্যাটির পাশাপাশি, সার্লের মতে আরো একটি সমস্যা হল, দ্রব্যদ্বৈতবাদকে কোনোভাবেই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা সম্ভব হয় না। পদার্থবিজ্ঞান বলে, এই জগতে জড় ও শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট (Searle 2004, 42) কিন্তু দ্রব্যদ্বৈতবাদ জড় শক্তির অতিরিক্ত একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে — মানস শক্তি। এখন, দ্রব্যদ্বৈতবাদ স্বীকার করলে পদার্থবিজ্ঞানের ভর ও শক্তির নিত্যতার সূত্র (Law of Conservation of Energy) বিঘ্নিত হয়।

কার্তেসীয় তত্ত্ব বা অন্যান্য অনেক দ্রব্যদ্বৈতবাদেই স্বীকার করা হয় যে, মানব দেহ বা মস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে চেতন নয়। মানব দেহ নিছক একটি যন্ত্র মাত্র। দেহের মধ্যে যতক্ষণ আত্মা (মন) আছে, ততক্ষণই দেহকে প্রাণবন্ত মনে হয়, আত্মা (মন) দেহযন্ত্র থেকে বিযুক্ত হওয়ামাত্র দেহের মৃত্যু ঘটে। আত্মা (মন) কিছু সময়ের জন্যই একটি দেহে অবস্থান করে।

সার্ল মনে করেছেন, এই চিন্তা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতা ছাড়া মানব চেতনা সম্ভব নয়। নীতিগতভাবে কোনো একটি জড়বস্তুতে চেতনা উৎপন্ন করা সম্ভব। মানব মস্তিষ্ক ব্যতীতও অন্য কোনো জড়বস্তুতে চেতনা উৎপন্ন করা যেতেই পারে,— এই চিন্তার মধ্যে কোনো যৌক্তিক বিরোধিতা নেই। তাই অন্তত নীতিগতভাবে এই দাবী বিজ্ঞান করতেই পারে। বিজ্ঞানের হয়তো এখনো অতটা অগ্রগতি হয়নি, মানব মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয়নি, কিন্তু একথা চিন্তার মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই যে, মানব মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কোনো জড়বস্তুতেও চেতনার অস্তিত্ব সম্ভব (Searle 2004, 43)।

দেকার্ত তাঁর দ্রব্যতত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, যা জড় তা চেতন নয়। কোনোকিছুই, তাঁর মতে, একইসঙ্গে জড় এবং চেতন হতে পারবে না। কিন্তু সার্ল মনে করেছেন, "The fact that a feature is mental does not imply that it is not physical; the fact that a feature is physical does not imply that it is not mental." (Searle 2002, 14-15)। দেকার্ত দেহ ও মনের মধ্যে যে দ্বিকোটিক বিভাজন সৃষ্টি করেছিলেন সার্ল তা সমর্থন করেননি। সার্ল মনে করেছেন, মানস ধর্মবিশিষ্ট

হওয়ার অর্থ কখনোই অজড় হওয়া নয়। কারণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে অতীন্দ্রিয় চেতনার অস্তিত্ব কখনোই স্বীকার করা যায় না। দেকার্ত বলেছিলেন, 'I am a thinking thing', সার্ল তাই তাকে পরিবর্তন করে বলতে চান, "I am a thinking being, therefore I am a physical being" (Searle 2002, 15)।

ম্যালব্রাঁশ (Malebranche), গঁয়লি (Geulinex) প্রমুখ কার্তেসীয় উত্তর দার্শনিকগণ কার্তেসীয় তত্ত্বের সমস্যা উপলব্ধি করে, একটি নতুন দ্বৈতবাদী তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্বের নাম হল উপলক্ষ্যবাদ (Occasionalism)। এই কার্তেসীয় মতবাদে দেহ ও মনের মধ্যে উভয়মুখী কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছিল। তা নানা সমস্যার উদ্রেক করে। তার থেকে মুক্ত হবার জন্য ম্যালব্রাঁশ বলেন, যখন দেহ ও মনের মধ্যে কোনো সংযোগ স্থাপিত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই দৈহিক ঘটনা অনুসারে মানস ঘটনা ঘটছে বা মানস ঘটনা অনুসারে দৈহিক ঘটনা ঘটছে– "... it is God who brings it about that our sensation and volitions are corelated with motions in our body." (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Nicolas Malebranche. Occationalism.)। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে বা দৈহিক ও মানস দশার মধ্যে বা দুটি দৈহিক বা দুটি মানস দশার মধ্যেও কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে ("There can be a necessary causal connection in only one case, namely the connection between the volitions of an omnipotent agent and its upshots. Thus, only such an agent, namely, God, can be true cause." (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Nicolas Malebranche. Occationalism.)। উপলক্ষ্যবাদ অনুসারে জীবের নিজস্ব কোনো স্বাধীন

কার্যক্ষমতা নেই, একমাত্র ঈশ্বরই নিমিত্ত কারণ হতে পারেন। যেসব ঘটনাকে কারণ বলে মনে হয়, সেগুলি উপলক্ষ্যমাত্র।

দেহ-মনের কার্যকারণ সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না বলেই লাইবনিজ (Leibniz) মনে করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর প্রতিমুহূর্তে চিন্তার জগতেও পরিবর্তন করছেন এবং এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে,— দার্শনিক হিসেবে তাঁর পক্ষে এই চিন্তা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। তাই তিনি উপলক্ষ্যবাদকে সঠিক বলে গণ্য করেননি। লাইবনিজ মনে করেছিলেন যে, উপলক্ষ্যবাদ পদার্থবিদ্যার নীতিকে বিঘ্নিত করে। পদার্থবিজ্ঞান মনে করে যে, কোনো একটি জড়বস্তুর গতিতে তখনই পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি তা অন্য কোনো জড়বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে, জড়দেহে কোনো একটি অজড় পদার্থের দ্বারা বা ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা পরিবর্তন ঘটতে পারে না বলেই লাইবনিজ দাবী করেছেন। জড়দেহের প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য উপলক্ষ্যবাদ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কারণ বলে মনে করেছে। জড়দেহের স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কোনো ব্যাখ্যাও যে থাকতে পারে, তা উপলক্ষ্যবাদ ভেবে দেখেনি। গতির যে কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাও সম্ভব, তা উপলক্ষ্যবাদে ভাবাই সম্ভব হয় না। এই অলৌকিক অপ্রাকৃত ব্যাখ্যাকে লাইবনিজ মানতে চাননি (Mason 1967)।

কার্তেসীয় দ্রব্যতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে স্পিনোজা ঈশ্বরকে একমাত্র দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেন এবং বিস্তৃতি আর চেতনাকে ঈশ্বরের অনেক গুণের মধ্যে অন্যতম দুটি গুণ (যা আমাদের উপলব্ধিযোগ্য) হিসেবে স্বীকার করেন। স্পিনোজার মতে, একটি মুদ্রার দুটি দিকের মতো, ঈশ্বর দ্রব্যেরও দুটি দিক — বিস্তৃতি আর

চেতনা। বিস্তৃতি আর চেতনা ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্যতম দুটি গুণ, যাদের স্পিনোজা দ্রব্যের আবশ্যিক ধর্ম (attributes) রূপে গণ্য করেছেন (Spinoza 2016)। স্পিনোজার মতে, বিস্তৃতি আর চেতনা পরস্পর স্বতন্ত্র দুটি ধর্ম। অন্যভাবে বললে, দৈহিক দশা আর মানস দশা পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। চিন্তার জগতেও তারা স্বনির্ভর। অর্থাৎ কোনো একটির চিন্তা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব ["... although two attributes may be conceived to be really distinct (i.e. one may be conceived without the aid of the other), we still cannot infer from that that they constitute two beings, or two different substances" (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Spinoza's Theory of Attributes.)]। স্পিনোজা দৈহিক দশা ও মানস দশাকে একে অন্যের থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। দেকার্তের দ্বারাই হয়তো তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন কিন্তু, দেকার্ত দেহ-মনকে একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বলে দাবী করেও তাদের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করেছিলেন। যদিও স্পিনোজা তা করেননি। তাঁর মতে, এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোনোভাবেই সম্বন্ধযুক্ত হয় না। এদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্বীকার করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। যে কোনো দৈহিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা অন্যান্য দৈহিক ঘটনার সাহায্যে দেওযা সম্ভব এবং যে কোনো ধারণাকে অন্যান্য ধরাণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে স্পিনোজা মনে করতেন। স্পিনোজার মতে, "The body cannot determine the mind to thinking, and the mind cannot determine the body to motion, to rest or to anything else (if there is anything else)." (Spinoza 1986, 86)। স্পিনোজার এই তত্ত্বই দ্বিপার্শ্ববাদ (double aspect theory) নামে খ্যাত।

স্পিনোজার তত্ত্ব ধর্মদ্বৈতবাদ (property dualism) নামে স্বীকৃত হতে পারে। ধর্মদ্বৈতবাদকে অনেকেই দ্রব্যদ্বৈতবাদের তুলনায় দুর্বল বলে মনে করেন (Searle 2004)। ধর্মদ্বৈতবাদের মূলকথা হল,— এই জগতে দুধরনের দ্রব্য নেই, বরং দ্রব্য একপ্রকার, কিন্তু তাদের ধর্ম বা গুণগুলি দুপ্রকার। মানুষের দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টি বুঝতে হলে, বলা যায় যে, মানব দেহের মস্তিষ্ককে যদি দ্রব্য হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তার মধ্যে দুটি গুণ দেখতে পাওয়া যায়— ভৌত ও মানস। একই জড় মস্তিষ্কের দুটি বিপরীত ধর্ম। এখন, দ্রব্যদ্বৈতবাদের তুলনায় ধর্মদ্বৈতবাদের কতগুলি সুবিধা আছে বলেই মনে হয়। দ্রব্যদ্বৈতবাদে একটি অজড় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় যা ধর্মদ্বৈতবাদ স্বীকার করে না। সেদিক থেকে দেখলে কার্তেসীয় দ্বৈতবাদের সমস্যা থেকে ধর্মদ্বৈতবাদ মুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দুটি দ্রব্য না থাকায় তাদের মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয় না।

অন্যদিকে সার্ল মনে করেন, ধর্মদ্বৈতবাদে, দ্রব্যদ্বৈতবাদের অনেকগুলি সমস্যাই বর্তমান। এখানেও দ্রব্যদ্বৈতবাদের মতো একই প্রশ্ন ওঠে যে, মানস ও ভৌত ধর্মগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কেমন? ভৌত দশা থেকে মানস দশার উৎপত্তি হয় কীভাবে? তার থেকে বড় সমস্যা হল, মানস ধর্মের কি কোনো কারণিক ভূমিকা আছে? মানস দশা কি কোনো ভৌত দশাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করতে সক্ষম? ধর্মদ্বৈতবাদ মন নামক স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করে না ঠিকই, কিন্তু একথা স্বীকার করে যে, মানস এবং ভৌতধর্মগুলি দেহের অংশ না হলেও দেহের বা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। মানস ধর্মগুলি কিন্তু দৈহিক বা ভৌত ধর্মের মতো নয়। সাধারণ জৈবিক ভৌত ধর্মের থেকে তারা আলাদা। এখন, যদি মানস ধর্ম ভৌত ধর্ম থেকে আলাদাই হয় তাহলে সেই একই প্রশ্ন

ফিরে আসে, অভৌত মানস ধর্ম কাজ করে কীভাবে? প্রথাগত দেহ-মনের সমস্যা ধর্মদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রেও পুনরুত্থাপিত হয় (Searle 2004, 45)। সার্ল একথা মানেন যে, দ্বৈতবাদের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মানব মনের চিরাচরিত চিন্তার মধ্যে দ্বৈতবাদী চিন্তা লুকিয়ে রয়েছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় মানুষ যে চেতনাকে অনুভব করে, তা ভৌত জগতের অন্যান্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিশ্বাসই মানুষকে দ্বৈতবাদী চিন্তার পথে চালিত করে। আধুনিকযুগে দ্বৈতবাদী চিন্তার সমর্থক দেখতে পাওয়া যায়। সার্লের মতে, বাহ্যজগতে আমরা যেসব বস্তুকে (যেমন, টেবিল) কঠিন পদার্থ হিসেবে গণ্য করি, সেগুলি আণবিক গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ ঘন বস্তু নয়,— "At the level of molecular structure the table is not really solid... It is just that from our point of view it seems solid." (Searle 2004, 47)। সব জড়বস্তুর নিম্নস্তরেই আছে মৌলিক আণবিক কণার গঠন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। চেতনা কিন্তু আণবিক কণার সংগঠন নয়। চেতনা যাই-ই হোক, তা "... something over and above the particles." (Searle 2004, 47)। সার্ল মনে করেছেন, এই চিন্তাই আধুনিক ধর্মদ্বৈতবাদী চিন্তার পথ প্রশস্ত করে।

আধুনিককালে ডেভিড চামার্স ধর্মদ্বৈতবাদের সমর্থক। তাঁর মতে, চেতন অভিজ্ঞতা এমন এক ধর্মের কথা বলে যা ব্যক্তির ভৌত ধর্ম থেকে নিঃসৃত হয় না, যদিও তারা হয়তো ঐ ভৌত ধর্মগুলির উপর নির্ভর করে। তাঁর কথায় "Consciousness is a feature of the world over and above the physical features of the world." (Chalmers 1997, 125)। তিনি চেতনাকে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে চাননি, বরং তাঁর মতে একটি দ্রব্যের দুধরনের ধর্মই থাকতে পারে— ভৌত ধর্ম আর অভৌত ধর্ম

('...the phenomenal properties — that are ontologically independent of physical properties." (Chalmers 1997, 125)।

স্পিনোজার এই তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিককালে স্ট্রসনের তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রসনের কাছে 'ব্যক্তির' (person) ধারণা মৌলিক, এই অর্থে যে, একে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। তাঁর মতে, একই ব্যক্তিতে ভৌত বিধেয় যেমন আরোপ করা যায় তেমনি, মানস বিধেয়ও আরোপ করা যায়। স্ট্রসন মনে করেন, চেতনাকে কেবলমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আরোপ করা যায়। স্ট্রসনের ব্যক্তি কিন্তু মানস বিধেয় আর ভৌত বিধেয়ের সম্মেলন নয় বরং তাদের অতিরিক্ত একটি বিষয়। তিনি ভৌত বিধেয়কে 'P-predicate' (অর্থাৎ 'personal predicate') নামে চিহ্নিত করেছেন। এই বিধেয়গুলি একমাত্র ব্যক্তি বা 'person'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। স্ট্রসন বলেছেন "... the concept of a person is logically prior to that of an individual consciousness. The concept of a person is not to be analysed as that of an animated body or an embodied anima." (Strawson 1959, 103)।

স্ট্রসনের এই মত কার্তেসীয় দেহ-মনের সমস্যা সমাধানে আদৌ উপযোগী কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। স্ট্রসন কার্তেসীয় দেহ-মনের সমস্যাকে সমাধান করার পরিবর্তে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। স্ট্রসন মনে করেছেন, ব্যক্তিকে মৌলিক (primitive) সত্তা হিসেবে স্বীকার করে তাতে মানস বিধেয় এবং ভৌত বিধেয় আরোপ করে দিলেই আর কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু এতে মানস কারণতার সমস্যার কীভাবে সমাধান হবে, ভৌত জগতের উপর মানস জগতের প্রভাবকেই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান।

দেকার্ত দেহ ও মনকে দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেছিলেন। দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্টও বটে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল দেকার্তের দর্শনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। স্পিনোজা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনো দ্রব্য স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না, কারণ তাঁর মতে, স্বনির্ভরতা যদি দ্রব্যের লক্ষণ হয় তাহলে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করতে হয়। তাঁর মতে, ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা কেবলমাত্র দুটি গুণকেই জানতে পারি— বিস্তৃতি (দৈহিক ধর্ম) ও চেতনা (মানস ধর্ম)। স্পিনোজা দৈহিক ধর্ম ও মানস ধর্মকে পরস্পর স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যদিও তাদের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করতে চাননি। মানস দশাও, তাঁর মতে দৈহিক দশার কারণ নয়, দৈহিক দশাও মানস দশার কারণ নয়। স্পিনোজার এই চিন্তাধারার প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে লাইবনিজের (Leibniz) দর্শনে প্রতিফলিত হয়। লাইবনিজ মোনাডগুলিকে স্বয়ংক্রিয় বলে মনে করেছিলেন। যারা নিজের আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার ভিত্তিতেই ক্রিয়াশীল হয়। প্রতিটি মোনাড, লাইবনিজের মতে, গবাক্ষহীন। বাইরের কোনো কিছুর দ্বারাই তারা পরিবর্তিত হয় না, বাহ্য জগতকে কোনোভাবে প্রভাবিতও করে না। তাদের যা কিছু পরিবর্তন বা বিবর্তন সবই তাদের অভ্যন্তরে আগে থেকেই সম্ভাবনারূপে নিহিত হয়ে থাকে। মোনাড সৃষ্টির মুহূর্তেই ঈশ্বর প্রতিটি মোনাডকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেন, যাতে তাদের প্রতিটি পরিবর্তন অন্যান্য মোনাডের পরিবর্তনের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সেই কারণেই মনে হয় যেন, মনাডগুলি একে অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করছে। লাইবনিজের এই তত্ত্বই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ (pre-established harmony) নামে খ্যাত

(Leibniz 1968)। এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লাইবনিজ দৈহিক দশা ও মানস দশার মধ্যে কোনো পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেননি। স্পিনোজা দ্রব্যের আবশ্যিক ধর্মের (attributes) সঙ্গে সঙ্গে বিকারও (modes) স্বীকার করেছিলেন। এখন, এই বিকারগুলি কিন্তু দ্রব্যের আবশ্যিক প্রকৃতি থেকেই অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। একটি আবশ্যিক ধর্মের (attribute) ক্ষেত্রে যে বিকার ঘটবে তার সমানুপাতে অন্যান্য আবশ্যিক ধর্মেও বিকার ঘটবে (Encyclopedia Britannica, Metaphysics. The Mind-Body Relationship, Dt. 20.11.2017)। এই কথা থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় যে, স্পিনোজা মনে করতেন, প্রতিটি মানস দশার সমান্তরাল দৈহিক দশা আছে এবং প্রতিটি দৈহিক দশার সমান্তরাল মানস দশা আছে। স্পিনোজা দেহ-মনের দৈহিক দশা ও মানস দশাকে সমান্তরাল বলে মনে করলেও তার কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। লাইবনিজের তত্ত্বের দ্বারা তা অনেক বেশী ভালোভাবে ব্যাখ্যাত হয়। স্পিনোজার এই বক্তব্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায় লাইবনিজের পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাতত্ত্বের (pre-established harmony) মধ্যে। দুটি ঘড়ি যেমন একে অন্যকে প্রভাবিত না করেও সঠিক সময়ে দেখাতে পারে, দৈহিক দশা ও মানস দশাও একে অন্যকে প্রভাবিত না করে সমান্তরালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। ঘড়ি তৈরির সময় ঘড়ি নির্মাতা দুটি ঘড়িকে এমন ভাবেই ক্রিয়াশীল করে দেন যে, তারা একে অন্যকে প্রভাবিত না করেও অভিন্ন সময় প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর জগত সৃষ্টির সময় এমন এক শৃঙ্খলা বা সাযুজ্য সৃষ্টি করেছেন যে, দৈহিক ঘটনা ও মানস ঘটনা একে অন্যকে প্রভাবিত না করলেও এমনভাবেই ঘটে চলে যে, আমাদের মনে হয়, একটি দৈহিক ঘটনার পরই যেন একটি মানস ঘটনা ঘটল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ তাদের মধ্যে থাকে না। থাকে কেবল ঈশ্বর সৃষ্ট পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাজনিত পারস্পরিক সম্বন্ধ (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Leibniz's Theory of Mind.) ।

দ্বৈতবাদী এই সব তত্ত্বেই দৈহিক দশা ও মানস দশার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কার্তেসীয় তত্ত্ব দৈহিক দশা ও মানস দশার মধ্যে উভয়মুখী কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেছে। সমান্তরালবাদ উভয়মুখী কার্যকারণ সম্বন্ধজনিত সমস্যা থেকে মুক্ত হবার অভিপ্রায়ে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু সমান্তরালবাদ যেহেতু দৈহিক ঘটনা ও মানস ঘটনার মধ্যে কোনো কারণিক সম্বন্ধ স্বীকার করলো না, তাই এই তত্ত্বের দ্বারা দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া গেল না। দেহ ও মনকে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকার করার জন্যই তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এত সমস্যার উদ্রেক হয়। যদি দুটি বিষয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র দৈহিক দশা বা ভৌত দশার (physical) অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় তাহলে এই সমস্যার আর সম্ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু মানস দশাগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবে ধরা দেয় ফলে তাদের অস্তিত্ব এত সহজে অস্বীকার করাও যায় না। আঘাত পেলে আমাদের ব্যথার অনুভব হয় আবার ব্যথা লাগার কারণে পেশী সংকুচিত হয় এবং ব্যথা লাগার পর এমন বিশ্বাসও জন্মায় যে, নিজেকে আঘাত মুক্ত রাখতে হবে। ব্যাথা নামক মানস দশা থেকে পেশী সংকোচনের মতো দৈহিক ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি বিশ্বাস, রাগ, ঘৃণার মতো মানস দশারও সৃষ্টি হয়। একটি দৈহিক বা ভৌত ঘটনা কীভাবে অন্য একটি ভৌত ঘটনাকে ঘটতে সাহায্য করে তা বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, কিন্তু একটি

মানস ঘটনা থেকে কীভাবে অন্যান্য ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে, তা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না। যদি মানস ঘটনাকে ভৌত ঘটনা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়, তাহলে মানস ঘটনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা ভৌত জগতের নীতির পরিপন্থী হয়ে যায়। একটি অভৌত দশা কীভাবে একটি ভৌত দশার জনক হতে পারে, তা সত্যিই ভৌত জগতের নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই অনেক মনোদার্শনিক মনের স্বতন্ত্র কার্যকারিতা অস্বীকার করতে চাইলেন। কোনো একটি ঘটনার যদি পর্যাপ্ত ভৌত কারণ থাকে, তাহলে ঐ ঘটনার কারণ হিসেবে অভৌত একটি কারণ স্বীকার করার কী প্রয়োজন? এই চিন্তাই উপবস্তুবাদের (epiphenomenalism) জনক। থমাস হাক্সলে (Huxley 1898) এই চিন্তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি মানস দশাকে বাষ্প থেকে নির্গত শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাষ্পচালিত কোনো যন্ত্রের চালনার ক্ষেত্রে যার কোনো কার্যকরী ভূমিকা থাকে না।

উপবস্তুবাদে মনে করা হয় যে, সাধারণভাবে যেসব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং তাদের কারণ হিসেবে আমরা যেসব ঘটনাকে চিহ্নিত করি, তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি পৌর্বাপর্যের (regularity) সম্বন্ধ আছে। যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়টি যে কোন বিষয়ের কারণ এবং কার্য-- তা সবসময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। হিউমের সতত সংযোগ তত্ত্বে আমরা দেখেছি যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে সতত সংযোগ থাকলেও, অর্থাৎ দুটি ঘটনা বারংবার পরপর ঘটলেও বলা যায় না যে, ঘটনা দুটির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। ব্যারোমিটারের মাত্রা ঝড়ের সময় সবসময়ই নিচের দিকে নেমে যায় কিন্তু তার ভিত্তিতে কখনোই বলা যায় না যে, ঝড়-ই হল ব্যারোমিটারের

মাত্রা কমে যাবার কারণ। বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে সাংকেতিক আকারে বোঝা যেতে পারে (Stanford Encyclopedia of Philolsophy. Epiphenomenalism.) ।

মনে করা যাক্, P_1 নামক ভৌত ঘটনা থেকে M নামক মানস ঘটনা এবং P_2 নামক ভৌত ঘটনার আবির্ভাব হল। এবং M এবং P_2-র অন্য কোনো কারণ নেই, P_1 ব্যতীত।

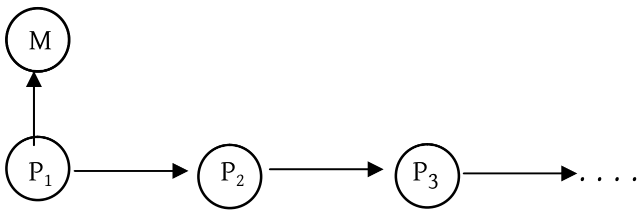

এখন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই M ঘটনাটি P_2-র উৎপত্তির আগে আছে যদিও P_2-র পর্যাপ্ত কারণ হল P_1 এবং উৎপত্তির জন্য P_2 কোনোভাবেই M-র উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক (counter factual) পরিস্থিতিতে বিচার করলে যদিও বিপরীতটাই প্রমাণিত হবে, কারণ সেক্ষেত্রে বলতে হবে, 'যদি M না ঘটত তাহলে P_2 ঘটত না। অর্থাৎ যদি ব্যারোমিটারের মাত্রা না পড়ত তাহলে বলা যেত যে ঝড়টা হয়নি। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক (counter factual) পরিস্থিতিতে এই সম্বন্ধগুলিকে কার্যকারণ সম্বন্ধ হিসেবেই গণ্য করা উচিত। যদিও প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। সুতরাং বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক পরিস্থিতির দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় বলে উপবস্তুবাদ মনে করে। এই তত্ত্বে P_1 থেকে P_2-র উৎপত্তির ক্ষেত্রে M-র উপস্থিতি উপবস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়। স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যাবলী থেকে আমাদের বিভিন্ন আচরণের উৎপত্তি হয়। স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনার ফলে কিছু মানস ঘটনা ঘটে বলেও আমরা অনুভব করি। কিন্তু উপবস্তুবাদের মতে, মানস ঘটনাগুলি

স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে উৎপন্ন হলেও পরবর্তী কোনো দৈহিক ঘটনা সৃষ্টিতে তার কোনো কারণিক ভূমিকা থাকে না (Stanford Encyclopedia of Philolsophy. Epiphenomenalism.)।

উপবস্তুবাদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি ওঠে। মূলতঃ এই তত্ত্ব আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। আমাদের ব্যথা-বেদনা, চিন্তাভাবনা আমাদের দৈহিক আচার-আচরণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। মানস জগত ক্রিয়াহীন, দৈহিক জগতের উপর তার কোনো কারণিক ভূমিকাই নেই। আমাদের চিন্তাভাবনা কোনোভাবেই আমাদের পরবর্তী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয় — এই কথা মেনে নেওয়া যায় না (Taylor, 1963)।

আবার, উপবস্তুবাদ মেনে নিলে সৃজনশীলতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কোনো একজন শিল্পী যখন কোনো একটি শিল্প সৃষ্টি করেন, তখন শিল্পীর চিন্তাভাবনার প্রকাশ তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। শিল্পের গুণাগুণের ভিত্তিতেই শিল্পীর কৃতিত্বের বিচার হয়। এখন, প্রতিটি সৃষ্টিই যদি নিছক যান্ত্রিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফল হয়, তার অতিরিক্ত কোনো বিষয় যদি সেখানে যুক্ত না থাকে, তাহলে কোনো সৃজনশীলতার জন্য স্রষ্টার কোনো স্বতন্ত্র স্বীকৃতির আর কোনো অর্থ থাকে না (Hyslop 1998)।

উপবস্তুবাদের বিরুদ্ধে আরো আপত্তি ওঠে যে যদি মানস জগত বা মানস ঘটনা সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা শূন্য অর্থক্রিয়াহীন হয়, তাহলে বিবর্তনের ধারায় তার অবলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। বিবর্তনের ধারার কেবলমাত্র সেইসব বিষয়েরই আবির্ভাব ঘটে যারা অর্থক্রিয়াকারী, অর্থাৎ কার্যোৎপাদনে সক্ষম। মানস জগতের যদি কোনো কার্যোৎপাদন

সামর্থ্য নাই থাকে তাহলে বিবর্তনের ধারায় তা উদ্ভূতই হত না। কার্ল পপার (Popper 1985) মনে করেছেন, মানব জীবনে এবং মানস আচরণে যদি চেতনার কোনো কারণিক ভূমিকা না থাকতো, তাহলে তার উদ্ভবই হত না। পপারের মতে বিবর্তনের ধারায় চেতনার গুরুত্ব নিশ্চিতভাবে উপলব্ধ হয়েছে, তা অবশ্যই ভৌত জগতকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে, সেই কারণেই চেতনার আবির্ভাব হয়েছে এবং তার বিকাশ ঘটেছে। উপবস্তুবাদের সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তর্দর্শনের পরিপন্থী। উপবস্তুবাদ চেতনার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে, কিন্তু আমাদের অন্তর্দর্শনে তার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা অন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করি, অন্যের আচরণের ভিত্তিতে অনুমানের মাধ্যমে। মন বা চেতনার যদি কোনো কার্যক্ষমতা নাই থাকে, তাহলে আর অন্যের আচরণ দেখে, তার ভিত্তিতে তার মনের বা মানস দশাকে অনুমান করাও নিরর্থক (Walton 1989)। চামার্স উপবস্তুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে উপবস্তুবাদে স্বীকৃত চেতনাকে ফেইলের (Feigl 1958) শব্দ ধার করে 'nomological danglers' বলে পরিহাস করেছেন। তাঁর মতে, উপবস্তুবাদীরা এমন এক তত্ত্বের কথা বলছেন যেখানে মনে হয় আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। চেতন অভিজ্ঞতাগুলি উদ্ভূত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারপর আর তাদের কোনো আবশ্যিকতা নেই, তাই তারা শূন্যে ভাসমান। উপবস্তুবাদ যেহেতু মনের কোনো স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকাই স্বীকার করে না, তাই উপবস্তুবাদের থেকে দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক কোনো সমাধান পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

দ্বৈতবাদী চিন্তা ঘরানার নানা সমস্যা অনুধাবন করে যদি বিকল্প তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে হয়, তাহলে প্রথম যে তত্ত্বের কথা মনে আসে তা হল অদ্বৈতবাদ

(monism)। কারণ দুটি তত্ত্বের পরিবর্তে যদি একটি তত্ত্বই থাকে, তাহলে আর জড়-অজড় পদার্থের কার্যকারণ সম্বন্ধজনিত সমস্যার উদ্ভব হয় না। অদ্বৈতবাদ আবার দু-রকম হতে পারে,— মন-অদ্বৈতবাদ আর জড়-অদ্বৈতবাদ, যা যথাক্রমে ভাববাদ (idealism) ও জড়বাদ (materialism) নামেই বেশী পরিচিত। বার্কলে, হেগেল, ব্র্যাডলে প্রমুখ বিশিষ্ট দার্শনিকরা ভাববাদের প্রবক্তা। ভাববাদে মনে করা হয় যে, এই জগত চৈতন্যময়। চেতনা বা মনের ধারণা ছাড়া এ জগতে মৌলিক স্তরে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না "Something mental (the mind, sprit, reason, will) is the ultimate foundation of all even exhaustive of reality." (Stanford encyclopedia of Philosophy. Idealism.)। শুধুমাত্র মনোদর্শন নয়, সমগ্র দর্শনের জগতেই ভাববাদের প্রভাব অপরিসীম। অন্যদিকে বিজ্ঞানের জগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বিজ্ঞান জড়বাদের দ্বারাই প্রভাবিত। জড়বাদ স্বাভাবিকভাবেই কেবলমাত্র জড়তত্ত্বের অস্তিত্বই স্বীকার করে। ("Materialists historically held that everything was matter— where matter was conceived as 'an inert, senseless substances, in which extension, figure, and motion do actually subsist."(Stanford Encyclopedia of Philosophy. Physicalism.) যদিও পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞান প্রাচীন জড়বাদীদের এই চিন্তা থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যখন সে মাধ্যকর্ষণ বলকে জড় বলে গণ্য করেছে। আধুনিক জড়বাদী চিন্তা প্রাচীন জড়বাদী চিন্তার শুদ্ধিকরণ করে অনেক বেশী পদার্থবিজ্ঞান অনুসারী হবার চেষ্টা করেছে।

মনোদর্শনের আলোচনায় দ্বৈতবাদী চিন্তাধারা বহুদিন প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনোদর্শন তথা সমগ্র দর্শন জগতেই

চিন্তাধারার পট পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ ১৯২৪ থেকে ভিয়েনাতে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যা "Vienna Circle" নামে প্রসিদ্ধ। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী চিন্তা শুধুমাত্র ভিয়েনা সার্কেলেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, বার্লিন তথা ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ছড়িয়ে ছিল। এই সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাবিদ ছিলেন কিন্তু তাদের সকলের একত্রিত হবার একটিই মূলমন্ত্র ছিল, তা হল – তাঁরা সকলেই পর্যবেক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামাজিক গঠনকে উন্নততর করতে সক্ষম হবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Logical Empiricism.)। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা পদার্থবিজ্ঞানকেই আদর্শ হিসেবে গণ্য করতেন। অন্যান্য সব বিজ্ঞানকেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করলেন। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা অভিজ্ঞতালব্ধ, পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, "... in order to be meaningful a claim must be implied by a finite number of observation sentences" (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Logical Empiricism.)। তাঁদের এই তত্ত্ব 'verification principle' নামে খ্যাত। যদিও সব যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরাই যে (logical empiricist or positivist) এই তত্ত্বকে খুব দৃঢ় অর্থে মানতেন, এমন নয়। যেমন কারনাপ (Carnap), নিউরাথ (Neurath), হান (Huhn) প্রমুখ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী এক্ষেত্রে কিছুটা নরমপন্থী মনোভাবেরই পক্ষপাতী ছিলেন। এই নরমপন্থী মনোভাবের অনেক দার্শনিক যেমন, নিউরাথ, কারনাপ প্রমুখ বিজ্ঞানের একীকরণে (unity of sciences) বিশ্বাসী ছিলেন

(Neurath 1931)। তাঁদের লক্ষ্য ছিল রসায়নবিদ্যা (chemistry), জীববিদ্যা (biology), মনোবিদ্যা (Psychology) এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে পদার্থবিজ্ঞানের মূলনীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা। তাঁরা এই জগতের সব বিষয়কেই জড়জগতে পর্যাবসানযোগ্য (reducible) এবং পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশযোগ্য বলে মনে করতেন। এখন, সব বিষয়ই যদি পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যাযোগ্য হয়, তাহলে মনোদর্শনই বা কেন তার ব্যতিক্রম হবে? তাঁদের মতে, এই জগতে যা কিছু আছে তা যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশযোগ্য, তাই মনোবদ্যিাও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই কারণেই মন বা চেতনাকে ভৌতবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা শুরু হয়। ১৯২০-র দশকে এই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমশঃ তা ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে অর্থাৎ ১৯৩০-এর দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ইউরোপে এই চিন্তার প্রসিদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ইউরোপের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক চিন্তাবিদই ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান।

ভিয়েনা সার্কেল বা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে সামনে আসে ১৯২০-র দশকে। কিন্তু তার আগে থেকেই যে এই ধরনের জড়বাদী পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ চিন্তার হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তা প্রমাণিত হয় জে.বি.ওয়াটসনের (J.B.Watson) গবেষণা থেকে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটসন মনোবিদ্যার আলোচনাকে বর্ণনাত্মক (descriptive) বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন। তার আগে পর্যন্ত অন্তর্দর্শনই (introspection) মনোবিদ্যায় মনসংক্রান্ত আলোচনার প্রধান মানদণ্ড হিসেবে

বিবেচিত হত। আচরণবাদীরা বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার দায়ে, অন্তর্দর্শনকে বিষয়ীনিষ্ঠতার (subjectivity) দোষে অভিযুক্ত করে, বর্জন করলেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করলেন। এখন, পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণের মাধ্যমে যদি মনকে জানতে হয়, তাহলে আচরণই একমাত্র বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে। যেহেতু একমাত্র আচরণই প্রত্যক্ষযোগ্য। ভৌতবাদী ঘরানার মন বিষয়ক এই প্রাচীনতম তত্ত্বটি আচরণবাদ (behaviourism) নামে পরিচিত।

উইলফ্রেড সেলার (Wilfrid Sellar) আচরণবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আচরণবাদী বলতে তাঁদেরই বোঝা উচিত যাঁরা মানস ঘটনাকে আচরণের মানদণ্ডে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক (Sellar 1962)। আচরণবাদ অনুসারে, মন আর কিছুই নয়, আচরণমাত্র। দৈহিক আচরণের অতিরিক্ত কোনো মানস দশাই এই তত্ত্বে স্বীকৃত নয়। তাঁরা মনে করেন, পশুদের ক্ষেত্রে যেমন মন স্বীকার না করেও, তাদের আচরণকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, একজন মানুষের মন বা মানস অবস্থাকে জানতে হলে তার দৈহিক অবস্থা বা আচরণের ভিত্তিতেই জানতে হবে। এখন, যে কোনো মানস বিবরণই যদি একইভাবে আচরণের ভিত্তিতে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে আচরণের অতিরিক্ত আন্তর মানস দশা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এই চিন্তাই আচরণবাদের মূল উৎস।

সোমনাথ চক্রবর্তী তাঁর ‘আচরণবাদের আচরণদর্শন’ প্রবন্ধে (চক্রবর্তী ২০১৩) বিষয়টি সহজভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায় আচরণবাদের মূল দাবী হল,—

"মনোবিজ্ঞানের আলাপ-আলোচনায় মন-টনের উল্লেখ বাদ দিতে হবে। মনোবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বলতে মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, তার আচার-আচরণ। এর পিছনে অদৃশ্য কোনো মনের ভূমিকা খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। ...তথাকথিত মনোধর্মগুলো যতক্ষণ আচরণের অঙ্গ হিসেবে দেখছি ততক্ষণই তাদের যা কিছু বাস্তবতা। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে আমরা যদি এসব ধর্মকে স্বতন্ত্র আভ্যন্তরীণ বৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিই তাহলেই বাস্তবতার শেষ এবং রূপকথার শুরু।" (চক্রবর্তী ২০০৩, ১২৫)

ফলে, বলা যায়, আচরণবাদের মূলত তিনটি দাবী —

১. মনোবিদ্যা হল আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞান, তা কোনোভাবেই মনসংক্রান্ত বিজ্ঞান নয়, যা আচরণের অতিরিক্ত কোনো বিষয়।
২. মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করেও আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, মানব আচরণ সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তার জন্য কোনো আন্তর মানস জগত স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।
৩. মনোবিদ্যার তত্ত্ব নির্মাণের জন্য যদি কখনো মন বা মনোবিষয়ক কোনো শব্দ বা প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে, সেই শব্দ বা প্রত্যয়গুলি বর্জন করা বা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। নীতিগতভাবে মনোবিষয়ক ধারণা বা প্রত্যয়কে বর্জন করে মনোবিদ্যাকে আচরণ বিষয়ক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করাই আচরণবাদের লক্ষ্য।

এই তিনটি দাবী কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি দাবী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আচরণবাদী মতকে প্রকাশ করে। এই তিনটি দাবীর একেকটিকে কেন্দ্র করে মোট তিন ধরনের আচরণবাদী মত প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দাবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পদ্ধতিগত আচরণবাদ (methodological behaviourism)। দ্বিতীয় দাবী ও তৃতীয়

দাবীর ভিত্তিতে যথাক্রমে 'মনোদার্শনিক আচরণবাদ' (psychological behaviourism) এবং 'দার্শনিক বা যৌক্তিক বা বিশ্লেষণাত্মক আচরণবাদ' (philosophical / logical / analytic behaviourism)।

পদ্ধতিগত আচরণবাদ মূলতঃ মনোবিজ্ঞানের জগতের একটি ভাবনা। মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার এটি একটি প্রয়াস। এখানে মনে করা হয় যে, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেমন কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণলব্ধ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিয়েই আলোচনা করা হয়, মনোবিজ্ঞানেও তা-ই করা উচিত। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানেও বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণলব্ধ আচরণ নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এখানে মনে করা হয় যে, বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে একটি জৈবিক তন্ত্রে উদ্দীপনার প্রবেশ এবং সেই উদ্দীপনার ভিত্তিতে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় তার ভিত্তিতেই মনকে বুঝতে হবে। মানুষের আচরণের প্রকাশই হল তার মন। ফলে, মনোবিজ্ঞানের পরিবর্তে তা 'মানব আচরণ বিষয়ক বিজ্ঞান' হিসেবে পরিচিত হল। বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাই স্বীকার করে যা বস্তনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য বা যাচাইযোগ্য। মানব আচরণই বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য, ফলে মানব মন সংক্রান্ত আলোচনাকে 'বিজ্ঞান' করতে হলে তা অবশ্যই মানব আচরণ বিষয়কই হবে বলে আচরণবাদ মনে করলো।

জে. বি. ওয়াটসন (J. B. Watson) পদ্ধতিগত আচরণবাদের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি মানস দশার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। মনোবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসে আচরণবাদকে তিনি একটি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াটসন মানসিক প্রক্রিয়াকে আচরণে পর্যবসিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর

মতে, উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পূর্ণভাবে আচরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি মনে করতেন, এই উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফলে, তাঁর আচরণবাদ একধরনের নিয়ন্ত্রণবাদকেই সমর্থন করে। রসায়নবিজ্ঞান বা অন্যান্য বর্ণনামূলক (descriptive) বিজ্ঞানে কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপকের মাত্রা ও সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তার ভিত্তিতে পূর্বভাস দেওয়া সম্ভব হয়। মনোবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করাই যেহেতু তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সম-পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন (মুখার্জী ২০০৩, ৯৪)।

ওয়াটসন বিজ্ঞানের মতো মনোনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়কেই তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। ফলে, আচরণই তাঁর কাছে একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। অন্তর্দর্শনকে (introspection) তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন (Watson 1919)। পদ্ধতিগত আচরণবাদ মানব আচরণকেই একমাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য মানস দশা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার অতিরিক্ত কোনো আধ্যাত্মিক মানস সত্তা স্বীকার করতে সে রাজী নয়।

এই তত্ত্ব অনুসারে, একজন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ দেখেই তার আন্তর মানস অবস্থানকে অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু, ঐ ব্যক্তির যেসব অভিব্যক্তি তাঁর বাহ্যিক আচরণে পরিলক্ষিত হয়, তার সবগুলিই যে মানসিক অবস্থার সূচক হবে, এমন কথাও

তো জোর দিয়ে বলা যায় না। মনে করা যাক, একজন ব্যক্তির আচরণ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে যে, তিনি যন্ত্রণাকাতর। কিন্তু এমন হতেই পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না। তিনি আসলে অভিনয় করছেন। অর্থাৎ আচরণবাদ মেনে নিলে যথার্থ অনুভব আর অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই অনেক আচরণবাদী মানস ধর্ম বলতে কোনো বিশেষ আচরণকে না বুঝে আচরণ প্রবণতাকে বুঝেছেন। যৌক্তিক আচরণবাদ পদ্ধতিগত আচরণবাদের সমস্যা থেকে এভাবেই মুক্ত হতে চেয়েছে।

মনোবৈজ্ঞানিক আচরণবাদ মানবদেহের বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে মানস জগতকে ব্যাখ্যা করতে চায়। পর্যবেক্ষণলব্ধ আচরণের সাহায্যে ব্যক্তির মানস জগতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বলে এই তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবী করেন। ইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov), এডওয়ার্ড থর্নডাইক (Edward Thorndike) এবং পরবর্তীকালে স্কিনারের চরমপন্থী আচরণবাদেও মনোবৈজ্ঞানিক আচরণবাদের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। মনোবৈজ্ঞানিক আচরণবাদে প্রাণী জগতের ক্ষেত্রে সেভাবে মন না স্বীকার করেও কেবলমাত্র উদ্দীপকের উপস্থিতিতে কীভাবে একটি প্রাণী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছে, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মানব জগতের ক্ষেত্রেও মানব মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করে কেবলমাত্র উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে মানব মনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এই কারণেই এই তত্ত্বের সমর্থকরা বিভিন্ন ধরনের পশুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, সেই পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত মানব জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন।

ওয়াসটসনের পদ্ধতিগত আচরণবাদের বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করে বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner) আচরণবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। যদিও অনেকে তাঁর তত্ত্বকে মনোবৈজ্ঞানিক আচরণবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান, অনেকে আবার স্কিনারকে চরমপন্থী আচরণবাদী (radical behaviourist) বলেও মনে করেন (Searle 2004, 51)। স্কিনার, ওয়াটসনের মূল বক্তব্যকে অনুসরণ করেছিলেন। স্কিনার মনে করতেন যে, মনোবিজ্ঞানকে যদি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয়, তাহলে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলিই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ একমাত্র তখনই বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মতো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। মন যেহেতু পর্যবেক্ষণলব্ধ নয়, তাই তার সম্বন্ধে যেমন কোনো নিয়ন্ত্রণও কাজ করে না, তেমনি কোনো পূর্বাভাসও দেওয়া সম্ভব হয় না।

ওয়াটসন আচরণকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধের সীমায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্কিনার তা চাননি। অন্তর্দর্শন যেমন আচরণের ব্যাখ্যা দিতে পারে না বলে স্কিনার বিশ্বাস করতেন, তেমন একইসঙ্গে স্নায়ুতান্ত্রিক কারণ, মানসিক ধ্যানধারণা প্রভৃতি কোনোটিই আচরণের কারণিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয় বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রাণীর প্রতিটি আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। পরিবেশের দ্বারা তা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং, প্রাণীর আচরণকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে ঐ বাহ্যিক পারিপার্শ্বিক শর্তগুলিকে এবং তাদের প্রভাবকে জানতে হবে, এবং সেইসঙ্গে তার উপর যদি সামাজিক কোনো প্রভাব থাকে তাহলে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির ইতিহাসও জানতে হবে (মিত্র, ২০০৩)।

অন্যদিকে দার্শনিক বা যৌক্তিক আচরণবাদ (philosophical/ logical behaviourism) অর্থগত বা ভাষাগত (senamtical) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেছে। যৌক্তিক আচরণবাদ অনুসারে মানস জগত বিষয়ক যে কোনো বাক্যই আচরণগত ভাষায় অনুবাদযোগ্য। অর্থাৎ কোনো একটি বাক্যে মানস জগত বিষয়ক কোনো পদ থাকলে তার অর্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেও একটি অমানস (non-mental) আচরণগত (ভৌত জগতের) ভাষার মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যৌক্তিক আচরণবাদ হল সেই তত্ত্ব যেখানে অনুভব, বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনার মতো সব মানস বিষয়গুলি আচরণ-প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তত্ত্বে মানস জগত বিষয়ক পদগুলি আচরণ সংক্রান্ত পদগুলির দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য (Hemple 1980)। অর্থাৎ মানস পদগুলি আচরণ-প্রবণতা সংক্রান্ত ভাষায় পর্যাবসানযোগ্য (reducible)। এই মতবাদ দার্শনিক বা যৌক্তিক বা বিশ্লেষণমূলক আচরণবাদ নামে পরিচিত, কারণ এই মতবাদ তাত্ত্বিক স্তরে মন সংক্রান্ত ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়ে আচরণ সংক্রান্ত ভাষার দ্বারা তাকে প্রতিস্থাপনের কথা বলে। একইসঙ্গে এই তত্ত্ব পদ্ধতিগত আচরণবাদের বিরোধী। পদ্ধতিগত আচরণবাদীর মতে, মন সংক্রান্ত কোনো বিষয়কে বিজ্ঞানের জগতে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। মন সংক্রান্ত বিষয়মাত্রই বিজ্ঞানের জগতে পরিত্যজ্য (Watson 1919)। অন্তর্দর্শনকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা পরিত্যাগ করে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের চর্চায় রত থাকাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

গিলবার্ট রাইল তাঁর দার্শনিক বা যৌক্তিক আচরণবাদে মন সংক্রান্ত ভাষার ব্যবহারকে পরিত্যাজ্য বলেননি; তিনি মন সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহারের বিরোধী নন। তাঁর

মতে, মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের আচরণকে বোঝার জন্য মন সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার করা যেতেই পারে। কিন্তু মন বিষয়ক কোনো বাক্যকে, রাইলের মতে, বুঝতে হলে তাকে 'যদি তবে' (if-then conditional) আকারে বুঝতে হবে, যেখানে তার পূর্বগ আর অনুগ (antecedent and consequent) উভয়ই পর্যবেক্ষণলব্ধ আচরণ বিষয়ক হবে। তিনি মনে করেছেন, এইভাবে খুব সহজে মন সংক্রান্ত ভাষাকে ব্যবহার করা যাবে, অথচ দেকার্তের মতো কোনো ভৌত জগত অতিরিক্ত অজড় মন স্বীকার করতে হবে না (Ryle 1949)। কোনো একজন ব্যক্তির কোনো একটি মানস অবস্থার (যৌক্তিক আচরণবাদ অনুসারে) অর্থ হল, ঐ ব্যক্তির বাস্তব এবং সম্ভাব্য আচরণ সংক্রান্ত বচনের একটি তালিকা, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির মানস অবস্থা অনুবাদযোগ্য। এই তালিকা যে আবশ্যিকভাবে ঐ ব্যক্তির বাস্তব বা বর্তমান আচরণ বিষয়কই হবে এমন নয়। সম্ভাব্য আচরণ বিষয়কও হতে পারে। কোনো ব্যক্তির মানস বিষয়ক ভাষা অবশ্যই ঐ ব্যক্তির সম্ভাব্য আচরণ তালিকার (যা প্রাকল্পিক বচনের আকারে প্রকাশিত) অন্তর্ভুক্ত বাক্যের মাধ্যমে অনুবাদযোগ্য হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে। অনুভব বিষয়ক এই মানস অবস্থাকে রাইল কীভাবে আচরণ বিষয়ক বাক্যের দ্বারা বুঝবেন, তা দেখা যাক্ -- 'রামের যন্ত্রণা হচ্ছে' -- এই বাক্যটি রামের একটি মানস অবস্থাকে প্রকাশ করে। রাইল কয়েকটি সম্ভাব্য প্রাকল্পিক বাক্যের মাধ্যমে বাক্যটির অর্থ নির্ণয় করবেন, যা সম্পূর্ণভাবে আচরণ বিষয়ক বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

<u>যদি</u>	<u>তবে</u>
• রামকে প্রশ্ন করা হল : তোমার কি যন্ত্রণা হচ্ছে?	রাম প্রত্যুত্তরে বলল, হ্যাঁ

- রামের রক্তচাপ মাপা হল — উচ্চ রক্তচাপ পাওয়া গেল
- রামের সি-তন্তুকে উত্তেজিত করা হল — রাম যন্ত্রণা কাতরোক্তি করে উঠল।

একইভাবে যদু বিশ্বাস করে যে, 'আজ বৃষ্টি হবে'। যদুর এই বিশ্বাস নামক মানস অবস্থাকে রাইল কতকগুলি প্রাকল্পিক আচরণ সংক্রান্ত বাক্যের মাধ্যমে বুঝতে চাইবেন। যেমন,

- যদি যদু বাড়ীর বাইরে যায় তাহলে সে ছাতা নেবে।
- যদি তার জানালা খোলা থাকে তাহলে সে জানালা বন্ধ করবে|
- যদি ছাদে বা বারান্দায় জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া থাকে তাহলে সে সেগুলো তুলে রাখবে....

এখান থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হল, রাইল কতকগুলি পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ আচরণের সাহায্যে মানস জগত বিষয়ক শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। একজন ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার তালিকা তৈরি করে প্রাকল্পিক বাক্যের আকারে তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তার মাধ্যমে তিনি অজড়, অভৌত কার্তেসীয় মনকে এড়িয়েও ব্যক্তির মানস জগতের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। অথবা বলা যায় যে, তিনি ব্যক্তির মানস জগত প্রকাশক ভাষার বস্তুনিষ্ঠ, পর্যবেক্ষণলব্ধ অর্থপ্রদানের প্রয়াস দেখিয়েছেন (Ryle 1949)|

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আচরণবাদ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করলেও কয়েক দশক পর তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। আচরণবাদের বিরুদ্ধে নানা

সমালোচনা হতে শুরু করে। মনোবিদ্যার জগতে পদ্ধতিগত প্রকল্প হিসেবে আচরণবাদ খুব বেশী সাফল্য লাভ করেছে বলে সার্ল মনে করেননি (Searle 2004, 32)। সেকারণে আচরণবাদ বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে সার্ল নোয়াম চমস্কির (Noam Chomsky) মত উল্লেখ করেছেন। চমস্কি (সার্লের মতে) বলেন যে, আচরণবাদের মূল দাবীটিই অর্থহীন। কারণ তাঁর মতে, পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাকে পরিমাপ সূচক (meter reading) বিষয়ক আলোচনা বলে গণ্য করা আর মনোবিদ্যাকে আচরণ বিষয়ক আলোচনা হিসেবে গণ্য করা সমান। পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তার ভিত্তিতে নিশ্চয়ই পদার্থবিজ্ঞানকে পরিমাপ বিষয়ক আলোচনা বলে গণ্য করা যায় না। চমস্কি মনে করেন যে, অনেক সময়ই আলোচ্য বিষয় এবং ঐ বিষয় সমর্থনকারী প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য করা সমস্যাজনক হয়, কিন্তু সমস্যা হলেও তাদের পার্থক্য তো থাকেই। পদার্থবিজ্ঞান পদার্থের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে, আর বিভিন্ন পরিমাপের সূচকের সাহায্যে পদার্থগুলির অস্তিত্ব বা তাদের বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক একইভাবে, চমস্কি দাবী করেন যে, মনোবিদ্যা মানব মন বিষয়ক একটি আলোচনা যেখানে মানব আচরণের সাহায্যে মানব মনের বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর মতে আচরণ কেবলমাত্র মানব মনের অস্তিত্বের প্রমাণ, তা মানব মন নয় (Searle 2004, 52-3)।

সার্ল মনে করেছেন যে যৌক্তিক আচরণবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি আরো বেশী জোরালো। তাঁর মতে, আজ পর্যন্ত কোনো যৌক্তিক আচরণবাদীই মন সংক্রান্ত বচনকে কীভাবে আচরণ সংক্রান্ত বচনে অনুবাদ করা যেতে পারে, তার সুস্পষ্ট কোনো পদ্ধতি

বলতে পারেননি। রাইল প্রমুখ দার্শনিকরা প্রাকল্পিক বচনের মাধ্যমে এই অনুবাদ প্রক্রিয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সার্ল মনে করেন, প্রাকল্পিক বচনের পূর্বগগুলির (antecedents) সঠিকভাবে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ এবং তিনি আরো মনে করেন যে, যদি তা পাওয়া যায়ও, চক্রক দোষ (fallacy of circularity) এড়িয়ে তা করা প্রায় অসম্ভব। বিষয়টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝা যাক, মনে করা যাক, যদু বিশ্বাস করে যে, 'আজ বৃষ্টি হবে'। এই মানস দশা (বিশ্বাস) প্রকাশক বচনটিকে আমরা রাইলকে অনুসরণ করে আগেই আচরণ প্রবণতা প্রকাশক বচনের মাধ্যমে অনুবাদ করেছি। যদুর বিশ্বাস যে আজ বৃষ্টি হবে, তা আমরা বুঝেছি, যদুর ছাতা সঙ্গে নিয়ে বেরোনো, জানালা বন্ধ করা প্রভৃতি দেখে। কিন্তু এই সবের ক্ষেত্রেই আমাদের একটি পূর্ব স্বীকৃতি ছিল। যা আমরা লক্ষ করিনি, তা হল, যদু বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না। অর্থাৎ সার্লের মতে, যদুর বিশ্বাসকে যৌক্তিক আচরণবাদী যখন যদুর আচরণ প্রবণতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করছেন তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদুর বৃষ্টি এড়ানোর আচরণের মাধ্যমেই তা করা হচ্ছে। যদুর বিশ্বাসকে যখন তার আচরণে পর্যবসিত করা হচ্ছে তখন যদুর ভিজতে না চাওয়ার ইচ্ছাকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কারণ, যদু বিশ্বাস করে যে আজ বৃষ্টি হবে, তাই সে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে-- একথা তখনই বলা যাবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে বৃষ্টিতে ভিজতে অনিচ্ছুক। সার্ল মনে করেন যে, এক্ষেত্রে যৌক্তিক আচরণবাদীরা 'বিশ্বাস' নামক নামস দশাকে 'ইচ্ছা' নামক মানস দশার সাহায্যে বিশ্লেষণ করছেন। এর মধ্যে একটি চক্রক দোষের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে বলে সার্ল অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, যৌক্তিক আচরণবাদীরা যে এক্ষেত্রে বিশ্বাসকে শুধুমাত্র আচরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলেন, তাই নয়, বরং বিশ্বাসকে তাঁরা আচরণ এবং ইচ্ছাতে পর্যবসিত করলেন।

সুতরাং, এখানে আচরণ ছাড়া আরো একটি মানস দশা (ইচ্ছা) অবিশ্লেষিত থেকে গেল। আবার, ইচ্ছাকে যদি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও একইভাবে চক্রক দোষ হবে বলে তিনি মনে করেন। কারণ, যদু শুকনো থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাই সে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে — এই কথাটি তখনই অর্থপূর্ণ হবে বা যদুর আচরণটি তখনই সঙ্গত হবে যদি যদু বিশ্বাস করে যে, আজ বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ ইচ্ছাকে আচরণ প্রবণতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং চক্রক দোষ এড়ানো আচরণবাদীদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলেই সার্ল মনে করেন (Searle 2004, 53)।

সার্ল আরো আপত্তি করেন যে, যৌক্তিক আচরণবাদীদের দাবী আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। যৌক্তিক আচরণবাদীরা মানস দশাকে আচরণ বা আচরণ প্রবণতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান। মানস দশা মাত্রেই আচরণ প্রবণতার সাহায্যে অনুবাদযোগ্য বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা ভিন্নরকম অনুভব করি বলেই সার্ল দাবী করেন। সার্লের মতে, মানস দশা ও বাহ্যিক আচরণের মধ্যে কারণিক সম্বন্ধ আছে বলেই আমাদের মনে হয়। মাথা ব্যথা হয় বলেই মানুষ ওষুধ খায়, যদু বিশ্বাস করে যে, 'আজ বৃষ্টি হবে', তাই সে ছাতা নিয়ে বের হয়। মানস দশা মানব আচরণের কারণ। আচরণবাদীরা এই স্বাভাবিক কারণিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে চান। সার্লের ভাষায়, "The logical behaviorists had argued that mental states consisted in nothing but behavior and dispositions to behavior, but this runs against our common sense intuition that there is a causal relation between our inner mental states and our outward behavior." (Searle 2004, 53)।

বাহ্যিক আচরণের বাইরে যে একটা আন্তর অভিজ্ঞতার জগত আছে, তা তাঁরা মানতেই চান না। আর তাছাড়া ব্যথার অনুভব ও ব্যথা প্রকাশক আচরণ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

যৌক্তিক আচরণবাদীরা বিশেষ ধরনের আচরণ প্রবণতা ও বিশেষ ধরনের মানস দশাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু মানস অনুভব এবং তার বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে সে একটি সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তা আচরণবাদে প্রমাণিত হয় না। মানস দশাকে বোঝার জন্য আচরণ প্রবণতা যে পর্যাপ্ত নয়, তা বোঝানোর জন্য সার্ল তাঁর *The Rediscovery of the Mind* গ্রন্থে বিষয়টি পাটনামের একটি কল্প-পরীক্ষণের কথা বলেছেন (Searle 2002, 35)। হিলারি পাটনাম (Hilary Putnum) তাঁর *Brains and Behaviour* (1980) রচনায় একটি কল্প-পরীক্ষণের সাহায্যে যৌক্তিক আচরণবাদীদের সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই যুক্তি মনোদর্শনের জগতে 'সুপার স্পার্টানের' যুক্তি নামে খ্যাত। পাটনাম এমন এক সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করেছেন, যারা তাদের সব যন্ত্রণার অনুভূতিকে সার্থকভাবে দমন করতে সক্ষম। তারা যতই যন্ত্রণা অনুভব করুক না কেন, তাদের বাহ্যিক আচরণে তা কখনোই প্রকাশিত হয় না। যদিও বা কখনো তারা যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে, তাও খুব নম্রভাবে, সুস্থ-স্বাভাবিক স্বরের মাধ্যমেই প্রকাশ করে। কখনোই যন্ত্রণার কষ্টজনিত কোনো প্রকাশ তাদের আচরণে পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ তারা যন্ত্রণা অনুভব করলেও তা প্রকাশে তারা অনিচ্ছুক। পাটনামের এই কল্প-পরীক্ষণ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মানস দশার সঙ্গে আচরণের বা আচরণ প্রবণতার কোনো আবশ্যিক সম্বন্ধ নেই। আর তাছাড়া কোনো একটি মনোধর্ম বা মানস দশার সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের আচরণ প্রবণতাকে অভিন্ন বলে মনে করা আরো নানা কারণে যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন, একজন ব্যক্তির যন্ত্রণাবোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি

হয়তো সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। আবার, বিপরীত ঘটনাও সত্য হতে পারে। কোনো ব্যক্তির যন্ত্রণাবোধ না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে যন্ত্রণাকাতর রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে পারেন। উক্ত দুটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রকৃত মানস দশা তার আচরণ প্রবণতা থেকে নিঃসৃত হয় না। আবার এমনও হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই যন্ত্রণাকাতর এবং তিনি তা প্রকাশ করতে আগ্রহী, কিন্তু দেহযন্ত্র বিকল থাকার কারণে বা অঙ্গহানি ঘটার কারণে তিনি হয়তো তা প্রকাশে অক্ষম। সেক্ষেত্রেও আচরণ প্রবণতার সাহায্যে মানস দশা চিহ্নিত হতে পারবে না। এইরকম নানা সমস্যার কারণে আচরণবাদ মনোদর্শনের জগতে তার গুরুত্ব হারিয়েছে (Searle 2002, 35)।

আচরণবাদ মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতেই রাজী নয়। তাই মানস কারণতার কোনো প্রসঙ্গই আচরণবাদে আসেনি। দেহ থেকে স্বতন্ত্র মনই যেহেতু স্বীকৃত নয়, তাই দেহ-মনের সমস্যার সমাধানের কোনো সূত্র আচরণবাদ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

আচরণবাদের নানা সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য বিকল্পের অনুসন্ধান শুরু হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সবকিছুকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা শুরু হল। পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জড়বাদী চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু করল। পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের (logical positivists) হাত ধরেই জড়বাদী চিন্তার প্রসার ঘটে। তাঁরা ভৌত জগতের অতিরিক্ত কোনো জগত স্বীকার করতে আগ্রহী নন। পদার্থবিজ্ঞান এই জগতের সব বিষয়ের জড়ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, এক্ষেত্রে 'জড়' ও

‘ভৌত’ শব্দ দুটি সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যদিও প্রথাগত বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে শব্দটির ভিন্ন অর্থই প্রকাশিত হবে। প্রথাগত বিজ্ঞানে ‘জড়’ বলতে সেইসব বিষয়কেই বোঝা হত যা বিস্তৃতিযুক্ত, কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে যা বিস্তৃতিযুক্ত নয়, যেমন- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। প্রাচীন মতে জড় না হলেও এগুলি ভৌত জগতের বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানে স্বীকৃত। পদার্থবিজ্ঞান এই জগতের সব বিষয়কে ভৌত সত্তায় পর্যবসিত করল। মনোবিজ্ঞানের জগতও এই চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবতে শুরু করল যে, যদি সব বিষয়ের ভৌতব্যাখ্যাই পর্যাপ্ত হয়, তাহলে অভৌত জগত স্বীকার করার প্রয়োজন কী? কারণ একটি সত্তা স্বীকার করেই যদি সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তাহলে দুটি সত্তা স্বীকার করা অর্থহীন। কারণ ভৌত জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে তো কারোরই কোনো সংশয় নেই। অন্যদিকে, অভৌত আধ্যাত্মিক জগত আছে কিনা সে বিষয়ে কারোরই সংশয়ের সীমা নেই। তাই আধ্যাত্মিক অভৌত জগত বা অভৌত সত্তা স্বীকার না করে ভৌত জগতের মধ্যেই সব বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বিজ্ঞানের ভাষাকেই আদর্শ হিসেবে গণ্য করতেন এবং সববিষয়ই বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদযোগ্য বলে মনে করতেন। পদার্থবিজ্ঞানে যে ভাষা, যে নিয়ম ব্যবহৃত হয় সেটিই হবে অন্যান্য সব বিজ্ঞানের ভাষা। এমনকি মনোবিদ্যাও (psychology) তার ব্যতিক্রম হবে না। কারনাপের (Carnap) রচনার এই চিন্তা খুবই স্পষ্টভাবে পরিস্ফূট হয় (Carnap 1991)। মনোবিদ্যাকে যথার্থ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যই মনোবিদ্যার ভাষাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদযোগ্য করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। আচরণবাদ বাহ্যিক আচরণের সাহায্যে তা করার চেষ্টা করল কিন্তু তার অনেক সমস্যা দেখা দিল।

যখন কোনোভাবেই এর সমাধান করা সম্ভব হল না, তখন ফেইল (Feigl 1958), প্লেস (Place 1954) প্রমুখ মনোদার্শনিকরা অন্য পথ অবলম্বন করলেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরা মানস দশা বা অভিজ্ঞগুলির বাস্তব সত্যতা স্বীকার করতেন এবং মানস দশাগুলিকে কীভাবে বিজ্ঞানের ভাষায় বর্ণনা করা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁরা মনে করলেন যে, মানস অভিজ্ঞতাবাচক পদগুলি বর্জন করাই শ্রেয়। মানস-ভৌত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট দুটি স্বতন্ত্র জগতকে কোনো দৃঢ় নিয়মের অধীনে আনা অসম্ভব, তাই দুটি স্বতন্ত্র জগত স্বীকার করার পরিবর্তে একটি জগত স্বীকার করাই শ্রেয়। সেই কারণেই তাঁরা মানস দশা ও মস্তিষ্ক দশার মধ্যে অভিন্নতার সম্বন্ধ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করলেন। এই তত্ত্বই মনোদর্শনের জগতে মন-মস্তিষ্ক অভেদতত্ত্ব বা অভিন্নতাতত্ত্ব (mind-brain identity theory) নামে খ্যাত। ইউ. টি. প্লেস (U. T. Place) ও এইচ ফেইল (H. Feigl) এই তত্ত্বের প্রাণপুরুষ হিসেবে গণ্য হতে পারেন।

স্মার্ট (J. J. C. Smart 1959) প্রাথমিকভাবে আচরণবাদের সমর্থক ছিলেন। গিলবার্ট রাইলের (1949) যৌক্তিক আচরণবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রাইলের তত্ত্ব যখন আন্তর অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হল, এবং আচরণবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির যখন কোনো সদুত্তর আচরণবাদ দিতে সক্ষম হল না তখন প্লেসের অভিন্নতাতত্ত্বের প্রতি স্মার্ট আকৃষ্ট হলেন। কারণ আচরণবাদীদের পক্ষে প্লেসের তত্ত্বকে খণ্ডন করা সম্ভব হল না।

স্মার্ট, প্লেস প্রমুখ চিন্তাবিদদের অভেদতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ হল স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতি। স্নায়ুবিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই জানা সম্ভব হয়েছে যে, মস্তিষ্ক কীভাবে আমাদের বিভিন্ন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, দেহের উপর মনের ক্রিয়া সততই রহস্যময়। তাই, জড়বাদের প্রবক্তাদের কাছে, মনকে বা মানস অবস্থাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য স্নায়ুবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনকে বা মানস দশাকে আচরণ প্রবণতার সাহায্যে ব্যাখ্যা না করে, মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবী করলেন। এই তত্ত্ব অনুসারে মানস দশার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকৃত হল না,— "... mental states and processes are identical with brain states and processes ..." (Nath 2013, 53)।

প্লেস (1956) অভিন্নতাতত্ত্বকে বর্ণনা করার সময় মানস দশা আর মস্তিষ্ক দশাকে অভিন্নরূপে গণ্য করলেন। ভৌতবাদীরা (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অভিন্নতাতত্ত্ব পাশ্চাত্য মনোদর্শনের জগতে 'ভৌতবাদ' (physicalism) নামে পরিচিত) ভৌত দশার অতিরিক্ত কোনো মানস দশার অস্তিত্ব স্বীকারই করেন না। অর্থাৎ তাঁদের মতে প্রতিটি মানস অনুভূতি অবশ্যই কোনো একটি স্নায়ুতান্ত্রিক শারীর দশার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো একটি মানস দশা (ধরা যাক যন্ত্রণা) কি কোনো একটি ভৌত দশা বা মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে? 'যন্ত্রণা' আর মস্তিষ্ক দশার অর্থ তো অভিন্ন নয়, তাহলে তারা অভিন্ন হবে কীভাবে? প্লেস, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'The Concept of Heed' প্রবন্ধে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যখন বলা হয় যে, 'এই টেবিলটি আসলে একটি বাতিল প্যাকিং বাক্স' তখন নিশ্চয়ই বোঝানো হয় না যে, টেবিলের অর্থ আর প্যাকিং বাক্সের অর্থ অভিন্ন, অথচ তাদের অর্থ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও

তাদের অভিন্নতার সম্বন্ধ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। ঠিক একইভাবে, অনুভূতি আর মস্তিষ্ক দশার অর্থ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অভিন্নতার সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় 'অর্থ' (meaning) আর 'বাচ্যে'র (referent) পার্থক্যের মধ্য দিয়ে। দুটি বিষয়ের অর্থ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাচ্য এক হতে পারে। মস্তিষ্ক বিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে জানা সম্ভব হয়েছে যে, সংবেদন আর মস্তিষ্ক অভিন্ন। মস্তিষ্কের স্নায়ুর উত্তেজনাই হল সংবেদন, তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয় (Smart 1959)। এই তত্ত্ব আচরণবাদের ত্রুটিকেও পরিহার করতে সক্ষম হল, কারণ প্রকৃত যন্ত্রণার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে যে স্নায়ু উত্তেজিত হয়, মেকি যন্ত্রণার ক্ষেত্রে তা কখনোই হয় না। আচরণবাদী যন্ত্রণাকে বাহ্যিক আচরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। কোনো ব্যক্তি যন্ত্রণাক্লিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও যদি যন্ত্রণাকাতর হবার অভিনয় করেন, তাহলে আচরণবাদীর পক্ষে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিন্নতাবাদী এদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন। যেহেতু প্রকৃত ব্যথার ক্ষেত্রে যে স্নায়ুটি উত্তেজিত হবে, মেকি ব্যথার ক্ষেত্রে তা হবে না।

আর্মস্ট্রং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *A Materialist Theory of the Mind* বইতে মন-মস্তিষ্ক অভেদের কথা বলেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি মনে করলেন, মানুষ ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি মানস দশাকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তিনি আচরণবাদীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতে, আচরণবাদীরাই প্রথম মানস দশা বা আভ্যন্তরীণ অনুভবকে বাহ্যিক বিষয়ের (আচরণের) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করলেন। যদিও আর্মস্ট্রং-এর মতে, আচরণবাদীরা একটি ছোট ভুল করেছেন, আভ্যন্তরীণ দশাকে

বাহ্যিক আচরণের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা ঠিক নয়, বরং এগুলো আমাদের বাহ্যিক আচরণের কারণ। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় অনুভব করি যে, আমাদের মানস অনুভবগুলি আমাদের বাহ্যিক আচরণের কারণ। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল,— আচরণের পশ্চাতে যে কারণগুলির অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি তার প্রকৃত স্বরূপ কী? আর্মস্ট্রং বললেন, এগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভৌত দশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্মার্টও মানস দশাকে স্নায়ুতান্ত্রিক শারীর দশার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করলেন। তাঁরা ব্যথা বা যন্ত্রণা বলতে কোনো একজাতীয় স্নায়ুতান্ত্রিক শারীর দশাকেই বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, কোনো একজাতীয় মানস দশা অবশ্যই কোনো একজাতীয় স্নায়ুতান্ত্রিক শারীর দশার সঙ্গে অভিন্ন হবে। যেমন, যন্ত্রণা হল সি-তন্তুর উত্তেজনা। কোনো এক ধরনের মানস দশা, কোনো এক ধরনের ভৌত দশার সঙ্গে অভিন্ন হবে। এই তত্ত্বই প্রকারগত অভিন্নতাতত্ত্ব (type-type identity) নামে খ্যাত। প্রকারগত অভিন্নতাতত্ত্ব মনে করে যে, কোনো একটি মানস ধর্ম যদি বাস্তব জগতে কোনো একটি ভৌত ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাহলে সম্ভাব্য জগতেও সেই অভিন্নতা অটুট থাকবে। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, সকল যন্ত্রণার ক্ষেত্রই হল 'সি-তন্তুর উত্তেজনার ক্ষেত্র'। সবক্ষেত্রেই অভিন্নতার সম্বন্ধটি এই রকম বিধির আকারে প্রকাশযোগ্য।

অভেদতত্ত্বের বিরুদ্ধে সার্ল (Searle) নানা আপত্তির উল্লেখ করেছেন। সার্লের মতে, অভেদতত্ত্ব লাইবনিজের 'Law of identity of indecernible' সূত্রকে অগ্রাহ্য করে, (Searle 2004, 55) লাইবনিজের সূত্র অনুযায়ী, দুটি বস্তুকে তখনই অভিন্ন বলা যাবে, যদি ধর্মের দিক থেকে দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো ভিন্নতা না থাকে। সুতরাং যদি দেখানো

সম্ভব হয় যে, মানস দশার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যা মস্তিষ্ক দশায় অনুপস্থিত, আবার অন্যদিকে যদি দেখানো যায় যে, মস্তিষ্ক দশার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যা মানস দশায় থাকতে পারে না, তাহলেই অভিন্নতার নীতি অনুযায়ী অভেদতত্ত্ব খণ্ডিত হয়ে যায়।

সার্ল আরো বলেন যে, কোনো কোনো চেতন দশার নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে। যেমন, আমার পায়ে ব্যথা করছে অর্থাৎ ব্যথার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, কিন্তু অভেদতত্ত্ব অনুযায়ী ঐ ব্যথার মূল উৎস যে মস্তিষ্ক দশাটি, তা মস্তিষ্কে আছে, পা-এ নয়। অর্থাৎ স্নায়ু-শারীর দশাটির অবস্থান আর মানস দশাটির অবস্থান অভিন্ন নয়, তারা দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সার্ল অভিযোগ করেছেন যে, অবস্থানগত দিক থেকে যেহেতু দুজনের পার্থক্য আছে, তাই বলাই যায় যে, মস্তিষ্ক দশার ধর্ম আর মানস দশার ধর্ম অভিন্ন নয়। লাইবনিজের অভিন্নতা সূত্র এখানে বিঘ্নিত হবেই। সুতরাং বলা যায় যে, অভেদতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয় ("...the properties of the brain state are not the same as the properties of the mantal state. Therefore physicalism is false." (Searle 2004, 56)।

তবে অভেদতাত্ত্বিকরা এই আপত্তির খুব সহজ সমাধান দিতে পারবেন বলেই সার্ল মনে করেছেন। অভেদতাত্ত্বিকদের মতে, এই আপত্তিটির ভিত্তিই হল অজ্ঞতা। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, তখন আর এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থাকবে না। মানস দশার ক্ষেত্রে দৈশিক অবস্থান স্বীকার করার ক্ষেত্রে কার্তেসীয় চিন্তায় যে আপত্তি ছিল, তাও

থাকবে না। দেকার্ত মনের বিস্তৃতি স্বীকার করতে চাননি, মনের কোনো দৈশিক অবস্থান সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন। অভেদতাত্ত্বিকদের মতে, তা একটি ভ্রান্ত ধারণা। স্নায়ুবিজ্ঞানের উন্নতি হলেই এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূরীভূত হবে, আর মানস দশা ও মস্তিষ্ক দশা যে অভিন্ন তাও সহজেই বোধগম্য হবে। মানস অনুভূতির সুনির্দিষ্ট অবস্থান (যেমন, পা-এর নখে ব্যথা) নিয়ে অভেদতাত্ত্বিকরা বলতে পারেন যে, তাঁরা ব্যথা বা যে কোনো মানস দশার সামগ্রিক রূপটি নিয়েই আলোচনা করেন, যা পা-এর নখের প্রান্তিক স্তরের স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে শুরু করে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত সম্পূর্ণ পদ্ধতিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং, উপরোক্ত আপত্তিটি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই অভেদতাত্ত্বিকরা দাবী করতে পারেন (Searle 2004, 57)।

সার্ল অবশ্য অভেদতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে আরো নানা আপত্তির কথা বলেছেন। সার্ল মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই অভেদতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। অভিন্নতার সম্বন্ধ সবসময়ই দুটি দ্রব্য বা দুটি ধর্মের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন, জল হল H_2O। যখন জল আর H_2O-কে অভিন্ন বলা হয়, তখন মনে করা হয় যে, জলের ধর্মগুলি যে বিষয়কে চিহ্নিত করে, H_2O–র ধর্মগুলিও সেই বিষয়কে চিহ্নিত করে। সেই একই যুক্তিতে যন্ত্রণাকে যদি সি-তন্তুর উত্তেজনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়, তাহলে একইভাবে একইবস্তু উভয় ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি দুটি পৃথক ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে? যদি দুটি স্বতন্ত্র ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেই অভিন্নতা দেখাতে হয়, তাহলে দুটি স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্বও স্বীকার করতে হবে — মানস ও ভৌত ধর্ম। সুতরাং, খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, অভিন্নতা প্রকাশ করতে গিয়ে অভেদতত্ত্ব কি ধর্মদ্বৈতবাদে পরিণত হচ্ছে? সব মানস ধর্মই যদি মস্তিষ্ক ধর্ম হয় তাহলে

মানতে হয় যে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে দুধরনের মস্তিষ্ক ধর্ম আছে — মানস এবং অ-মানস। তাই, সার্ল প্রশ্ন তুলেছেন যে, অভেদতত্ত্ব যদি দুটি ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকারই করে, তাহলে ধর্মদ্বৈতবাদের সঙ্গে তার আর কি কোনো পার্থক্য থাকে?

অভেদতত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে, সংবেদন যদি স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয় তাহলে অভিন্নতার সম্বন্ধের কারণে তা সকলের কাছে সমানভাবে পরিস্ফূট হবার কথা। অভিন্নতা সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধীকে জানার অর্থই হল অন্য সম্বন্ধীকে জানা। 'P ≡ ~~ P' যদি সত্যি হয়, তাহলে 'P' কে জানলেই '~~p'কে জানা হয়ে যায়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারবেন। ফলে, যেকোনো ব্যক্তির পক্ষেই বলা সম্ভব যে, তার ব্যথা হলে তার মস্তিষ্কের কোন স্নায়ুটি উত্তেজিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, প্রকারগত অভিন্নতা তত্ত্বের অনেক ত্রুটি আছে।

অভিন্নতাবাদীরা অবশ্য এই আপত্তির উত্তরে বলতে পারেন যে, অভিন্নতা সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধীকে জানলেই অন্য সম্বন্ধীকে জানা যাবে— এই বক্তব্যটি একটি পূর্বস্বীকৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাহল — অভিন্নতা সম্বন্ধটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা। 'P'কে জানলেই '~~P' কে জানা সম্ভব হবে, যদি আগে থেকে জানা থাকে যে, 'P≡~~p'। কিন্তু তা জানা না থাকলে, 'P'-কে জানলেও '~~P'-র মূল্য যে একই, তা জানা সম্ভব হবে না। একটি মূর্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা অভিন্ন, কারণ তারা উভয়েই শুক্রগ্রহকে নির্দেশ করে। তাদের বাচ্য (referent) এক এবং অভিন্ন। কিন্তু তাদের অর্থ (sense/meaning) এক নয়। তারা আমাদের কাছে, অভিন্নরূপে উপস্থিত হয় না। ভোরবেলা পূর্ব আকাশে শুকতারাকে

দেখতে পাই, অন্যদিকে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে। দুটি তারার উপস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়। শুকতারা বলতে আমরা যা বুঝি, সন্ধ্যাতারা বলতে আমরা তা বুঝি না, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বুঝি। তাদের বাচ্য এক হলেও তারা একই বস্তুকে বাস্তবে নির্দেশ করলেও, তারা আমাদের কাছে একই অর্থ বহন করে না। সুতরাং, কেউ যদি না জানে যে শুকতারা এবং সন্ধ্যাতারা প্রকৃতপক্ষে শুক্রগ্রহেরই ভিন্ন নাম, তাহলে তাদেরকে অভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তার থেকে প্রমাণ হয় না যে, তারা অভিন্ন নয়। ঠিক একইভাবে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তি যদি না জানেন যে, মস্তিষ্ক ক্রিয়া আর মানস দশা অভিন্ন, তার থেকে প্রমাণ হয় না যে, তারা অভিন্ন নয়।

সল ক্রিপকে (Kripke 1980) অভেদতত্ত্বের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এই অভিন্নতার সম্বন্ধটি আবশ্যিকভাবে সত্য হতে পারে না। তাঁর মতে, যে দুটি বিষয়ের মধ্যে অভিন্নতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাদের বাচ্য (designation) যদি সুনির্দিষ্ট হয় তবেই সেই অভিন্নতা সম্বন্ধ আবশ্যিকভাবে সত্য হতে পারে, নচেৎ নয়। যেমন- 'রবীন্দ্রনাথ হলেন ভানুসিংহ' এই অভিন্নতা। সম্বন্ধটি আবশ্যিকভাবে সত্য কারণ এমন কোনো সম্ভাব্য জগতের কথা চিন্তা করা যায় না, যেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং ভানুসিংহ দুজন পৃথক ব্যক্তি। অন্যদিকে 'রবীন্দ্রনাথ হলেন গীতাঞ্জলীর স্রষ্টা' এই অভিন্নতা সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনো সম্ভাব্য জগতের কথা ভাবতেই পারি, যেখানে গীতাঞ্জলীর স্রষ্টা অন্য কোনো ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুনির্দিষ্ট বাচ্য (designation) থাকলেও, 'গীতাঞ্জলীর স্রষ্টার' কোনো সুনির্দিষ্ট বাচ্য নেই। ফলে, এই অভিন্নতা সম্বন্ধ

আবশ্যিক হতে পারে না। এই অভিন্নতা সম্বন্ধ মিথ্যা নয়, আবার, আবশ্যিকভাবে সত্যও নয়, তা হল আপতিক সত্য।

এই যুক্তির ভিত্তিতে ক্রিপকে দেহ-মনের অভেদ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অভিন্নতা সম্বন্ধে দুটি সম্বন্ধীই সাধারণভাবে দৃঢ় নির্দেশক (rigid designator) হয়ে থাকে। যেমন, জল হল H_2O। মনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অভেদতত্ত্ব মানস দশাগুলিকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। যন্ত্রণা নামক মানস দশাকে তাঁরা হয়তো সি-তন্তুর উত্তেজনা (C-fiber stimulation) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করবেন। কিন্তু ক্রিপকের মতে, এই সম্বন্ধটিও আবশ্যিক নয়, কারণ, এমন কোনো প্রাণীর কথা আমরা ভাবতেই পারি, যার যন্ত্রণা আছে কিন্তু সি-তন্তু নেই। অভিন্নতার সম্বন্ধ আবশ্যিকভাবে সত্য হয় যদি তার দুটি সম্বন্ধীই দৃঢ় নির্দেশক (rigid designator) হয়। দেহ-মনের অভেদতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা না হওয়ায়, এই অভেদকে আবশ্যিক সত্য হিসেবে গণ্য করা যায় না।

থমাস নেগেল (Negel 1974) অভেদতত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছেন যে, যদি আমাদের সব মানস অভিজ্ঞতাই স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাহলে মনে হয় যে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলেই মানস অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। কিন্তু নেগেলের মতে, তা প্রকৃতপক্ষে হয় না। তিনি একটি কল্প-পরীক্ষণের (thought experiment) মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মনে করা যাক্, একজন ব্যক্তি বাদুড়ের স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা, মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করলেন। বাদুড় কীভাবে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে, কীভাবে

শব্দের প্রতিধ্বনির ভিত্তিতে দিক নির্ণয় করে, কীভাবে রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করে, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেও কিন্তু ঐ ব্যক্তির পক্ষে বাদুড়ের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হবে না। চেতনার ব্যক্তি সাপেক্ষতাই (subjectivity) চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য। নেগেল মনে করেন, চেতনার বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়ে চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করা কখনোই সম্ভব হবে না।

অস্ট্রেলীয় মনোদার্শনিক ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন (Jackson 2002) একইধরনের যুক্তির মাধ্যমে ভৌতবাদের সমালোচনা করেছেন। জ্যাকসন, মেরী নামক একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞের কল্পনা করেছেন, যিনি বর্ণ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধীয় মানব স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, এবং একইসঙ্গে বর্ণ এবং আলোকরশ্মির ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধেও যিনি সম্যক ওয়াকিবহাল। এখন, মনে করা যাক যে, মেরী জন্মাবধি কেবল সাদা, কালো আর ধূসর রঙই দেখেছেন, অন্য কোনো রং দেখার অভিজ্ঞতা কখনো তাঁর হয়নি। জ্যাকসনের মতে, যদিও মেরীর লাল-নীল প্রভৃতি অন্যান্য রং সম্বন্ধে যাবতীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লাল রং দেখতে কেমন — সে বিষয়ে মেরীর কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ, ভৌতবাদী তত্ত্ব অনুসারে কোনো একটি মানস দশা বিষয়ক যাবতীয় তথ্য ঐ মানস দশার অনুভবের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বিশেষতঃ বর্ণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত, যার মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, আন্তর অভিজ্ঞতার (inner experience) গুণগত দিকটি ভৌতবাদসম্মত তত্ত্বে আদৌ ব্যাখ্যাত হয় না।

অভেদতত্ত্বের বিরুদ্ধে উগ্রপ্রজাতিবাদের (species chauvinism) আপত্তিও ওঠে। অনেকে একে 'neuronal chauvinism' (Searle 2004, 59) আখ্যা দিয়েছেন। কোনো এক জাতীয় মানস দশা (যেমন, যন্ত্রণা/বিশ্বাস) যদি কোনো এক জাতীয় মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন হয় তাহলে মানতে হবে, যে সব প্রাণীর মানুষের মতো স্নায়ুতন্ত্র নেই, তাদের ঐ ধরনের কোনো মানস দশাও থাকতে পারবে না। কিন্তু এমন কোনো জীব থাকতে পারে, যার যন্ত্রণা বোধ আছে, অথচ মানবসুলভ স্নায়ুতন্ত্র নেই। অথবা এমন কোনো যন্ত্রের কথা কি কল্পনা করা যায় না, যার মানস দশা আছে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র বলে কিছুই নেই। এইসব সমস্যার কারণে প্রকারগত অভেদতত্ত্ব বর্জন করে, অনেক অভেদতাত্ত্বিক নিদর্শনগত অভেদতত্ত্বকে গ্রহণ করলেন। প্রকারগত অভেদতত্ত্বে মনে করা হত যে, একজাতীয় মানস দশা অবশ্যই একজাতীয় ভৌত দশার সঙ্গে অভিন্ন হবে, কিন্তু নিদর্শনগত অভেদতত্ত্ব (token-token identity theory) সে কথা বলে না। প্রত্যেক মানস দশা কোনো না কোনো ভৌত দশার সঙ্গে অভিন্ন (Fodor 1974) প্রত্যেক মানস দশা অবশ্যই কোনো একটি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সঙ্গে অভিন্ন। সার্ল একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিদর্শনগত অভেদতত্ত্বকে বুঝিয়েছেন। কেউ হয়তো বিশ্বাস করেন যে, ডেনভার হল কলোরাডোর রাজধানী। তার এই বিশ্বাস অবশ্যই তার মস্তিষ্কের কোনো একটি অংশে অবস্থিত। অন্যদিকে, অন্য একজন মানুষও একই কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু তার ক্ষেত্রে হয়তো ঐ বিশ্বাস তার মস্তিষ্কের অন্য কোনো অংশে অবস্থিত। যদিও বিশ্বাস দুটি এক (Searle 2004, 60)।

সার্লের মতে নিদর্শনগত অভেদতত্ত্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, নিদর্শনগত অভেদতত্ত্বে দাবী করা হয় যে, দুটি বিষয় ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভিন্ন

হওয়া সত্ত্বেও, মানস বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অভিন্ন হতে পারে। দুজন ব্যক্তির মানস দশা, মনে করা যাক, বিশ্বাস বা যন্ত্রণা এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা ভিন্ন। এখন সার্ল এখানে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হল,— দুজন ব্যক্তির স্নায়ুতান্ত্রিক দশা যদি ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের মানস দশা দুটি অভিন্ন হল কীভাবে? ঐ মানস দশা দুটির মধ্যে কি কোনো সাধারণ (common) ধর্ম উপস্থিত? সার্ল মনে করেন যে, নিদর্শনগত অভেদতাত্ত্বিক কিন্তু নিজের সমর্থনে কখনোই বলতে পারতেন না যে, ঐ দুটি মানস দশার ক্ষেত্রে কোনো একটি মানস বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে উপস্থিত। কেননা, তাঁরা তো মানস বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যই অস্বীকার করেন। আবার তাঁরা একথাও বলতে পারবেন না যে, এগুলি একই ধরনের মস্তিষ্ক দশা, কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রকারগত অভেদতত্ত্বের সমস্যার সম্মুখীন হবেন (Searle 2004, 61)।

হিলারি পাটনাম তাঁর *"The Nature of Mental state"* (1967) প্রবন্ধে অভেদতত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'multiple realizability' বা বহুরূপায়ণযোগ্যতার আপত্তি তুলেছেন, যা দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পাটনামের মতে, এ জগতে এমন অনেক জীব আছে যাদের যন্ত্রণা অনুভবের সক্ষমতা আছে বলেই মনে হয়। এখন, অভেদতাত্ত্বিকরা দাবী করেন যে, কোনো একজাতীয় মানস দশা অবশ্যই কোনো একজাতীয় মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন হবে। ফলে, যন্ত্রণা মাত্রই মানব স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অভিন্ন হবে। অন্যান্য জীবের স্নায়ুতন্ত্র যেহেতু মানব স্নায়ুতন্ত্র থেকে ভিন্ন, তাই তাদের ক্ষেত্রে যন্ত্রণার উৎপত্তি আর স্বীকারই করা সম্ভব হবে না। পাটনামের এই যুক্তিটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. সব মানস দশার ক্ষেত্রেই বলা যায় যে, কোনো একপ্রকারের মানস দশা সবসময়ই বহুবিধ ভৌত প্রকারের মাধ্যমে রূপায়িত হতে পারে (multiply realized by distinct kind)।

২. যদি কোনো একপ্রকারের মানস দশা বিভিন্ন ভৌত প্রকারের মাধ্যমে রূপায়ণযোগ্য হয়, তাহলে তা কখনোই কোনো একটি বিশেষ ভৌত প্রকারের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না।

/∴ কোনো মানস প্রকারই কোনো বিশেষ ভৌত প্রকারের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না।

এখন, অভেদতত্ত্বে যেহেতু দেহাতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত নয়, তাই অভেদতত্ত্বের সাহায্যে মানস কারণতা বা দেহমনের সম্বন্ধ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়াও সম্ভব নয়।

অভেদতত্ত্বের নানা সমস্যা অনুধাবন করে পাটনাম (1967), ফোডর (1974) প্রমুখ মনোদার্শনিকরা একটি বিকল্প তত্ত্বের চিন্তা করতে শুরু করলেন। অভেদতাত্ত্বিকরা মানস দশাকে (কোনো একজাতীয়) স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছিলেন। সেই কারণে অভেদতত্ত্ব নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। সেইসব সমালোচনাকে এড়ানোর জন্য পাটনাম, ফোডর প্রমুখ মনোদার্শনিকরা মানস দশাকে কোনো স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সঙ্গে অভিন্ন বলার পরিবর্তে, স্নায়ুতন্ত্র বা ভৌত দশার কার্যকারিতার সঙ্গে মানস দশাকে অভিন্ন বলে মনে করলেন। অর্থাৎ মানস দশা কী কাজ করে, সেটাই বিবেচ্য, কী দিয়ে তা গঠিত হয়েছে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়। এই তত্ত্ব মানস দশার কার্যকরী ভূমিকা নিয়েই চিন্তা করে। মানস দশার কার্যকরী ভূমিকা (functional role) বলতে অন্যান্য মানস দশার সঙ্গে কারণিক সম্বন্ধকে বোঝায় যেমন,

বাহ্য উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয় এবং তারপর বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যা 'sensory input' এবং 'behavioural output' নামে পরিচিত এই তত্ত্বই মনোদর্শনের জগতে ক্রিয়াবাদ বা 'functionalism' নামে খ্যাত। ক্রিয়াবাদীরা লক্ষ করলেন যে, মানস দশাকে ভৌত দশার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখলে উগ্রপ্রজাতিবাদের সমস্যার (species chanvinism) উদ্ভব হতে পারে। তাই ক্রিয়াবাদে মানস দশাকে, ভৌত দশার সঙ্গে অভিন্ন বলার পরিবর্তে ঐ ভৌত দশার কার্যকারিতার মাধ্যমে তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ যন্ত্রণাকে 'সি-তন্তুর উত্তেজনার' সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে না দেখে, সি-তন্তুর উত্তেজনার দ্বারা যে কার্যটি সম্পাদিত হয়, তার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এতে উগ্রপ্রজাতিবাদের সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কারণ দেহযন্ত্র বা স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একই মানস দশার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই তত্ত্বে স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন নয়, বরং ঐ স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের দ্বারা যে কার্যকারিতা সাধিত হয়, সেটাই প্রাসঙ্গিক। মানবদেহে সি-তন্তুর উত্তেজনা যে কার্যটি ঘটায়, অন্য কোনো জীবদেহে হয়তো অন্য কোনো স্নায়ুতন্তুর দ্বারা ঐ কার্য সাধিত হয়। ফলে উগ্রপ্রজাতিবাদের আপত্তির প্রসঙ্গ ওঠে না।

ক্রিয়াবাদ সবকিছুকেই কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চায়, কোনো একটি বিষয়ের দ্বারা কী কার্য সাধিত হয়, তার ভিত্তিতেই সেই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে চায়। যেমন, 'ঘড়ি কাকে বলে?' — প্রশ্ন করলে, অভেদতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে নানা উত্তর আসবে, কারণ, কোনো ঘড়ি হয়তো স্প্রিং ও চাকার সাহায্যে তৈরি, কোনো ঘড়ি হয়তো বালি ভর্তি কাঁচের পাত্র দিয়ে তৈরি; কিন্তু ক্রিয়াবাদী বলবেন, ঘড়ি

হল এমন একটি ক্রিয়াশীল যন্ত্র যা সময় নির্দেশ করে। ফলে ক্রিয়াবাদ অনুসারে, কোনো বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে তার ভৌত গঠনেরও প্রয়োজন নেই আবার কার্তেসীয় জড় অতিরিক্ত মানস সত্তা স্বীকার করারও প্রয়োজন নেই। কার্যকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমেই যে কোনো বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। ক্রিয়াবাদীরা একজন ব্যক্তির একটি বিশেষ মানস দশার সঙ্গে ঐ ব্যক্তির স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অভিন্নতার সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না, বরং তাঁরা ঐ ব্যক্তির যন্ত্রণা বা মানস দশাকে আরো বিমূর্ত বিষয়ের সঙ্গে, ঐ ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে দেখতে চান। এর থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা নিদর্শনগত অভেদতত্ত্বকে সমর্থন করেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে *'The Nature of Mental State'* প্রবন্ধে পাটনাম ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন। আধুনিকযুগের কম্পিউটারের ইনপুট-আউটপুটের (input-output) ধারণা ব্যবহার করে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কম্পিউটার প্রোগ্রাম কম্পিউটারের ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ কম্পিউটার প্রোগ্রাম একদিকে ইনপুট ও তার সঙ্গে যুক্ত আউটপুট দশাগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। আধুনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়া মৌলিক যান্ত্রিক নীতির দ্বারা চালিত হয়ে একটি সীমিত (finite) যন্ত্রের ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। ফলে, মন যদি এরকম একটি ক্রিয়াশীল যন্ত্র হয়, তাহলে ভৌত মানব দেহও যে এমন অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাতে সক্ষম হবে যাদের মানস জগতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে মনে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ এই চিন্তাই পাটনাম প্রমুখকে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রিয়াবাদীদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। 'Artificial intelligence' সম্পর্কিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্যে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহযন্ত্র বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র সম্বলিত হয়েও সমান মানস ধর্মের অধিকারী হতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে, মন হল একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা মস্তিষ্কের মতো কম্পিউটার হার্ডওয়ারে প্রয়োগযোগ্য। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে যেমন একাধিক কম্পিউটার হার্ডওয়ারে প্রয়োগ করা যায়, মন বা মানস দশাগুলিও তেমনি বিভিন্ন মস্তিষ্কে থেকেও একইরকম হয়ে থাকে। এই চিন্তা কিন্তু জড়বাদী হওয়া সত্ত্বেও দ্বৈতবাদের মতো শোনায় কেননা, এই তত্ত্ব মন বিষয়ে কার্তেসীয় ধারণা অনুসরণ করে বলে যে, মনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোনো ভূমিকা নেই। মন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা, যে কোনো কম্পিউটার হার্ডওয়ারে প্রয়োগযোগ্য। জন সার্ল এই তত্ত্বকে 'Strong Artificial Intelligence' বলেছেন (Searle 2004, 65)। এই তত্ত্ব অনুসারে, কম্পিউটারকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা সম্ভব যাতে, কম্পিউটারের মন আছে বলে শুধু প্রতীয়মান হবে না, তা প্রকৃতপক্ষে মনযুক্ত হয়ে উঠবে। যথাযথভাবে প্রোগ্রাম করা একটি কম্পিউটারকে, ক্রিয়াবাদীরা, মনের অধিকারী হিসেবেই গণ্য করেন।

ক্রিয়াবাদের সপক্ষে দুধরনের যুক্তির কথা বলা যায় — আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী (optimistic and pessimistic)। আশাবাদী যুক্তি মূলতঃ নির্ভর করে কৃত্রিম মন তৈরির সম্ভাবনার উপর। এই যুক্তিতে মনে করা হয় যে, যদি কোনোদিনও এমন কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করা না যায়, যা মানসগুণসম্পন্ন কিন্তু ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মানব শরীর থেকে ভিন্ন, তাহলেও কৃত্রিম মনের সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতেই

পারে। এই চিন্তাই কৃত্রিম বুদ্ধির সম্ভাবনাকে সমর্থন করে। ক্রিয়াবাদ মনকে একজন ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে -- মন হল একটি যন্ত্র (mechanism) যা নানা উপায়ে নির্মিত হতে পারে। বহুরূপায়ণযোগ্যতার যুক্তিতে পাটনাম (Patnum 1967) বলেছিলেন যে, এমন কোনো প্রাণীর (তা সে এই জগতেরই হোক বা অন্য কোনো জগতের) কথা চিন্তা করা যেতেই পারে যা বেদনা অনুভব করে, কিন্তু মানব মস্তিষ্কের অনুরূপ মস্তিষ্কের বা স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী নয়। ফলে, বেদনাকে মস্তিষ্কের বা স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সঙ্গে অভিন্ন না করে, তার কার্যকারিতার সঙ্গে অভিন্ন করলে আর কোনো সমস্যা হবে না। কারণ মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন বিভিন্ন জীবের মধ্যে আলাদা হলেও তাদের ক্রিয়াশীলতা বা কার্যকারিতা এক হতেই পারে। আশাবাদী যুক্তিটি অনেকাংশেই বহুরূপায়ণযোগ্যতার নীতি বা যুক্তিকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়। বহুরূপায়ণযোগ্যতার নীতি বাস্তব জগতের কথাও বলে, যদিও আশাবাদী যুক্তি বাস্তব জগত নিয়ে চিন্তিতই নয়।

নৈরাশ্যবাদী যুক্তিতে দেখানো হয় যে, ক্রিয়াবাদ স্বীকার না করলে জড়বাদী তত্ত্বে অন্য মনের (other mind) অস্তিত্ব স্বীকার করা বা অন্যের মানস দশা ব্যাখ্যা করার কোনো যোগ্যতাই আমাদের থাকবে না। কারণ যদি দুটি প্রাণী ক্রিয়াশীলতার নিরিখে সম্পূর্ণ একরকম হয়, তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও একরকম হয়, কার্যকারিতার ভিত্তিতে তারা সমান ফল লাভে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের একজন মানস বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং অন্যজন নয় -- তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে? অভেদতত্ত্ব এর ব্যাখ্যায় বলবে যে, যেহেতু দুজনের ভৌত অবস্থা ভিন্ন, তাই তাদের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য থাকতেই পারে -- একজনের মস্তিষ্কের গঠন এমনই যে সে মানস বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে পেরেছে,

এবং অন্যজনের স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন ভিন্ন হওয়ায় সে মানস বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু অভেদতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি বলেন যে, তার মাথা ব্যথা করছে, বা তিনি বিশ্বাস করেন যে, আজ বৃষ্টি হবে — তাহলে প্রকৃতই তিনি এইসব অনুভূতির অধিকারী কিনা, তা জানার জন্য তার মাথা ভেঙে বা দেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখার প্রয়োজন হয় না। আচরণবাদীর মতো, তার বাহ্যিক ব্যবহার দেখে তার মানস অবস্থা অনুমান করাও সঠিক হবে না, বরং তার মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। ক্রিয়াবাদ অনুসারে, ঐ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ মস্তিষ্ক দশাগুলি এমনভাবেই ক্রিয়াশীল যে তার ঐধরনের মানস অনুভব হচ্ছে। মস্তিষ্কের এই ক্রিয়াশীলতা বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। সুতরাং ক্রিয়াবাদী দাবী করেন যে, ক্রিয়াবাদী প্রক্রিয়া অনুকরণ করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অন্য মন (other mind) সম্বন্ধে জানা যায়। অভিন্নতাতত্ত্ব বা আচরণবাদের দ্বারা যা কখনোই সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নৈরাশ্যবাদী যুক্তি যেভাবে অন্যমনের বিষয়ে অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করে, তা কি সত্যিই সম্ভব? অন্য মনকে কেবলমাত্র অনুমানের মাধ্যমেই জানা যায়। আর অনুমানলব্ধ জ্ঞান কখনোই সুনিশ্চিত হতে পারে না।

মানস দশাকে নিছক কার্যকারণ সম্বন্ধের নিরিখে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ক্রিয়াবাদীরা দেখাতে চেয়েছেন যে, মানস দশার মধ্যে মানস নামক কোনো বিশেষত্ব নেই। মানস দশার কথা বলা মানেই একগুচ্ছ কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে কথা বলা। এখন, ক্রিয়াবাদীদের কাছে প্রশ্ন আসে যে, মানস দশাকে কীভাবে অন্যান্য মস্তিষ্ক দশা থেকে পৃথক করা যাবে? ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন যে, মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা

দার্শনিকদের জানার বিষয় নয়, তা স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। তাই এই প্রশ্নের উত্তর স্নায়ুবিজ্ঞানীরা জানতে পারেন। দার্শনিকরা শুধু দেখবেন যে, মস্তিষ্ক উদ্দীপকের প্রভাবে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন, তা দার্শনিকের আলোচ্য বিষয় নয়। তাঁরা মনকে বা মস্তিষ্ককে একটি 'black box'-এর মতো মনে করেন, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকারণ সম্বন্ধ অবিরত ঘটে চলেছে। এই কারণে ক্রিয়াবাদকে 'black box functionalism'ও বলা হয় (Block 1980)।

ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি ওঠে, তার মধ্যে অন্যতম হল, ক্রিয়াবাদীদের তত্ত্বে 'qualia'-র অনুপস্থিতি। চেতন অভিজ্ঞাতামাত্রেরই গুণগত দিক থাকে, যার পুঁথিগত নাম হল 'qualia' । একথা অস্বীকার করা যায় না যে, গান শুনে যে তৃপ্তি হয়, তা অবশ্যই রসগোল্লা খাবার তৃপ্তির থেকে আলাদা। ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হল, ক্রিয়াবাদ চেতন অভিজ্ঞতার এই গুণগত দিকটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে চেতন অভিজ্ঞতার শুধুমাত্র ক্রিয়াশীলতার দিকটিই প্রাধান্য পায়, গুণগত দিকটি উপেক্ষিতই থেকে যায় (Searle 2004, 84)।

চেতন অভিজ্ঞতার গুণগত দিকটি ব্যাখ্যা করতে যে ক্রিয়াবাদ অসমর্থ তা আরো একটি যুক্তির মাধ্যমে দেখানো যায় (Searle 2004 85)। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। মনে করা যাক, দুজন ব্যক্তি পাশাপাশি দুটি গাড়ী চালাচ্ছেন। তারা কেউই বর্ণান্ধ (colour blind) নয়। তারা দুজনেই লাল আলো দেখলে গাড়ী থামান, আর আলো সবুজ হলে গাড়ী চালু করেন। অর্থাৎ রং চিনতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না এবং দুজনেই লাল রঙকে লাল এবং সবুজ রঙকে সবুজ হিসেবেই চিহ্নিত করেন। এখন,

মনে করা যাক্, প্রথম ব্যক্তির 'লাল রং দেখলে' যে অনুভূতি হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির 'সবুজ রং দেখলে' সেই অনুভূতি হয়। কিন্তু তাদের বাহ্যিক ব্যবহারে তা কখনোই প্রকাশিত হয় না। কারণ আচরণের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক বর্ণ নির্ণয় ক্ষমতাকেই আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। দ্বিতীয় ব্যক্তি জানেন যে, যখনই 'সবুজ আলো দেখার' অনুভূতি হয় তখনই গাড়ী থামাতে হয়, কারণ তার সবুজ আলো দেখার অনুভূতি তখনই হয় যখন ট্রাফিক সিগনালের আলো লাল হয়। যদিও তিনি ঐ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিকে 'লাল আলো দেখার' অনুভূতিরূপেই জানেন। অর্থাৎ জড়বাদীদের মত মেনে নিলে, আন্তর অভিজ্ঞতার সঠিক বর্ণনা সম্ভব হয় না। বাহ্যিক আচরণ এবং কার্যকারিতা এক থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ দুজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমরা দেখেছি, 'strong artificial intelligence' বা 'computer functionalism' অনুসারে কম্পিউটারের হার্ডওয়ারের সঙ্গে কম্পিউটার প্রোগ্রামের যে সম্বন্ধ, মস্তিষ্কের সঙ্গে মনেরও সেই একই সম্বন্ধ। এখন, এই তত্ত্ব অনুযায়ী একথা মানতে হয় যে, যে কোনো মানুষ যে কোনো জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে, যদি সে জ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্য কম্পিউটার প্রোগ্রামের আকারে নিজের মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারে। একটি কল্প-পরীক্ষণের সাহায্যে সার্ল বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন (Searle 2004, 84)। একজন ব্যক্তি যিনি ইংরেজি ভাষা জানলেও চীনা ভাষা বোঝেন না, তাকে একটি ঘরে বন্দী করে দেওয়া হল। ঐ ঘরে চীনাভাষার সংকেত ভর্তি একটি বাক্স রয়েছে। একটি বই রয়েছে যাতে চীনা ভাষার বিভিন্ন নিয়মাবলী ইংরেজি ভাষায় বিবৃত করা আছে। বাইরে থেকে তাকে চীনা ভাষায় কিছু প্রশ্ন করা হচ্ছে, যার অর্থ তিনি বোঝেন না, কিন্তু ঐ সংকেত আর নিয়মাবলীর সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে তিনি

ঐসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হচ্ছেন। এখন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি বোধহয় খুব ভালো চীনা ভাষা বোঝেন, যেহেতু তিনি সব চীনা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি চীনা ভাষার একবর্ণও জানেন না। সার্লের মতে, এখানেই 'computer functionalism'-এর সমস্যা (Searle 2004, 89-92)। 'Artificial inteligence'-এর তত্ত্বকে মেনে নিলে আমরা সবাই কম্পিউটারে রূপান্তরিত হব। যে কম্পিউটার কেবলমাত্র কিছু নিয়ম আর তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সবসময় সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয় ঠিক-ই, কিন্তু, নিজে কিছুই অনুধাবন করে না। ঘরে বন্দী ব্যক্তিকে যদি চীনাভাষার পরিবর্তে ইংরেজিতে প্রশ্ন করা হত, তাহলে হয়তো তিনি তার অর্থ বুঝতেন এবং তাঁর মতো করে উত্তর দিতেন। অর্থাৎ সার্লের মতে, এক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদীরা ভাষার নিয়মাবলীর (syntax) উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, অর্থ (meaning, semantics) এক্ষেত্রে উপেক্ষিতই হয়েছে। কিন্তু আমাদের মন বা মানস অবস্থা সবসময় ভাষায় অর্থকেই (Semantics) অনুধাবন করতে চায়, অন্বিত বিষয়ের সঙ্গেই মনের চিরন্তন সম্বন্ধ। তাই মনকে বিশুদ্ধ কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে চাইলে, মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করা হয় (Searle 1990)।

এতক্ষন আমরা বিভিন্ন জড়বাদী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই তত্ত্বগুলিতে জড়বাদ কিন্তু এক অর্থে গৃহীত হয়নি। অভেদতত্ত্বে জড়বাদী চিন্তা যতখানি দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়েছে, ক্রিয়াবাদে কিন্তু তা ততখানি দৃঢ় নয়। জড়বাদের মূল কথা হল, এই জগতের মৌলিক উপাদান হল জড়

কণা এবং জগতের সববিষয়ই কোনো না কোনোভাবে জড় জগতের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জড় জগতের উপর নির্ভরতার মাত্রাভেদ অনুসারে জড়বাদী তত্ত্বও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। জড় জগতের উপর নির্ভরতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেক জড়বাদী দার্শনিকই যে ধারণার উপর সবচেয়ে বেশী ভরসা করেন তা হল প্রনির্ভরতা।

প্রনির্ভরতার ধারণাটি দর্শনের জগতে প্রথম আসে ব্রিটিশ উদ্ভবতাত্ত্বিকদের হাত ধরে। লয়েড মর্গান (Lloyd Morgan 1923) উদ্ভূত ধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'supervene' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। উদ্ভূত ধর্ম যে ধর্মসন্নিবেশ থেকে উদ্ভূত হয়, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাতে মর্গান 'supervene' শব্দটি প্রয়োগ করেন। আধুনিককালে প্রনির্ভরতা সম্বন্ধটি দার্শনিক জগতে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। দার্শনিক অর্থে 'supevene' শব্দটি সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করেন হেয়ার (Hare 1952, 145)। নীতিতত্ত্বে নৈতিক গুণের সঙ্গে প্রাকৃতিক গুণের সম্বন্ধ বোঝাতে হেয়ার এই শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও হেয়ারই প্রথম ব্যবহার করেছেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। জি. ই. মুরের (G. E. Moore 1922) লেখাতেও প্রনির্ভরতার ধারণার প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি 'supervene' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেননি। মনোদর্শনের জগতে ডোনাল্ড ডেভিডসনই (Donald Davidson, 2013) প্রথম প্রনির্ভরতার ধারণাটির প্রবর্তন করেন।

প্রনির্ভরতা সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, উচ্চস্তরীয় ঘটনা সবসময়ই তার নিম্নস্তরীয় ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, কার্য তার কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণের পরিবর্তনে কার্যেরও পরিবর্তন ঘটে। নিম্নস্তরীয় ঘটনা থেকেই যেহেতু

উচ্চস্তরীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়, তাই নিম্নস্তরে কোনো পরিবর্তন ঘটলে উচ্চস্তরেও পরিবর্তন ঘটে। প্রনির্ভরতা তত্ত্বে দাবী করা হয় যে, নিম্নস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকে উচ্চস্তরে কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। যেমন, যদি মনে করা হয় যে, জীব জগত, জড় জগতের থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তাহলে প্রনির্ভরতার তত্ত্ব মেনে বলা যায় যে, জীব জগতের ঘটনা জড় জগতের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হবে। জীব জগতে কোনো পরিবর্তন তখনই ঘটতে পারে, যদি জড় জগতে কোনো পরিবর্তন ঘটে।

ডেভিড চামার্স (David Chalmers) তাঁর *'The Consicious Mind'* (1997) গ্রন্থে প্রনির্ভরতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "B-Properties supervene on A-Properties if no two possible situations are identical with respect to their A-properties while differing in their B-Properties." (Chalmers 1997, 33)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চামার্স 'identity' শব্দটিকে 'indiscernibility' অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রনির্ভরতার লক্ষণ অনুসারে কোনো দুটি বস্তু বা ঘটনা যদি ক-অপৃথকগ্রাহ্য (indiscernible) হয় তাহলে তা খ-অপৃথকগ্রাহ্য হবে। এখানে 'ক' ধর্মকে প্রনির্ভর ধর্ম যা উচ্চস্তরীয় ধর্মের সমাহাররূপে এবং 'খ' ধর্মকে অবনির্ভর বা মূলগত ধর্মের সমাহাররূপে বুঝতে হবে।

চামার্সের মতে, প্রনির্ভরতা সম্বন্ধ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কী ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধটি আলোচিত হচ্ছে সেটি কোনো ব্যক্তি বিশেষ নাকি সমগ্র বিশ্বজগত সম্পর্কিত, সেই অনুসারে প্রনির্ভরতা সম্বন্ধও দুরকমের হতে পারে — স্থানীয় (local) আর বিশ্বজনীন বা সার্বিক (global)। আবার এই সম্বন্ধকে সম্ভাব্য জগতের নিরিখে দেখা হচ্ছে, নাকি বাস্তব জগতের নিরিখে — সেই অনুসারে প্রনির্ভরতা

দু-প্রকার হতে পারে — যৌক্তিক প্রনির্ভরতা (logical supervenience) ও প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতা (natural supervenience)।

দার্শনিক চামার্স স্থানীয় প্রনির্ভরতা বা 'local supervenience'–কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'খ' ধর্ম স্থানীয়ভাবে ক-ধর্ম প্রনির্ভর হবে, যদি কোনো একজন ব্যক্তির ক-ধর্ম সমাহার ঐ ব্যক্তির খ-ধর্ম সমাহারকে নিয়ন্ত্রণ করে' ["B-properties supervene locally on A-properties if the A-properties of an individual determine the B-properties of that individual...". (Chalmers 1997, 33)]। একইসঙ্গে তিনি আরো যোগ করেছেন যে, "... if, that is, any two possible individuals that instatiate the same A-properties instantiates the same B-properties." (Chalmers 1997, 33-34) । অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, দুজন সম্ভাব্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক-ধর্মের দৃষ্টান্ত ও খ-ধর্মের দৃষ্টান্ত অভিন্ন (যেমন, বস্তুর আকার তার জড় ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি দুটি বস্তুর সব জড় ধর্ম অভিন্ন হয় তাহলে তাদের আকার ভিন্ন হতে পারে না) তাহলে খ-ধর্ম, ক-ধর্ম প্রনির্ভর হবে।

অন্যদিকে সার্বিক প্রনির্ভরতা (global supervenience) প্রসঙ্গে চামার্স বলেছেন, 'খ'-ধর্ম, 'ক'-ধর্মের উপর সার্বিক অর্থে প্রনির্ভর হবে যদি জগতের সব 'ক'-ধর্ম সমন্বিত ঘটনাই 'খ'-ধর্ম সমন্বিত সব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ যদি এমন দুটি সম্ভাব্য জগত পাওয়া অসম্ভব হয়, যারা ক-ধর্মের সাপেক্ষে অভিন্ন কিন্তু খ-ধর্ম সাপেক্ষে ভিন্ন,— "B-properties supervene globally on A-properties, ..., if the A facts about the entire world determine the B facts: that is, if there are no two possible worlds

indentical with respect to their A-properties, but differing with respect to their B-properties." (Chalmers 1997, 34)।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য স্থানীয় প্রনির্ভরতা বা সার্বিক প্রনির্ভরতা খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয় বলেই চামার্স মনে করেন। যৌক্তিক প্রনির্ভরতা (logical supervenience) ও প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতাকে (natural supervenience) তিনি বেশী প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন (Chalmers 1997, 34) । যৌক্তিক প্রনির্ভরতার (logical supervenience) লক্ষণে চামার্স বলেছেন, 'খ'-ধর্ম 'ক'-ধর্মের উপর যৌক্তিকভাবে প্রনির্ভর হবে যদি এমন কোনো দুটি যৌক্তিক সম্ভাব্য জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হয় যারা ক-ধর্ম সাপেক্ষে অভিন্ন, কিন্তু খ-ধর্ম সাপেক্ষে ভিন্ন ("B-properties supervene logically on A-properties if no two logically possible situations are identical with respect to their A-properties but distinct with respect to their B-properties.") (Chalmers 1997, 35)।

যৌক্তিক প্রনির্ভরতাকে বুঝতে হলে সম্ভাব্য জগতের নিরিখেই বুঝতে হবে। দার্শনিকরা মনে করেন, আমরা যে জগতে আছি সেই জগতের মতো আরো অনেক জগত থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কারণ সম্ভাবনা দু-ধরনের হতে পারে-- যৌক্তিক সম্ভাবনা (logical possibility) আর ব্যবহারিক সম্ভাবনা (empirical possibility)। যৌক্তিক সম্ভাবনা বলতে সেই সম্ভাবনাকে বুঝি, যা যৌক্তিক দিক থেকে স্ববিরোধী নয়। যে চিন্তার মধ্যে বা পরিস্থিতির মধ্যে যৌক্তিক স্ববিরোধিতা নেই তাই যৌক্তিকভাবে সম্ভাব্য। অন্যদিকে, ব্যবহারিক সম্ভাবনা (empirical possibility) হল যা কেবলমাত্র আমাদের ব্যবহারিক জগতে সম্ভব অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মসম্মতভাবে যে

পরিস্থিতি সম্ভব তাই বৈজ্ঞানিক অর্থে বা ব্যবহারিক অর্থে সম্ভব। বাস্তবে যা সম্ভব তা অবশ্যই যৌক্তিকভাবে সম্ভব, কিন্তু যা কিছু যৌক্তিকভাবে সম্ভব, তার সবই যে বাস্তবে সম্ভব হবে, এমন নয়। আমাদের এই জগত প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত, যা অসীম সংখ্যক যৌক্তিক সম্ভাব্য জগতের মধ্যে একটি।

চামার্সের মতে, খ-ধর্ম যদি যৌক্তিকভাবে ক-ধর্ম প্রনির্ভর হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ক-ধর্ম থেকে খ-ধর্ম প্রসক্ত (entail) হয়েছে, কেননা দুটি ঘটনার মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ তখনই হতে পারে অর্থাৎ 'ক' ঘটনা থেকে 'খ' ঘটনা প্রসক্ত হবে যদি এমন হয় যে, 'খ' ঘটনা ব্যতিরেকে 'ক' ঘটনার উপস্থিতি যৌক্তিকভাবে অসম্ভব হয়ে যায় (Chalmers 1997, 36)। যৌক্তিক প্রনির্ভরতার ক্ষেত্রে চামার্স যৌক্তিক সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকারের প্রনির্ভরতার কথা বলেছেন, যা প্রাকৃতিক জগত বা বাস্তব জগতের নিয়ম অনুসরণ করে চলে, যৌক্তিক সম্ভাবনা বা যৌক্তিক আবশ্যিকতার প্রতি এই সম্বন্ধের দায়বদ্ধতা নেই। প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতার (natural supervenience) সম্বন্ধকে প্রকাশ প্রসঙ্গে চামার্স বলছেন, খ-ধর্ম প্রাকৃতিকভাবে (naturally) ক-ধর্ম প্রনির্ভর হবে যদি যে কোনো দুটি প্রাকৃতিকভাবে সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে পরিলক্ষিত হয় যে, যেখানে ঐ 'ক' ধর্মগুলি আছে, সেখানে সবসময়ই ঐ 'খ' ধর্মগুলি আছে,— "B-properties supervene naturally on A-properties if any two naturally possible situations with the same A-properties have the same B-properties." (Chalmers 1997, 36)]।

প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতা প্রাকৃতিক সম্ভাবনা বা বাস্তব সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্ভাবনা সব সময়ই প্রকৃতি জগতের নিয়মকে অনুসরণ করে চলে। তাই চামার্স প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে নিয়মনির্ভর (nomic or nomological) সম্ভাবনা হিসেবে গণ্য করেছেন (Chalmers 1997, 37)। নিয়মনির্ভর প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ সেখানেই থাকবে যেখানে, যে কোনো প্রাকৃতিক সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে যদি এমন হয় যে, যেখানে যেখানে ক-ধর্ম আছে সেখানে সেখানেই খ-ধর্ম আছে। অর্থাৎ ক-ধর্ম ও খ-ধর্মের মধ্যে একটি বাস্তবিক আবশ্যিকতার সম্বন্ধ থাকবে। যৌক্তিক প্রনির্ভরতা ও প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে চামার্স বলেছেন,— যদি খ-ধর্ম যৌক্তিকভাবে ক-ধর্ম প্রনির্ভর হয় তাহলে, ঈশ্বর জগত সৃষ্টির সময় যখন ক-ধর্ম সৃজন করেছিলেন, তখন অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে খ-ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে, ক-ধর্ম যদি প্রাকৃতিকভাবে খ-ধর্ম প্রনির্ভর হয় তাহলে ক-ধর্মের সৃষ্টির পর ঈশ্বরকে লক্ষ রাখতে হয়েছিল যেন জগতে এমন নিয়মের উপস্থিতি থাকে যা ক-ধর্ম ও খ-ধর্মকে সমন্বিত করে। কারণ এই নিয়মের উপস্থিতির দরুনই ক-ধর্ম, খ-ধর্মের উপস্থিতিকে সুনিশ্চিত করে (Chalmers 1997, 37)।

চেতনা ও ভৌত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে চামার্স প্রনির্ভরতা সম্বন্ধের কথা স্বীকার করেছেন (Chalmers 1997, 93)। তিনি মনে করেন, চেতন জগত, ভৌত জগত প্রনির্ভর। জড়বাদীরাও চেতন জগত ও ভৌত জগতের মধ্যে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করেন। চেতন জগত তাঁদের মতে জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য (reducible)। কিন্তু চামার্স চেতনাকে জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য বলে মনে করেন না।

জড়বাদীদের মতো এই জগতের সব বিষয়েরই জড় ব্যাখ্যা সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে চেতন অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ জড় ব্যাখ্যা কখনোই সম্ভব নয়। একইসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, চেতনা জড় জগতের উপর কখনোই যৌক্তিকভাবে প্রনির্ভর হতে পারে না। এই প্রনির্ভরতা, তাঁর মতে, প্রাকৃতিক প্রনির্ভরতা হতে পারে, যা দেশ-কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন, চামার্সের কাছে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে, কেন তিনি চেতন জগত ও জড় জগতের মধ্যে যৌক্তিক প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করেন না? চামার্স একাধিক যুক্তির মাধ্যমে চেতন জগত ও জড় জগতের (ভৌত জগতের) যৌক্তিক প্রনির্ভরতার সম্বন্ধকে অস্বীকার করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল 'zombie'-র যৌক্তিক সম্ভাবনা বিষয়ক যুক্তি (Chalmers 1997, 94)।

চামার্স একটি কল্প-পরীক্ষণের সাহায্যে চেতন জগত ও ভৌত জগতের মধ্যে যৌক্তিক প্রনির্ভরতা সম্বন্ধের সম্ভাবনা অসম্ভব বলে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মনে করা যাক্, এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে যা বর্তমানে অস্তিত্ববান কোনো একজন ব্যক্তির সঙ্গে ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অভিন্ন, যদিও চেতনার নিরিখে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ, এই ব্যক্তি চেতনাযুক্ত হলেও ঐ অবিকল ভৌত প্রতিরূপটি চেতনাহীন। এখন ধরে নেওয়া যাক যে, ঐ ব্যক্তি হয়তো জানালার ধারে বসে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছেন, হাতে হয়তো একটি চায়ের কাপ আছে যার থেকে হয়তো তিনি দার্জিলিং চায়ের আস্বাদ গ্রহণ করছেন, আবার একইসঙ্গে হয়তো তার কপালে তিনি একটু হালকা যন্ত্রণা অনুভব করছেন। তার অবিকল ভৌত প্রতিরূপ যে zombie সেও ঐ একই পরিস্থিতিতে উপস্থিত। সেও জানালার ধারে বসে আছে, চায়ের কাপ হাতে।

এখন, সে যেহেতু ভৌত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন তাই তার দৈহিক কার্যকারিতাও (functionality) ঐ ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। প্রাকৃতিক শোভা দেখে ঐ ব্যক্তির যেমন উদ্দীপনা হচ্ছে এবং তিনি যেমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, Zombie ও তেমনি উদ্দীপিত হচ্ছে এবং আচরণের মাধ্যমে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে। মানসিক দিক থেকে দুজনে অভিন্ন এই অর্থে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বা দার্জিলিং চা-এর আস্বাদ গ্রহণ করে উভয়েরই মস্তিষ্কে একই ধরনের স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা হচ্ছে। চার্মাসের মতে, এই সবকটি ঘটনাই তাদের ভৌত অভিন্নতা থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয়। কিন্তু তাঁর মতে, zombie-র এইসব স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার কোনোটাই প্রকৃত চেতন অভিজ্ঞতার (real conscious experience) সঙ্গে যুক্ত নয়। ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভব (phenomenal feel) সেখানে আদৌ থাকে না। তাঁর কথায়, "There will be no phenomenal feel. There is noting it is like to be a zombie." (Chalmers 1997, 95)। ফলে, চামার্সের মতে, ভৌত জগতের অভিন্নতা যৌক্তিকভাবে চেতন জগতের অভিন্নতাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চেতন জগত ও ভৌত জগতের মধ্যে যৌক্তিক প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ থাকতে পারে না। অর্থাৎ চেতনা ও জড় জগতের সম্বন্ধ সম্ভাব্য জগতের নিরিখে নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাস্তব জগতেই সীমাবদ্ধ।

ডোনাল্ড ডেভিডসন-ই প্রথম মনোদার্শনিক যিনি দৈহিক দশা ও মানস দশার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রনির্ভরতা সম্বন্ধের কথা বলেন। তাঁর Mental Events প্রবন্ধে (Davidson 2013) তিনি মনে করেছেন, মানস বৈশিষ্ট্য (বা মানস ধর্ম), দৈহিক বৈশিষ্ট্য (বা দৈহিক ধর্ম) প্রনির্ভর অর্থাৎ মানস বৈশিষ্ট্য বা মানস ধর্ম, দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা দৈহিক ধর্মের উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। তাঁর মতে, এমন দুটি ঘটনা পাওয়া সম্ভব

নয়, যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো মানস বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তারা ভিন্ন। অর্থাৎ দৈহিক জগতে পরিবর্তন না হলে মানস জগতে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। মানস জগতে যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে তাহলে বুঝতে হবে দৈহিক জগতে অবশ্যই কোনো পরিবর্তন ঘটেছে।

ডেভিডসনের প্রনির্ভরতার ধারণার মধ্যে আরো তিনটি ধারণা সম্বদ্ধ হয়ে আছে— (১) সহ-পরিবর্তনের ধারণা, (২) নির্ভরতার ধারণা ও (৩) পর্যাবসানহীনতার ধারণা।

ডেভিডসনের প্রনির্ভরতা সূত্র অনুসারে, মানস বৈশিষ্ট্য (বা ধর্মগুলি) দৈহিক ধর্মের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, এবং মনোধর্মগুলি দৈহিক ধর্মের সঙ্গে সহ-পরিবর্তনশীল। এখন এই নির্ভরতা বা সহ-পরিবর্তনশীলতার সম্বন্ধ কিন্তু সমমুখী নয়, তা একমুখী। অর্থাৎ মানস ধর্মগুলি দৈহিক ধর্মের উপর নির্ভরশীল হলেও, দৈহিক ধর্মগুলি কখনোই মানস ধর্মের উপর নির্ভর করে না। আবার, দৈহিক ধর্মের পরিবর্তনে মানস ধর্ম পরিবর্তিত হলেও কখনোই মানস ধর্মের পরিবর্তন দৈহিক ধর্মের পরিবর্তনের সূচনা করে না। তবে, ডেভিডসন মানস ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে দৈহিক ধর্ম প্রনির্ভর বলে স্বীকার করলেও মানস ও ভৌত ধর্মকে তিনি অভিন্ন বলে গণ্য করেননি। তিনি মনে করতেন, মানস ধর্ম কখনোই ভৌত ধর্মে পর্যাবসানযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে জড়বাদের দুটি প্রকারভেদের উল্লেখ করা যেতে পারে,— (১) পর্যাবসানমূলক জড়বাদ (reductive physicalism) ও (২) পর্যাবসানহীন জড়বাদ (non-reductive physicalism)। সাধারণভাবে ভৌতবাদ বা জড়বাদ বলতে

পর্যাবসানমূলক জড়বাদকেই বোঝনো হয়। পর্যাবসানমূলক জড়বাদে মনে করা হয় যে, এই জগতের যাবতীয় বিষয় জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন, ফলতঃ তারা জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য এবং তাদের সম্পূর্ণ জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, পর্যাবসানহীন জড়বাদ (ভৌতবাদ) হল এমন একটি আধিবিদ্যক তত্ত্ব যা দাবী করে যে, এই জগতের সব বস্তু সত্ত্বাগত দিক (ontlogical) থেকে এবং কারণিক (causal) দিক থেকে ভৌত পদার্থের দ্বারা গঠিত, যদিও তারা জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয় এবং জড় জগতের নিয়মের দ্বারা তারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাযোগ্যও নয়। পর্যাবসানহীন জড়বাদের ধারণা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। ক্রিয়াবাদী মানস ধর্মের (উচ্চস্তরীয় ধর্মের) সঙ্গে ভৌত ধর্মের (নিম্নস্তরীয় ধর্মের) সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ভৌত ধর্মের উপর মানস ধর্মের প্রনির্ভরতা স্বীকার করেন (যেখানে শেষ বিচারে ভৌত ধর্ম বলতে ভৌত (জড়) আনবিক কণাকেই বোঝানো হয়), যদিও মানস ধর্মের সম্পূর্ণভাবে ভৌত ধর্মে পর্যাবসানকে তাঁরা মেনে নিলেন না, যেহেতু বহুরূপায়নযোগ্যতার (multiple realizability) সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে থেকে যায়। পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক দার্শনিকই (যেমন- ডেভিডসন) পর্যাবসানহীন জড়বাদী তত্ত্ব রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। ডেভিডসন মানস ধর্মকে জড় ধর্ম প্রনির্ভর বলে গণ্য করেও তাকে ভৌত ধর্মে পর্যবসিত করতে চাননি। ফলে, তাঁর তত্ত্বকে পর্যাবসানহীন জড়বাদ হিসেবে গণ্য করা যেতেই পারে।

তবে সার্ল মনে করেন, চেতনা অবশ্যই মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক দশার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে পরিবর্তন ভিন্ন মানস জগতে কোনো

পরিবর্তন ঘটতে পারে না। অর্থাৎ সার্ল মানস ধর্মের ভৌত ধর্ম প্রনির্ভরতা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে সার্ল দুধরনের প্রনির্ভরতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন,—

(১) গঠনগত প্রনির্ভরতা (constitutive supervenience)।

(২) কারণিক প্রনির্ভরতা (causal supervenience)।

প্রনির্ভরতার ধারণা নীতিতত্ত্বের জগতেই আলোচিত হত। নীতিতত্ত্বের জগতে মনে করা হয় যে, এমন হতে পারে না যে, কোনো একটি কাজ ভালো আর অন্য একটি কাজ মন্দ অথচ, তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। ভালত্ব-মন্দত্ব অবশ্যই এক্ষেত্রে অন্য কোনো বিষয়ের উপর প্রনির্ভর। সার্ল এই ধরনের প্রনির্ভরতাকে গঠনগত প্রনির্ভরতা বলেছেন (Searle 2004, 148-9)। সার্লের মতে, চেতনা ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে এই ধরনের প্রনির্ভরতা থাকতে পারে না। তাঁর মতে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক দশা চেতনার উৎপত্তিতে কারণিক ভূমিকা পালন করে। তাই তাঁর কথায়, "The supervenience of consciousness on brain process is a causal supervenience." (Searle 2004, 149)। সার্ল একথা মানেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে চেতনার উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ নিম্নস্তর এক্ষেত্রে উচ্চস্তরকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে। এখন, প্রশ্ন হল, উচ্চস্তর নিম্নস্তরের দ্বারা কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত হওয়ার অর্থ কী? উচ্চস্তরের কারণিক ভূমিকাও কি নিম্নস্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? চেতনা যদি তার নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তার যদি স্বতন্ত্র কোনো কার্যক্ষমতা না থাকে, তাহলে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসে না, দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এ প্রসঙ্গে সার্ল কী মনে করেন, তিনি

স্নায়ুতান্ত্রিক জগতের অতিরিক্ত চেতনার কোনো কারণিক ভূমিকা স্বীকার করবেন কিনা তা জানার জন্য সার্লের চেতনা বিষয়ক তত্ত্ব বিশদে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

তথ্যপঞ্জী

1. Armstrong, D. M. 1968. *A Materialist Theory of the Mind.* London: Routledge.
2. Block, Ned. 1980. Troubles with Functionalism. in *Readings in Philosophy of Psychology.* Vol. 1. ed. Ned Block, 268-305. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Carnap, R. 1991. Logical Foundations of the Unity of Science. in *The Philosophy of Science,* ed. R. Boyd, P. Gasper, J. D. Trout. 393-404. Cambridge : MIT Press.
4. Chalmers, D. J. 1997. *The Conscious Mind.* Oxford : Oxford University Press.
5. Davidson, D. 2013. Mental Events. in *Essays and Actions and Events.* 207-225. Oxford : Clarendon Press.
6. Descartes, R. 1986. *Meditation on First Philosophy with Selections from the Objections and Replies.* trans. John Cottingham. Cambridge : Cambridge University Press.
7. Feigl, H. 1958. The 'Mental' and the 'Physical'. in *Concepts, Theories and the Mind-Body Problem.*Vol. 2. ed. H. Feigl, M. Scriven, G. Maxwell. Minessota : Minnesota Studies in Philosophy of Science.

8. Fodor, J. 1974. Special Sciences. *Synthese.* 28: 97-115.

9. Halden, E. S. and G. R. T. Ross. 1955. *The Philosophical Works of Descartes.* USA : Dover Pub.

10. Hare, R. M. 1952. *The Language of Morals.* Oxford : Oxford University Press.

11. Hemple, C. 1980. The Logical Analysis of Psychology. in *Reading in Philosophy of Psychology.* ed. Ned Block. Cambridge, MA: Harvard University Press.

12. Huxley, T. H. 1898. *Method and Results : Essays by Thomas H. Huxley.* New York : D. Appleton and Company.

13. Hyslop, A. 1998. Methodological Epiphenomenalism. in *Australasian Journal of Philosophy* 76 : 61-70.

14. Jackson, F. 2002. What Mary Didn't Know. In *The Nature of Consciousness : Philosophical Debates.* ed. Ned Block, O. Flanagen, G. Guzeldere. 567-570. Cambridge, MA : Bradford Book.

15. Kripke, S. A. 1980. *Naming and Necessity.* Cambridge, MA : Harvard University Press.

16. Leibniz, G. W. 1968. *The Monadology and Other Philosophical Writings.* Trans. Latta Robert. London : Oxford University Press.

17. Loemker, L. eds. 1969. *Philosophical Papers and Letters.* 2nd ed. Dordrecht : Reidel.

18. Mason, H. T. (ed. and trans.) 1967. *The Leibniz-Arnauld Correspondence.* Manchester : Manchester UP.

19. Moore, G. E. 1922. *Philosophical Studies.* London : Routldge.

20. Morgan, L. 1923. *Emergent Evolution.* London : William and Norgate.

21. Nagel, T. 1974. What Is It Like to Be a Bat?. *The Philosophical Review.* Vol. 83(4) : 435-450.

22. Nath, S. 2013. Resolution of Some Problems in the Identity Theory. *IQSR Journal of Humanities and Social Science.* Vol. 10(5).

23. Neurath, O. 1931. Physicalism : The Philosophy of Vienna Circle. in *Philosophical Papers 1913-1946.* eds. R. S. Cohen and M. Neurath. 48-51. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company.

24. Place, U. T. 1954. The Concept of Heed. *British Journal of Psychology.* 45 : 243-255.

25. Place, U. T. 1956. Is Consciousness is a Brain Process?. *British Journal of Psychology.* 47-50.

26. Popper, K. R. 1985. *The Self and its Brain.* London : Springer International.

27. Putnum, H. 1967. The Nature of Mental States. In *Art, Mind and Religion.* ed W. H. Capitan, D. D. Merill. USA : Pittsburg University Press.

28. Putnum, H. 1980. Brains and Behavior. In *Readings in Philosophy of Psychology.* ed. Ned Block. Vol. 1. ed. Ned Block, 24-36. Cambridge, MA: Harvard University Press.

29. Ryle, G. 1949. *The Concept of Mind.* London : Hutchinson.

30. Searle, J. R. 1990. Is the Brain's Mind a Computer Programme? in *Science Journal (USA).* 262(1) : 26-31.

31. Searle, J. R. 2002. *The Rediscovery of the Mind.* Cambridge, MA : MIT Press.

32. Searle, J. R. 2004. *Mind : A Brief Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

33. Sellar, W. 1962. Philosophy and the Scientific Image of a Man. in *Frontiers of Science and Philosophy.* ed. Robert Colodny,35-78. Pittsburg : University of Pittsburg Press.

34. Smart, J. J. C. 1959. Sensation and Brain Process. *Philosophical Review.* 63: 141-156.

35. Spinoza, B. 1986. *Ethics and On the Correction of the Understanding.* Trans. Andrew Boyle. London : Everyman's Library.

36. Spinoza, B. 2016. *Ethics (1677) in the Collected Works of Spinoza.* ed. and trans. Edwin Curley. Princepton : Princepton University Press.

37. Strawson, P. F. 1959. *Individuals.* London : Routledge.

38. Taylor, R. 1963. *Metaphysics,* Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall.

39. Walton, M. 1989. The Knowledge Argument Against the Knowledge Argument. *Analysis.* 49 : 158-160.

40. Watson, J. B. 1919. *Psychology from the Standpoint of a Behaviorist.* Philadelphia : Lippincott Co.

41. চক্রবর্তী, সোমনাথ। ২০০৩। আচরণবাদের আচরণদর্শন। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

42. মুখার্জী, সুমিতা। ২০০৩। আচরণবাদ : ওয়াটসন। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

43. মিত্র, পুষ্পা। ২০০৩। চরম আচরণবাদ এবং বি এফ স্কিনার। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেহ-মনের সমস্যা : জন সার্ল

আগের অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে, দ্বৈতবাদ (মূলতঃ কার্তেসীয় দ্রব্যদ্বৈতবাদ) এই জগতে দুধরনের দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে — দেহ ও মন; এরা পরস্পর স্বতন্ত্র, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা এতটাই ভিন্ন যে তাদের পরস্পর বিরোধী বলে গণ্য করাই যথাযথ বলে মনে হয়। দ্বৈতবাদ দাবী করে যে, এরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভর করে না। ভৌত দশার অস্তিত্বের জন্য বা ভৌত দশাকে ব্যাখ্যার জন্য মানস দশার সাহায্য যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি মানস দশার অস্তিত্বও কোনোভাবেই ভৌত দশার উপর নির্ভর করে না এবং মানস দশাকে ভৌত দশার সাহায্য ব্যতিরেকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। দ্বৈতবাদীরা মানস দশাকে, ভৌত দশায় পর্যাবসানযোগ্য বলে মনেই করেন না। অন্যদিকে জড়বাদীরা (materialists) জগতে এক ধরনের দ্রব্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন — তা হল জড়দ্রব্য। তাঁরা মনে করেন, এই জগত সম্পূর্ণভাবে জড়কণা দ্বারা গঠিত এবং জড় অতিরিক্ত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব এ জগতে নেই। একইসঙ্গে তাঁরা দাবী করেন যে, এই জগতে এমন কোনো বস্তু থাকতে পারে না, যার জড় ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই জড়বাদ মানস দশার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই দুটি তত্ত্বই জগতকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সার্ল লক্ষ করেছেন যে, উভয় তত্ত্বের কিছু কথা সত্য হলেও কোনোটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। উভয় তত্ত্বেরই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দ্বৈতবাদ মনকে জড় জগতে পর্যবসিত করতে চায় না, কারণ তাহলে মনের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়।

কার্তেসীয় চিন্তার এটি অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে জড়বাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে (scientific world view) ধরে রাখার জন্য জড় জগতের অতিরিক্ত কোনো বিষয়কেই সেখানে স্বীকার করতে রাজী নয়। কার্তেসীয় দেহ-মনের বিভাজনের তত্ত্ব এই দুটি চিন্তার মধ্যেই সুপ্তভাবে বর্তমান।

জন সার্ল মনে করেছেন, দেহ-মনের সমস্যার মূল কারণ হল, এই দ্বিকোটিক বিভাজনমূলক চিন্তা। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে এই দুটি তত্ত্বের অসুবিধার দিকগুলি বর্জন করে, যথার্থ অংশটি বেছে নেওয়াই আসল কাজ। সার্ল মনে করেন যে, জড়বাদ যখন বলে যে 'Consciousness is just a brain process' (Searle 2004, 127) তখন জড়বাদ সত্য কথা বলে, অর্থাৎ, এই জগতের সব বস্তুই জড়কণা বা জড় পদার্থ দিয়েই তৈরি, সব বস্তুরই জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সার্লের মতে জড়বাদ যখন দাবী করে যে, সত্তাগত স্তরে চেতনার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তখন তা সঠিক কথা বলে না। আবার দ্রব্যদ্বৈতবাদ যখন দাবী করে যে "Consciousness is irreducible to third person neurobiological processes" (Searle 2004, 127), তখন সে কথা সার্ল সঠিক বলে মেনে নেন। কিন্তু তার সঙ্গে দ্বৈতবাদীরা মনে করেন যে, চেতনা এই জগতের অংশই নয়, সাধারণ ভৌত জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয়। সার্লের মতে, দ্বৈতবাদের এই চিন্তা সঠিক নয়। জড় জগত থেকে চেতনাকে পৃথক করতে গিয়ে দ্বৈতবাদীরা চেতনাকে জড় জগত থেকে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছেন যে, চেতনাকে আর এই জগতের বিষয় রূপে গণ্য করাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর পর্যবেক্ষণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে গুরত্ব দিতে গিয়ে জড়বাদীরা আবার জড় অতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্বই অস্বীকার করে ফেলেছেন। সার্ল মনে করেছেন যে, এই দুটি চিন্তাধারাই ভ্রান্ত এবং এই

ভ্রান্তির মূল কারণ হল একটি পূর্বস্বীকৃতি — দেহ-মনের দ্বিকোটিক বিভাজনের ধারণা। কার্তেসীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দৈহিক দশা ও মানস দশাকে এমনভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা পরস্পর বর্জনকারী বিকল্প (mutually exclusive) রূপে স্বীকৃত হয়েছে (Searle 2004, 116)। মানস দশা সম্পূর্ণ মানস, ফলতঃ তা জড় জগতের অংশ হতে পারে না। আবার ভৌত দশা সম্পূর্ণই জড়, তাই, মানস জগতের কোনো বৈশিষ্ট্য সেখানে থাকতে পারে না। মানস দশা সবসময়ই গুণবাচক (qualitative), বিষয়ীনিষ্ঠ (subjective) এবং উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী সাপেক্ষ (first person perspective) ফলে, তা অজড়। অন্যদিকে ভৌত দশা (physical) ঠিক তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তা পরিমাণবাচক (quantitative), বস্তুনিষ্ঠ (objective) এবং প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (third person perspective) থেকে জ্ঞাত হবার সামর্থ্যযুক্ত। সার্লের মতে, প্রাচীন এই দ্বিকোটিক বিভাজন দেহ-মনের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। এই দ্বিকোটিক বিভাজনকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করেই এযাবৎ মন বিষয়ক তত্ত্ব জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন। তাই দেহ-মনের সমস্যাকে যদি সমাধান করতে হয় তাহলে, এই বিভাজনকে বর্জন করতে হবে। তাঁর মতে, মানস দশা ও ভৌত দশার লক্ষণ যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা যথাযথ নয়। তাই তিনি এই পদগুলি বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন, আর যদি একান্তই এই পদগুলি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ভৌত দশার প্রত্যয়কে আরো ব্যাপক করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। কারণ, তাঁর মতে, এমন অনেক জৈবিক প্রক্রিয়া (biological process) আছে যারা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হয়। কারণ সেগুলি গুণবাচক ও বিষয়ীনিষ্ঠ (subjective) হয়। যেমন, আমাদের পাচন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্ষুধাবোধ। পাচন ক্রিয়া বিশুদ্ধ জৈবিক

প্রক্রিয়া, কিন্তু ক্ষুধাবোধের মাধ্যমে তার গুণবাচক, ব্যক্তিনিষ্ঠ দিকগুলিও প্রকাশিত হয়। ফলে, ভৌত দশার ক্ষেত্রেও যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে পারে তা স্বীকার করতে হবে।

প্রথাগতভাবে ভৌত দশা ও মানস দশাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয় তা উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয়ে থাকে। ভৌত দশা পরিমাণবাচক, বস্তুনিষ্ঠ, প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হতে পারে। একইসঙ্গে ভৌত দশামাত্রেই কোনো না কোনো দেশে (Space) অবস্থান করে এবং ভৌত জগতের কারণিক বিধির (causal principle) দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত, ভৌত দশামাত্রই তার আণবিক গঠনের (microphysics) দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য, যদিও মানস দশার ক্ষেত্রে তেমন মনে করা হয় না, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাই প্রচলিত – চেতন দশামাত্রই অদৈশিক, ভৌত জগতের কারণিক নীতির দ্বারা তা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না। কার্তেসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ভৌত গঠনের দ্বারা মানস দশার ব্যাখ্যার কথা চিন্তাই করা যায় না।

সার্ল এই চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন বলে মনে করলেন। মানস দশা যদি দৈশিক অবস্থানশূন্য হয়, তাহলে তাকে কোনোভাবেই জড় জগতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার একথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, মানস দশার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি— বিষয়ীনিষ্ঠতা (subjectivity), গুণবাচকতা (qualitativeness) ও উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (first person perspective) থেকে জ্ঞাত হবার সামর্থ্য প্রভৃতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্যকে ভৌত জগতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। সাধারণভাবে ভৌত জগতের ধারণা কেমন, তা সার্ল এ প্রসঙ্গে বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত ভৌত দশা অবশ্যই দেশ কালে অবস্থান করে, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের কারণিক ব্যাখ্যা

(causal explanation) তাদের আণবিক গঠনের দ্বারা দেওয়া সম্ভব। প্রকৃত ভৌত দশা অবশ্যই অর্থক্রিয়াকারী হয় (Searle 2004, 117)। কার্তেসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জড় জগতকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, আধুনিককালে ভৌত জগতের ব্যাখ্যা তার থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কার্তেসীয় চিন্তায় ইলেকট্রনকে ভৌত জগতের অংশ হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হত না, কারণ, তার বিস্তৃতি নেই, যদিও আমরা জানি যে তার শক্তি আছে।

এখন, সার্ল দৈহিক ও মানস জগতের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কমানোর চেষ্টা করেছেন; এদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সার্লের মতে, মানস দশার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল,— গুণবাচকতা, বিষয়ীনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতা (intentionality) প্রভৃতি। সার্ল মনে করেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভৌত জগতের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সার্লের মতে, মানস দশাগুলির দৈশিক অবস্থান দেখানো সম্ভব, যদি মনে করা হয় যে, তারা মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত এবং অবশ্যই তারা কোনো না কোনো কালে অধিষ্ঠিত হয়। আবার, মানস দশা যদি মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার ক্রিয়াশীলতা নিম্নস্তরীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে। যদিও এগুলি কীভাবে দেখানো সম্ভব, সার্ল কীভাবে তা দেখাবেন, তা আমরা পরে দেখবো। সার্লের এই দাবী থেকে অবধারিতভাবে নিঃসৃত হয় যে, সার্ল মানস দশার অদৈশিকতা বা দৈশিক অবস্থান শূন্যতা, এবং নিম্নস্তরীয় দশার দ্বারা ব্যাখ্যাত না হওয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন। তিনি স্পষ্টতই দাবী করেন যে, মানস দশার যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকৃত, তার থেকে মানস দশার অদৈশিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি নিঃসৃত হয় না। তাই মানস দশা মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত এবং নিম্নস্তরীয় প্রক্রিয়ার (micro process) থেকে উৎপন্ন হয়ে ভৌত

জগতের উপর ক্রিয়া করে — একথার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই বলেই সার্ল মনে করেন। কিন্তু এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে, মানস দশার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে যদি সার্ল মানস দশাকে মস্তিষ্কে স্থাপন করেন, তাহলে ভৌত দশার যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বজনস্বীকৃত— বস্তুনিষ্ঠতা, পরিমাণবাচকতা প্রভৃতিকে তিনি কীভাবে রক্ষা করবেন? সার্ল ভৌত জগতের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেন না। কোনো বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলেও তা ভৌত জগতের অংশ হতে বাধা হবে না বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর কথায়, "There is no reason why a physical system such as a human or animal organism should not have states that are qualitative, subjective, and intentional." (Searle 2004, 118)। সার্ল এ প্রসঙ্গে গুণ এবং পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য করতেও রাজী নন। তাঁর মতে, যন্ত্রণার মতো মানস দশাকে কেবলমাত্র গুণগতভাবে বোঝা যাবে, এমন নয়। পরিমাণগত দিক থেকে যন্ত্রণাকে মাপতে না পারার কোনো কারণ নেই।

সার্ল আমাদের জৈবিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে একইসঙ্গে কোনো একটি ঘটনা স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়ার থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বিষয়ীনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মগুলি বিদ্যমান। তৃষ্ণার (পিপাসা) দৃষ্টান্ত দিয়ে সার্ল বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন (Searle 2004, 111)। তৃষ্ণার অনুভব সবসময়ই ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক বিষয়। কোনো না কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভবের সঙ্গে তা যুক্ত। এখন, প্রশ্ন হল যে, কোনো ব্যক্তির তৃষ্ণার অনুভব, যা তার একান্তই ব্যক্তিগত অনুভব, তাকে কি কোনোভাবে এই জগতের (ভৌত জগতের) বিষয়রূপে প্রকাশ করা সম্ভব? সার্ল মনে করেছেন যে, এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের

স্বীকার করতে হবে, তা হল, তৃষ্ণা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা (natural), তা বাস্তবে দেহের সঙ্গে যুক্ত এবং আমাদের আচরণকেও তা প্রভাবিত করে। ব্যক্তির দেহতন্ত্রে যদি পর্যাপ্ত জল না থাকে, তাহলে সেই অভাব থেকে নানাধরনের স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনার সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলেই ব্যক্তির তৃষ্ণার অনুভব হয় এবং তা মস্তিষ্কে অবস্থান করে। তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার মতো অন্যান্য মানস অনুভবগুলি মস্তিষ্কের কতকগুলি চেতন প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। সার্লের কথায়, 'All forms of consciousness are caused by the behavior of neurons and are realized in the brain system." (Searle 2004, 112)। যেকোনো ধরনের চেতনক্রিয়াই, তাঁর মতে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়া থেকে চেতনার উদ্ভব হয় এবং মস্তিষ্কতন্ত্রে জৈবিক ধর্মরূপেই তা অধিষ্ঠান করে,— "...they are caused by neurobiological processes in the brain; and they exist as biological features of the brain system." (Searle 2004, 113)। চেতনা সম্পর্কিত এই মতবাদকে সার্ল 'biological naturalism' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

সার্ল চেতনাকে একটি প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সে কারণেই চেতনার একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে 'naturalism'-এ মনে করা হয় যে, এই জগতে যা কিছু আছে, তার সবকিছুরই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুসারী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, যদিও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একে অন্যের থেকে বহুলাংশেই ভিন্ন। যেকোনো বস্তু যা প্রাকৃতিক কারণে উৎপন্ন হয় এবং প্রাকৃতিক কারণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাদেরই প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তু দেশে কালে অবস্থান করে এবং কার্যকারণ নিয়ম মেনে চলে।

সে কারণেই যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর পরিবর্তনকে প্রাকৃতিক কারণের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। সার্লও এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করেই দাবী করেছেন যে, চেতনাও একটি জৈবিক ঘটনা এবং অন্যান্য জৈবিক ঘটনার যেমন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব, চেতনারও তেমনি প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁর মতে, চেতনা বা অন্যান্য চেতন মানস ক্রিয়া যেমন ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা, যৌক্তিক চিন্তা প্রভৃতি অন্যান্য জৈবিক ঘটনার মতোই জৈবিক ঘটনা, তাদের থেকে আলাদা কিছু নয়, চেতনাও তেমনি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন একটি স্বাভাবিক সাধারণ জৈবিক ঘটনা,— "Consciousness, in short, is a biological feature of human and certain animal brains. It is caused by neurobiological processes and is as much a part of the natural biological order as any other biological features such as photosynthesis, digestion, or mitosis." (Searle 2002, 90)। সার্ল চেতনাকে পাচনক্রিয়া, রেচনক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাচনক্রিয়া, রেচনক্রিয়া যেমন জৈবিক ঘটনা, তাঁর কাছে চেতনাও একইরকম জৈবিক ঘটনা। মুখগহ্বরে খাদ্য প্রবেশমাত্র লালারস নিঃসৃত হয় এবং পরবর্তীকালে খাদ্য যখন পাকস্থলীতে পৌঁছয়, তখন সেখানে আরো নানা জারক রস (enzyme) খাদ্যের উপর নিঃসৃত হয়ে খাদ্যকে জারিত করে, যার ফলে পাচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দেহে খাদ্য প্রবেশ করা মাত্র বিভিন্ন স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতাবশত বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে খাদ্যের জারণ উপযোগী রস নিঃসরণ হতে শুরু হয়, যার দ্বারা পাচনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। উদ্ভিদ দেহেও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে। সেটিও একটি জৈবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। সার্লের মতে, জৈবিক ও শারীরতান্ত্রিক বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যেভাবে পাচনক্রিয়া বা সালোকসংশ্লেষ ঘটে, তেমনি মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে জৈবিক নিয়মেই

চেতন মানস দশার উদ্ভব হয়। সার্ল এ প্রসঙ্গে (অন্যান্য জৈবিক ঘটনার মতো) চেতনার জৈবিক প্রাকৃতিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সার্ল চেতনাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয় বা আরো ভালোভাবে বললে, জগতের স্বাভাবিক জৈবিক ধর্মরূপে ব্যাখ্যা করলেও, তিনি মানেন যে, এভাবে চেতনাকে গ্রহণ করতে হয়তো আমাদের একটু অসুবিধাই হয়। তাঁর মতে, আধুনিক মনোদর্শনের সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে দেকার্তের হাত ধরে। দেকার্ত মনকে জড় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র জড় বস্তুকেই বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। মন বা চেতনা বিষয়ক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা কার্তেসীয় চিন্তায় অসম্ভব বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সার্ল মনে করেন, বিংশ শতাব্দীতে চেতনা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতিকেও এই কার্তেসীয় চিন্তা বাধা দেয়। চেতনা যে এই জগতেরই একটি বিষয়, তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, তা মানতে আমাদের অসুবিধা হয়। সার্লের উদ্দেশ্য হল, আধুনিক বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে চেতনাকে নিয়ে এসে তাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা (Searle 2002, 85)।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ (scientific worldview) বলতে কি বোঝায় তা সার্লকে অনুসরণ করে একটু বুঝে নেওয়া যাক। বৈজ্ঞানিক আলোচনা সবসময়ই পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিষয় সম্বন্ধীয় হয়ে থাকে। সার্লের মতে, এই জগতে নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে, তার মধ্যে কোনো কোনো তত্ত্ব সম্ভাব্য, কোনো কোনো তত্ত্ব আবার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে সার্ল দুটি বৈশিষ্ট্য বা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে চিহ্নিত করেছেন

যারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্যতম কারণ,– (১) জড় জগত বিষয়ক আণবিক তত্ত্ব (atomic theory of matter), (২) জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব (evolutionary theory of biology)। এই তত্ত্বগুলির ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করেননি, যদিও এদের প্রভাব যে অপরিসীম তা তিনিও মানেন। চেতনাকে যদি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে স্থাপিত করতে হয়, তাহলে, সার্লের মতে, তাকে এই দুটি তত্ত্বের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আণবিক তত্ত্বের মূল কথা হল, এই জগতের প্রতিটি বস্তুই অসংখ্য জড় সূক্ষ্ম কণার দ্বারা গঠিত। বড়, ছোট, মাঝারি যে কোনো বস্তুই হোক না কেন, তাকে বিভাজন করলে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় কণা পাওয়া যাবে। আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলিকে ‘কণা’ বলতে আপত্তি করতে পারে, কারণ পরমাণু বিভাজনের পর যে ইলেকট্রন পাওয়া যায় তা শক্তির আধার, তার বিস্তৃতি পরিমাপযোগ্য নয়। যাইহোক, বিজ্ঞানের জটিলতাকে সরিয়ে রেখে সার্ল সহজভাবে ‘কণা’ কথাটিই ব্যবহার করেছেন (Searle 2002, 86)। আণবিক তত্ত্বের মূল কথা হল, এই জগতের যাবতীয় বস্তুই আসলে একেকটি তন্ত্র (System), যা হয়তো একাধিক অনুতন্ত্রের (subsystem) সমাহার। এখন, এই বড় বড় তন্ত্রগুলি যেহেতু ছোট ছোট অনুতন্ত্রের দ্বারা গঠিত হয়, সেহেতু বড় বড় তন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যেরই কারণগত ব্যাখ্যা ছোট ছোট অনুতন্ত্রের আচরণের দ্বারা দেওয়া সম্ভব হয়।

একটি ঘটনার বিভিন্ন স্তরীয় ব্যাখ্যা (different levels of explanations) হতে পারে বলে সার্ল মনে করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, বিজ্ঞানে দুটি স্তর স্বীকৃত,— একটি হল নিম্নস্তরীয় আণবিক স্তর (micro level) ও আরেকটি উচ্চস্তরীয় মহৎ পরিমাণ

স্তর (macro level)। কোনো একটি ঘটনার কারণিক ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে যেমন উচ্চস্তরের বিষয়ের ভিত্তিতে উচ্চস্তরের কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, (macro to macro)। তেমনি আবার নিম্নস্তরের ভিত্তিতে নিম্নস্তরীয় কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় (micro to micro) আবার উচ্চস্তরীয় ঘটনার ব্যাখ্যা নিম্নস্তরের মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে (bottom-up, micro-macro)। যেমন, কোনো বস্তুর কাঠিন্যের ব্যাখ্যা যদি বস্তুটির প্রতিরোধক্ষমতা বা অভেদ্যতার সাহায্যে দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে 'macro to macro' আবার পরমাণুর মিশ্রণকে যদি পরমাণুর গতির বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা হবে 'micro to micro'। আর কাঠিন্যকে যদি পারমাণবিক গঠনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা 'micro-macro' হয়। সার্ল এই ব্যাখ্যাকে 'bottom-up' 'micro-macro' নামে অভিহিত করেছেন কারণ এক্ষেত্রে উপরিতলের (surface) বা উচ্চস্তরের ঘটনার (macro phenomena) ধর্ম বা আচরণ নিম্নস্তরের ঘটনার (lower level micro-phenomena) দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় (Searle 2002, 87)।

অন্যদিকে, সার্লের মতে জীববিজ্ঞান বিবর্তনবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে জীব জগতের অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। জীব জগতের বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। যদি সহজকথায় বলতে হয়, তাহলে বলা যায় যে কোনো এক প্রজাতির জীবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে ঐ প্রজাতির আবার কয়েকটি জীবের জন্ম হল এবং ক্রমাগত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐ একই প্রকারের জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি বহন করে চলল। কিন্তু অনেক সময়ই তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তনও আসতে শুরু করে, তাদের উপরিতলের ধর্মে (surface features বা phenotype) পরিবর্তন ঘটে

পরিবেশগত কারণে। পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন নতুন নতুন প্রজন্মের জীবগুলির বাহ্যিক দিকগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পারিপার্শ্বিক কারণে তাদের উপরিতলের ধর্মে যে পরিবর্তন আসে তার দ্বারা তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ধারিত হয়। যারা নিজেদের নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, তাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয় এবং নিজেদের অনুরূপ পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির সুযোগ তারা পায়। তাদের জৈব বিবর্তনের ধারা এভাবে এগিয়ে চলে (Searle 2002, 88)। অর্থা বিবর্তনের ধারায় এক প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম মূল কারণ হল তার সক্ষমতা (fitness)। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু এটাই সব নয়। সার্লের মতে, এক্ষেত্রে কারণিক বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যে কারণবশতঃ কোনো একটি জৈবতন্ত্র তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। সার্ল উদ্ভিদ জগত থেকে উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। গাছের পাতা সূর্যের দিকে মেলে থাকে কেন? সার্ল বলছেন, প্রক্রিয়াগত স্তরের ব্যাখ্যায় (functional explanation) বলা যায় যে, ঐ প্রজাতির অস্তিত্বরক্ষায় এটি সহায়ক হয়। সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তার অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, সার্লের মতে, এমন মনে করার কোনো অর্থই হয় না যে, নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার জন্য উদ্ভিদ নিজের পাতা সূর্যের দিকে মেলে ধরে, বরং তার মধ্যে একটি সুপ্ত প্রবণতা থাকে বলেই গাছ নিজের পাতা সূর্যের দিকে মেলে থাকে। এ প্রসঙ্গেই কারণিক ব্যাখ্যা (causal explanation) প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। গাছের জিনগত প্রক্রিয়া গাছের জৈব-রাসায়নিক গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যার ফলে অক্সিন (auxin) নামক এক হরমোন নিঃসৃত হয় যার কারণে গাছের পাতা সূর্যালোকের গতিপথের দিকে মেলে থাকে। সার্লের মতে, এই দুটি ব্যাখ্যাকে

একসঙ্গে নিলেই বিবর্তনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জিনগত বৈশিষ্ট্য (genatoype) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে এমন এক phenotype বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয় যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করে এবং একটি বিশেষ প্রজাতির জিনকে বাঁচিয়ে রাখে ও প্রজননের মাধ্যমে বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে নিয়ে যায় (Searle 2002, 88-89)।

বিবর্তনের ধারায় জৈবতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে, যা অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো জৈবতন্ত্রে স্নায়ুকোষের আবির্ভাব হয়েছে যা ক্রমে ক্রমে একটি সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র গড়ে তুলেছে। স্নায়ুতন্ত্রসম্পন্ন জৈবতন্ত্রের কোনো কোনোটি আবার এতটাই জটিল হয়ে পড়েছে যে তারা চেতন দশা বা চেতন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় জৈবিক প্রক্রিয়ার মতো চেতনারও সৃষ্টি হয়েছে, তা জড় জগতের অতিরিক্ত বা জড় জগত থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু নয়। সুতরাং, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে বা জড় জগতে (মস্তিষ্কে) চেতনাকে স্থাপন করতে কোনোই অসুবিধা হবার কথা নয় বলেই সার্ল মনে করেন (Searle 2002, 90)।

সার্লের মতে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে চেতনার উদ্ভব। অন্যান্য জৈবিক ঘটনাগুলি যেমন তাদের নিম্নস্তরীয় জৈবিক ঘটনার কার্য, চেতনাও তাই। অন্যান্য জৈবিক ঘটনাকে যেমন কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব, সার্লের মতে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকেও তেমনি অনুকরণের মাধ্যমে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে চেতনা সৃষ্টি করাও সম্ভব। গাছ, মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পাতায় থাকা ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজের খাদ্য তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াই

সালোকসংশ্লেষ নামে খ্যাত। বিজ্ঞানের অগ্রগিতর ফলে, গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে যদি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় তাহলে, সার্ল প্রশ্ন করেছেন, চেতনাকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে বাধা কোথায় (Searle 2002, 92)। সার্ল মনে করেন, সালোকসংশ্লেষ, পাচন ক্রিয়ার মতো প্রক্রিয়াগুলি যতখানি জৈবিক, চেতনাও ততখানিই জৈবিক। বিবর্তনের ধারায় জীবদেহে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে, চেতনাও তাদেরই মতো একটি প্রক্রিয়া। বিবর্তনের কোনো একটি ধাপে এমন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে যারা চেতনা সৃষ্টি করতে বা তার অধিষ্ঠান হতে সক্ষম। তাই সার্ল মনে করেন যে, যদি চেতনার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করতে হয়, তাহলে কার্তেসীয় দ্বিকোটিক বিভাজনকে যেমন বর্জন করতে হবে তেমনি চেতনাকে জৈবিক প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে। তিনি চেতনাকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবেই গণ্য করেন, তাই তাঁর মতে, চেতনাকে 'naturalize' করার কোনো প্রয়োজন নেই (Searle 2002, 93)।

এখন, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, সার্ল চেতনা বলতে কী বুঝেছেন? সার্ল চেতনার লক্ষণ (definition) দেননি। কিন্তু চেতনা বলতে তিনি যা বোঝেন, তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, স্বপ্নবিহীন নিদ্রা থেকে যখন আমরা জেগে উঠি, তখন আমরা চেতন দশা লাভ করি এবং যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি, আমাদের এই চেতন অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। যখন আমরা ঘুমোতে যাই, বা ওষুধ দিয়ে যদি আমাদের অজ্ঞান করা হয়, বা মৃত্যুর পর আমাদের চেতনা অবলুপ্ত হয়। ঘুমের মধ্যে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের চেতন দশা ফিরে আসে, যদিও স্বপ্নকালীন চেতনার মাত্রা অনেক কম হয়। সার্ল অবশ্য মনে করেন, জাগ্রত অবস্থাতেও

আমাদের চেতনার মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, যখন খুব ঘুম আসে বা একঘেয়েমি অনুভব হয়, তখন অবশ্যই চেতনার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে (Searle 2002, 83)।

সার্ল তাঁর প্রায় সব লেখাতেই চেতনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তার কারণ সম্ভবত মানস দশার যে চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন,— চেতনা, বিষয়মুখিনতা (intentionality), বিষয়ীনিষ্ঠতা (subjectivity) ও মানস কারণতা (mental causation) — চেতনা এদের মধ্যে অন্যতম। সার্লের মতে, দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ে এত সমস্যা, দ্বৈতবাদ ও জড়বাদের মধ্যে এত যে বিরোধ, তার মূল কারণ হল মানস দশার এই বৈশিষ্ট্যগুলি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি, সার্লের মতে, এমনই যে তারা মানস দশা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সম্ভাবনাকেই নস্যাৎ করে দেয় (Searle 2003, 13)।

সার্লের মতে, মানস দশার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চেতনা। চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়, কারণ এই জগতে যে চেতন মানস দশা আছে তা আমরা অনুভব করি, কিন্তু এই ভৌত জগতে চেতনা কীভাবে আছে, তা আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। চেতনা মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অংশটি চেতন? কীভাবে জড় মস্তিষ্কের অংশগুলি চেতন হতে পারে তা বোঝা যায় না (Searle 2003, 13)। সার্ল মনে করেছেন যে, চেতনাকে বাদ দিয়ে জগত চিন্তা করা যেতেই পারে, কিন্তু সে জগত অর্থহীন হয়ে যাবে। কারণ মানবজীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হল চেতনা। চেতনা ব্যতীত ভাষা, ভালোবাসা, হাসি-ঠাট্টা প্রভৃতি কোনোকিছুরই কোনো অর্থ থাকে না।

মানস দশার দ্বিতীয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয়মুখিনতা (intentionality)। মানস দশা মাত্রই বিষয়াভিমুখী। প্রতিটি মানস দশা কোনো না কোনো বিষয়ক হয়। এমন কখনোই হতে পারে না যে, কোনো একটি মানস দশা আছে যার কোনো বিষয় নেই। সার্লের মতে, শুধু অভিপ্রায় নয়, আমাদের সব মানস দশা, যেমন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, ঘৃণা, ভয়, কামনা, বাসনা সবই কোনো না কোনো বিষয়ক। তারা কোনো একটি বিষয়কে অবশ্যই নির্দেশ করে। চেতনার মতো বিষয়মুখিনতা বিষয়েও একই প্রশ্ন ওঠে। কীভাবে আমাদের জড় মস্তিষ্কের ভিতর বিষয়মুখিনতা থাকতে পারে? আমাদের মস্তিষ্ক কতগুলি জড়কণা বা জড় অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত, ঠিক যেমন জগতের অন্যান্য বস্তুগুলি গঠিত। তাহলে কেন মস্তিষ্কেই চেতনা বা বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মগুলি আছে? জগতের অন্য কোথাও কেন নেই? (Searle 2003, 14)।

চেতন মানস দশার অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বিষয়ীনিষ্ঠতা বা ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity)। এই জগতের অন্য কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয় না। সার্লের মতে, এই বৈশিষ্ট্যই মানস দশা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সবচেয়ে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করে। এখন, বিষয়ীনিষ্ঠতা বলতে কী বোঝায় সার্লকে অনুসরণ করে তা একটু বুঝে নেওয়া যাক। সাধারণভাবে, সার্ল বলেছেন, বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গে 'বিষয়ীনিষ্ঠতা', 'বস্তুনিষ্ঠতা' (objectivity) শব্দগুলি প্রযুক্ত হয়। সবসময় কোনো একটি বচনের সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না, কারণ অনেক সময়ই তা জ্ঞাতার অনুভবসাপেক্ষ হয়। যে বচনে শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করা হয়, সেখানে বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য যাচাই করে বচনের সত্যতা নির্ধারণ করা যায়; কিন্তু যদি বচনটি কোনো ব্যক্তির অনুভবসাপেক্ষ হয়, যদি সেখানে

জ্ঞাতার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই বচনের বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায় না। এই ধরনের বচনকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বা বিষয়ীনিষ্ঠ বচন বলা হয়।

চেতন মানস দশা প্রসঙ্গে যখন ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়ীনিষ্ঠতার বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়, তা এরকম নয়। সার্ল মানস দশা প্রসঙ্গে যখন ব্যক্তিনিষ্ঠতার কথা বলেন তখন তিনি সত্তার স্তরে একটি প্রকরণ (ontological category) হিসেবে ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে বোঝেন, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকরণ হিসেবে নয়। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সার্ল বিষয়টি বুঝিয়েছেন (Searle 2002, 94)। মনে করা যাক, 'আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে' — এই বাক্যটিকে বস্তুনিষ্ঠ বলাই যায় কারণ এই বাক্যে যা বলা হয়েছে তা বাস্তব তথ্য এবং তা কোনো ব্যক্তির অনুভব, মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গীসাপেক্ষ নয়। কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। ব্যথাটির অবশ্যই ব্যক্তিনিষ্ঠ দিক আছে বলে সার্ল মনে করেছেন, যাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি বলেন যে, চেতনা হল ব্যক্তিনিষ্ঠ।

কোনো একটি মানস দশাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলার অর্থ হল, ঐ মানস দশাটি যে ব্যক্তির তিনিই কেবলমাত্র ঐ দশাটিকে সাক্ষাৎভাবে জানতে পারবেন, অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে সার্ল উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (first person perspective) ও প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর (third person perspective) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। জড় জগত বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ তথ্যকে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়। অন্যদিকে যা কিছু ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভব তা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়। যে ব্যক্তির দাঁতে ব্যথা, তিনিই কেবলমাত্র ব্যথার অনুভব করবেন, অন্য ব্যক্তির

পক্ষে তা সম্ভব নয়। সার্ল মনে করেন, যে কোনো মানস দশার ক্ষেত্রেই এটা সত্য (Searle 2002, 94)।

সার্লের মতে ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতন দশা সবসময়ই আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে এই অর্থে যে, তা আমার কাছে আছে এবং আমি বাদ দিয়ে আরো যত চেতন জৈবিকতন্ত্র আছে যেমন, কুকুর, বিড়াল, তাদের মধ্যেও ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতন দশা আছে। জগত সম্পর্কে যদি আমাদের একটি ছবি কল্পনা করতে হয়, সার্ল বলছেন, আমরা সবসময়ই কতগুলি জড়কণার দ্বারা গঠিত তন্ত্রের কথাই ভাবতে পারি, যাদের প্রত্যক্ষযোগ্য কিছু গুণাগুণ আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে চেতনাকে আমরা কখনোই পাই না। সার্লের মতে, চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতাই (subjectivity of consciousness) চেতনাকে আমাদের কাছে অদৃশ্য করে রাখে (Searle 2002, 96)। অন্য ব্যক্তির চেতনাকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র তার বাহ্যিক আচরণকেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। আর নিজের চেতনার প্রতি যদি আমরা মনোনিবেশ করি তাহলে কেবলমাত্র সেই বিষয়টিকেই পাই, যেটি সেই মূহুর্তে আমার চেতনার বিষয়, চেতনাকে পাই না। অন্তর্দর্শন (introspection) পদ্ধতি তো অনেকদিন আগেই মনোদর্শনের জগতে বাতিল বলে বিবেচিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে অন্যের চেতনাকে জানার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ সার্ল মনে করেন (Searle 2002, 97) নিজের চেতনাকেও অন্তর্দর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায় না। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে নিজের মানস দশা সম্বন্ধে যা আমরা জানতে পারি, তা হল অন্য একটি মানস দশা। সুতরাং এই পদ্ধতিগুলির কোনোটির দ্বারা চেতন মানস দশাকে জানা সম্ভব হয় না।

অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে যদি ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে জানা না যায় তাহলে অবধারিতভাবে যে বিকল্পটি অবশিষ্ট থাকে তা হল— বাহ্যদর্শন বা পর্যবেক্ষণ। সার্ল বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞান যে পদ্ধতিতে জগতকে ব্যাখ্যা করে, সেই বস্তুনিষ্ঠ (objective) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে জানা সম্ভব নয় বলেই মনে হয় (Searle 2002, 98)। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, একজন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, কিন্তু তার ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। আবার, নিজের ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়। যখনই আমরা কোনো বিষয় পর্যবেক্ষণ করি, বাস্তব জগতের কোনো কিছুকে দেখি, তখনই আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠতার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু বিষয়নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠতার পর্যবেক্ষণ কখনই সম্ভব নয়। এই কারণেই সার্ল মনে করেছেন যে, আর্মস্ট্রং প্রমুখ (Searle 2002, 100) ভৌতবাদী দার্শনিকরা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, যেহেতু তাঁরা ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে সত্তাগত স্তরে পর্যবেক্ষণযোগ্য বলে মনে করেননি, এবং যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণলব্ধ বস্তুনিষ্ঠ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাই চেতনা তাঁদের কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

সার্ল মনে করেছেন, বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে সত্যিই এমন কোনো বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, যা জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য (reducible) নয়। অর্থাৎ এই জগতে এমন বস্তুর অস্তিত্ব আছে যা বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ, কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়— একথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তনীয়ই নয় (Searle 2002, 99)। কিন্তু সার্লের মতে, সমস্যা হল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই বলুক, আমরা আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় অনুভব করি যে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা আছে— “Yet we all know that subjectivity exists” (Searle 2002, 99)।

সার্ল চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, চেতনাতে ব্যক্তিনিষ্ঠতা অছে সেকথাও মানেন কিন্তু তারপরেও চেতনাকে তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেই ব্যাখ্যা করতে চান। সার্ল দেখেছেন যে, দেহ মনের সমস্যার সহজ সরল সমাধান দেবার চেষ্টা যুগ যুগ ধরে হলেও, সে বিষয়ে নানা আপত্তি উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি থমাস নেগেলের (Nagel 1974, 1986) কথা বলেছেন। নেগেল তাঁর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলেও তার ভিত্তিতে ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতনা বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে-- ভৌতবাদীদের এই দাবীকে নেগেল খণ্ডন করেছেন। নেগেল আরো মনে করেন যে, দেহ-মনের সমস্যার সমাধানের পথে আরো নানা সমস্যা আছে। বিজ্ঞানে কারণিক ব্যাখ্যা বলতে কারণিক আবশ্যিকতাকে বোঝানো হয়। যেমন, H_2O-র আণবিক গঠনের দরুনই জল তরল হয়। অর্থাৎ জলের আণবিক গঠন থেকে জলের তরলতা আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয়। এখন, প্রশ্ন হবে, আবশ্যিকতা (necessity) বলতে কী বোঝায়? বিজ্ঞানে আবশ্যিকতা বলতে বিরোধের অচিন্ত্যনীয়তাকে বোঝানো হয়। নেগেলে মনে করেন, জড় ও চেতনের মধ্যে কোনো আবশ্যিকতা কখনোই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। জলের ক্ষেত্রে যেমন জলের আণবিক গঠন ও তরলতার মধ্যে আবশ্যিকতার কথা বলা যায়, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা ও যন্ত্রণার মধ্যে তেমন আবশ্যিকতার কথা বলা যায় না। কারণ এমন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করাই যায়, যেখানে যন্ত্রণা হবার মতো স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রণার কোনো বোধ নেই।

সার্ল অবশ্য নেগেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন। কারণ, তিনি মনে করেন, এমন কখনোই হতে পারে না যে, যন্ত্রণার উপযুক্ত সব স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির যন্ত্রণার বোধ হবে না। যদি এমন কোনো ব্যতিক্রিমী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, হয়তো কোনো কোনো মস্তিষ্ক দশার উপযুক্ত অনুভব তৈরি করার সামর্থ্য থাকে না, যদিও সে বিষয়ে আমরা এখনো পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারিনি।

চেতনা ও জড় জগতের আবশ্যিক সম্বন্ধ বিষয়ে নেগেল আরো আপত্তি করেন যে, চেতনা ও স্নায়ুতান্ত্রিক দশার মধ্যবর্তী কারণিক আবশ্যিকতা আমাদের পক্ষে কোনোদিনই জানা সম্ভব নয় কারণ, আমরা সবসময়ই ব্যক্তিনিষ্ঠ অবস্থানের মধ্যে আছি। এই ব্যক্তিনিষ্ঠ অবস্থান থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতনা ও স্নায়ুতান্ত্রিক দশার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করা কখনই সম্ভব নয়।

সার্ল মনে করেন যে, আমাদের কাছে জড়বস্তু ও তার আণবিক গঠনের সম্বন্ধকে বোঝা সম্ভব হলেও স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা ও চেতনার পারস্পরিক আবশ্যিকতাকে জানা হয়তো কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে হয়তো তা কঠিন হবে না। তাঁর কাছে উভয় আবশ্যিকতাই সমরূপে প্রতীয়মান হবে। জলের আণবিক গঠনের সঙ্গে তরলতার সম্বন্ধ আমরা যেভাবে বুঝতে পারি, চেতনা ও স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সম্বন্ধ হয়তো সেভাবে বুঝতে না পারলেও, পরোক্ষভাবে বোঝা যেতে পারে। মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞান আমাদের পূর্ণ জ্ঞান দিতে না পারলেও বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার স্নায়ুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা কিন্তু স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞান আমাদের দিতে পারে। তাই সার্ল আশা

করেন যে, নেগেল যতই মনে করুন না কেন বর্তমান ধারণাগত পরিকাঠামোকে দেহ-মনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় — কিন্তু তা সঠিক নয়; এই ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই তা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সার্ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করতে চান, তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, তিনি বোধহয় চেতনার জড় জগতে পর্যাবসানকে স্বীকার করবেন। কিন্তু তা, সত্য নয়, তিনি চেতনাকে জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য বলে মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন,— উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (first person perspective) ও প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (third person perspective)। প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বস্তুর বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। জগতের যে কোনো বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লাভ করা সম্ভব, চেতনা ব্যতিরেকে। সার্ল মনে করেন, চেতনার ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি চেতনাকে বোঝা হয়, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে, বাইরে থেকে যদি চেতনাকে বোঝার চেষ্টা করা হলে, চেতনার সঠিক ব্যাখ্যা কখনোই পাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতিতে, প্রত্যক্ষ আভ্যন্তরীণ অনুভবে আমাদের চেতন দশাগুলিকে যেভাবে অনুভব করি, উত্তম পুরুষের এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনোই বাহ্যজগতে থাকা অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই সার্ল মনে করেন যে, এই জগতের সব বিষয়কে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও চেতনার ক্ষেত্রে তা করা যায় না, কেননা তাহলে তার ব্যক্তিনিষ্ঠতা, যা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কেবলমাত্র জ্ঞাত হতে পারে— তা ক্ষুণ্ণ হয় (Searle 2004, 113)।

সার্লের এই বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, সার্ল স্ববিরোধী কথা বলছেন। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেও তিনি বলছেন যে, চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করলে, অর্থাৎ প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ (third person) থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে তার সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। চেতনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা কেবলমাত্র উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষ। সার্লের এই মত থেকে অবশ্যই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয় তিনি স্ববিরোধী কথা বলছেন অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে বর্জন করেছেন। কিন্তু সার্ল কোনো মূল্যেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বর্জন করতে চান না। তাঁর মতে, কিছু ভ্রান্ত ধারণাই এ ধরনের চিন্তার জন্য দায়ী। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদী চিন্তা এমনভাবে আমাদের মনে বসে আছে যে, তার থেকে বেরিয়ে এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না; বা দুটি জগতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোও সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, "Consciousness is not a "staff", it is a feature or property of the brain in the sense, for example, that liquidity is a feature of water." (Searle 2002, 105)। তিনি একইসঙ্গে মনে করেন যে, চেতনা কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনের (introspection) মাধ্যমেই জ্ঞাত হতে পারে-- এই পূর্বস্বীকৃতিও আমাদের বিপথগামী করে। তাঁর মতে, ঐ পূর্বস্বীকৃতি বর্জন করতে পারলেই, অর্থাৎ চেতনা যে অন্তর্দর্শনে প্রাপ্ত বিষয় নয়, একথা বুঝতে পারলেই, চেতনার দৈশিক অবস্থান স্বীকার করা সম্ভব হবে। চেতনা কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনে প্রাপ্ত নয় অর্থাৎ চেতনার বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব আছে, দেশ কালে আবদ্ধ জগতে তার অবস্থান রয়েছে। সার্ল মনে করেন, চেতনা মস্তিষ্কে অবস্থান করে ("...it is located in the brain" — Searle 2002, 105)। আমরা আমাদের চেতন অভিজ্ঞতার

দৈশিক অবস্থান অনুধাবন করতে পারি না, তার কারণ সার্ল মনে করেছেন, এটি অত্যন্ত জটিল একটি স্নায়ুতান্ত্রিক সমস্যা যা বিজ্ঞান এখনো সমাধান করতে পারেনি।

সার্লের এই চিন্তা থেকে স্পষ্ট যে, সার্ল চেতনাকে মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবেই বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই কারণেই চেতনার দৈশিক অবস্থান সম্ভব বলেও মনে করেছেন। যখন তিনি বলছেন যে, চেতনা হল মস্তিষ্কের ধর্ম ঠিক যেমন তরলতা হল জলের ধর্ম, তখন তাঁর এই বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তিনি চেতনাকে জড় জগতে পর্যাবসানের পক্ষপাতী। সার্ল নিজে স্পষ্টতই বলছেন যে "All forms of consciousness are caused by the behavior of neurons and are realized in the brain system, which is itself composed of neurons." (Searle 2004, 112)। ফলে সার্লকে পর্যাবসানবাদের সমর্থক বলেই মনে হয়।

সার্ল কিন্তু নিজেকে পর্যাবসানবাদী হিসেবে স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের জন্য পর্যাবসানের তত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পর্যাবসানের ধারণা দর্শনের জগতে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিভিন্ন প্রকারগুলি উল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেহ-মনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ধরনের পর্যাবসানের ধারণা প্রাসঙ্গিক।

(১) সত্তাগত পর্যাবসান (Ontological Reduction) : সার্লের মতে, বিভিন্ন ধরনের পর্যাবসানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে পর্যাবসানের ধারণা তা হল, সত্তাগত পর্যাবসান। এই ধরনের পর্যাবসানে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, একধরনের বস্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যধরনের বস্তু ভিন্ন কিছুই নয়। যেমন, চেয়ার হল কতকগুলি অণু-

পরমাণুর সংগঠন। আণবিক সংগঠনের অতিরিক্ত তাতে আর কিছুই নেই। বিজ্ঞানের জগতেও এই পর্যাবসানই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সার্ল মনে করেছেন, অন্যান্য সব পর্যাবসানের লক্ষ্যই হল সত্তাগত পর্যাবসান।

(২) ধর্মসত্তাগত পর্যাবসান (Property Ontological Reduction) : ধর্মসত্তাগত পর্যাবসান, সত্তাগত পর্যাবসানেরই একটি রূপ। সত্তাগত পর্যাবসান বস্তু বিষয়ে আলোচনা করে, কিন্তু ধর্মসত্তাগত পর্যাবসান বস্তুর ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, কোনো একটি বস্তুর (হতে পারে কোনো গ্যাস) উত্তাপকে ব্যাখ্যা করা হল তার অণু-পরমাণুর গতিশক্তির (mean kinetic energy) মাধ্যমে। উত্তাপ হল গ্যাসের ধর্ম। অর্থাৎ ঐ ধর্মটিকে ঐ বস্তুর (গ্যাসের) আণবিক গতিশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হল।

(৩) তাত্ত্বিক পর্যাবসান (Theoretical Reduction) : সার্লের মতে, তাত্ত্বিক পর্যাবসান মূলতঃ বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধকে বোঝায়, যেখানে একটি তত্ত্ব অন্য একটি তত্ত্বে পর্যবসিত হয়, এই অর্থে যে, যে তত্ত্বটি পর্যবসিত হচ্ছে (reduced theory) তার নিয়মগুলি (laws) যে তত্ত্বে পর্যবসিত হচ্ছে (reducing theory) তার নিয়মগুলি থেকে নিঃসৃত হয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, যে তত্ত্বটি পর্যবসিত (reduced theory) হচ্ছে সেটি, যে তত্ত্বে পর্যবসিত হচ্ছে (reducing theory) তারই একটি বিশেষরূপ।

(৪) যৌক্তিক বা লাক্ষণিক পর্যাবসান (Logical or Definitional Reduction) : যৌক্তিক বা লাক্ষণিক পর্যাবসান মূলতঃ শব্দ ও বাক্য সম্বন্ধিত হয়ে থাকে। কোনো শব্দ বা বাক্য দ্বারা যে বস্তুটি বা, যে ধরনের বস্তু নির্দেশিত হয়, তা যদি এমন কোনো শব্দ বা বাক্যের দ্বারা অনুবাদযোগ্য হয়, যে শব্দ বা বাক্যগুলি অন্য ধরনের বস্তুকে নির্দেশ করে, তাহলে

বলা যায় যে প্রথম শব্দ বা বাক্যটি, দ্বিতীয় শব্দ বা বাক্যে পর্যাবসানযোগ্য। যেমন, সংখ্যা বিষয়ক কোনো বাক্যকে, শ্রেণী (set) বিষয়ক বাক্যের দ্বারা অনুবাদ করা যাবে। ফলে, বলা যায় যে, সংখ্যা বিষয়ক বাক্যগুলি শ্রেণীবিষয়ক বাক্যে পর্যাবসানযোগ্য। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, এক ধরনের শব্দ বা বাক্য যেহেতু অন্য ধরনের শব্দ বা বাক্যে পর্যাবসানযোগ্য, তাই, তাদের দ্বারা নির্দেশিত বস্তুগুলিও সত্তাগত স্তরে পর্যাবসানযোগ্য (Searle 2002, 114)।

(৫) কারণিক পর্যাবসান (Causal Reduction) : সার্ল মনে করেছেন কারণিক ক্ষমতাযুক্ত দুধরনের বস্তুর মধ্যে যদি এমন সম্বন্ধ হয় যে একজনের কারণিক ক্ষমতা অন্যজনের কারণিক ক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রটিকে কারণিক পর্যাবসানের স্থল হিসেবে গণ্য করা যাবে। 'ক' জাতীয় ঘটনা, 'খ' জাতীয় ঘটনায় কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য হবে, যদি এবং কেবলমাত্র যদি 'ক' জাতীয় ঘটনার আচরণ সম্পূর্ণভাবে 'খ' জাতীয় ঘটনার আচরণের দ্বারা কারণিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ 'ক' জাতীয় ঘটনার যদি 'খ' জাতীয় ঘটনার অতিরিক্ত কোনো কারণিক ক্ষমতা না থাকে; 'ক' জাতীয় ঘটনার দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হয়, 'খ' জাতীয় ঘটনার দ্বারা সেই একই কার্য সম্পাদিত হলে, বলা যায় যে 'ক' জাতীয় ঘটনা, 'খ' জাতীয় ঘটনায় কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য। সার্ল উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। কঠিন বস্তুর কারণিক ক্ষমতা থেকে তার অভেদ্যতা (impenetnbitiy) বা চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রভৃতি নিঃসৃত হয়। কিন্তু এই কার্যক্ষমতাগুলি (causal powers) ঐ বস্তুর আণবিক গঠনের পরমাণুর স্পন্দনশীল গতির (vibratory movements of molecules) কারণিক ক্ষমতার দ্বারাও কারণিকভাবে ব্যাখ্যাত (causally explined) হতে পারে। অর্থাৎ

কঠিন পদার্থের কারণিক ক্ষমতা তার পরমাণুর আচরণের অতিরিক্ত বা পরমাণুর কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাই কঠিন পদার্থকে কারণিক দিক থেকে তার পরমাণুর কার্যক্ষমতায় পর্যাবসানযোগ্য বলে গণ্য করা যায় (Searle 2004, 119)।

সার্ল একথা মানেন যে, বিজ্ঞানের জগতে সাধারণভাবে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়ে থাকে। কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে সফলভাবে কারণিক পর্যাবসান সম্ভব,— একথা বলার অর্থ হল, ঐ ঘটনাকে তার কার্যক্ষমতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তার কারণিক ক্ষমতার সঙ্গে ঐ ঘটনাকে অভিন্নরূপে গণ্য করা হয়। যেমন, সাধারণ মানুষ সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো একটি বর্ণকে (মনে করা যাক্ লাল রং) যেভাবে অনুভব করে, সেই ব্যক্তিনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার (subjective experience) দ্বারাই লাল রঙের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়; ঐ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লাল রঙের প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞা (ostentive definition) দেওয়া হয়। কিন্তু যখনই বর্ণের কারণিক ক্ষমতার ভিত্তিতে বর্ণকে আলোর প্রতিফলনে পর্যবসিত করা হয়, তখন বর্ণের একটি নতুন লক্ষণ পাওয়া যায়। সার্ল মনে করেছেন এক্ষেত্রে বর্ণ সম্বন্ধিত যে ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভব, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। উত্তাপের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। উত্তাপকে যখন তার কারণিক ক্ষমতার নিরিখে বস্তুর আণবিক স্তরের গতিশক্তির (kinetic energy) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, তখনও কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে উত্তাপের নতুন লক্ষণ পাওয়া যায়। বর্ণ, উত্তাপ সবক্ষেত্রেই কিন্তু কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে ধর্মসত্তাগত পর্যাবসান (property ontological reduction) করা হয়ে থাকে। কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে যে নতুন সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্ধারিত হয়, তার ভিত্তিতেই

ঘটনাটির সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করা হয় (Searle 2002, 115)। বিজ্ঞানে এইভাবে প্রায়শই কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সার্ল মনে করেছেন, একটি বস্তুর কাঠিন্যকে যখন তার আণবিক গঠনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় এবং বলা হয় যে, কাঠিন্য বস্তুর আণবিক গঠনের অতিরিক্ত কিছুই নয়, তখন আসলে আণবিক গঠনের ভিত্তিতে কাঠিন্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সার্ল একটি বিষয়ের দুধরনের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন— উপরিতলের ধর্ম (surface feature) ও নিম্নস্তরীয় কারণগত ধর্ম। তাঁর মতে, কাঠিন্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেমন, তার অভেদ্যতা, চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা— এগুলিকে সার্ল উপরিতলের ধর্ম বা 'surface feature' হিসেবে গণ্য করেছেন। এই উপরিতলের ধর্মগুলি বাহ্যিক স্তরে পরিদৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি অন্তর্নিহিত নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের প্রতিফলনমাত্র। কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে যখন সত্তাগত পর্যাবসান করা হয়, তখন এ উপরিতলের ধর্মকে এড়িয়ে গিয়ে নিম্নস্তরীয় মূল কারণের ভিত্তিতে ঐ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়।

এখন, চেতনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যখন সার্ল বলেন যে, চেতনা হল স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা, তখন সার্ল যে চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনায় পর্যবসিত করেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। সার্ল নিজেও সেকথা স্বীকার করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, সার্ল কি তাহলে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসানও স্বীকার করবেন?

সার্ল এই সমালোচনার উত্তরে স্পষ্টতই বলেছেন যে, "... in case of consciousness we can make a causal reduction but we cannot make an ontological reduction without losing the point of having the concept." (Searle 2004, 119)। সার্লের মতে, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে চেতনার কারণিক ব্যাখ্যা (causal explanation) সম্পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভব হলেও তার ভিত্তিতে বলা যায় না যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক আচরণের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। এখন, প্রশ্ন হল, কেন কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান সম্ভব হবে না? সার্ল মনে করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে, ঠিক যেভাবে কাঠিন্য (solidity) ও তরলতার (liquidity) ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে, তাঁর মতে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity), উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (first person perspective) থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি চেতনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকে, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectivity) প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (third person perspective) থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। এখানেই অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে চেতন দশার পার্থক্য। কাঠিন্য বা তরলতার ক্ষেত্রে তাদের উপরিতলের ধর্মকে উপেক্ষা করে নিম্নস্তরীয় মূল কারণের ভিত্তিতে পুনর্সংজ্ঞায়িত (redefine) করা সম্ভব বলেও চেতনার ক্ষেত্রে তা করা যায় না। চেতনাও, সার্লের মতে, উপরিতলের ধর্ম বিশিষ্ট, কিন্তু তিনি মনে করেন, কাঠিন্যের ক্ষেত্রে উপরিতলের ধর্মকে উপেক্ষা করার মধ্যে কোনো অসুবিধা না থাকলেও চেতনার উপরিতলের ধর্ম যেমন, ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity),

বিষয়মুখিনতা (intentionality) প্রভৃতিকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং চেতনাকে বুঝতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিত করেই তাকে বুঝতে হবে (Searle 2004, 119-20)।

সার্ল মনে করেছেন, এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে আণবিক গঠনের (microstructure) তুলনায় উপরিতলের ধর্মই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (Searle 2004, 120)। এ প্রসঙ্গে তিনি বেটোফেনের 'ninth symphony'-র উদাহরণ দিয়েছেন। জল, মাটি প্রভৃতিকে তার আণবিক গঠনে পর্যবসিত করা যায়, বিজ্ঞান তা করতেই যেমন অভ্যস্ত, তেমনি বেটোফেনের সঙ্গীতকেও শব্দতরঙ্গে পর্যবসিত (reduce) করা যায়। কিন্তু কোনো একটি সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত বলতে তো কতগুলি শব্দতরঙ্গকে বোঝায় না, তার অতিরিক্ত কিছু বিষয় সেখানে থাকে। কীভাবে সঙ্গীতটি পরিবেশিত হল, তার মাধুর্য্য কতখানি মনকে ছুঁয়ে গেল, সেগুলিই বেশী গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে, সার্ল মনে করেন, চেতনাকে হয়তো স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতায় পর্যবসিত করাই যায়, কিন্তু তা করলে চেতনার অনেক বৈশিষ্ট্যই ক্ষুণ্ণ হয়। তাই চেতনার ক্ষেত্রে তার উপরিতলের ধর্মকে উপেক্ষা করা যায় না। চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা চেতনাকে অনান্য সব বিষয় থেকে শুধু পৃথকই করেনি, তাকে অনন্য করে তুলেছে (Searle 2004, 121)।

চেতনার সঙ্গে বর্ণ, উত্তাপ প্রভৃতির পার্থক্য কেন হয় সে বিষয়ে সার্ল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই জগতে এমন কিছু বস্তু আছে যাদের প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (third person perspective) থেকে জানা যায়, ভৌতবস্তুগুলি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আবার এমন কিছু কিছু বস্তু আছে, যাদের উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী (first person

perspective) থেকে জানা যায়। যেমন, ব্যথ্যা, বর্ণ সংবেদন, উত্তাপ সংবেদন প্রভৃতি। সার্লের মতে, এর সবগুলিই উত্তমপুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কারণিক দিক থেকে এরা কিন্তু তাদের মূলগত কারণ সমাহারে (causal base) পর্যাবসানযোগ্য। এই মূলগত কারণ সমাহার কিন্তু প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হতে পারে। সার্ল এ প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে, ব্যথার বা যন্ত্রণার (pain) সঙ্গে বর্ণ বা উত্তাপের পার্থক্য আছে। বর্ণের বা উত্তাপের ক্ষেত্রে তাদের মূলগত কারণের ভিত্তিতে অর্থাৎ আলোর প্রতিফলনের ভিত্তিতে বর্ণকে বা আণবিক গতির ভিত্তিতে উত্তাপকে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে (বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হয়তো তাই করতে চাইবেন); সাধারণভাবে তাই-ই করা হয়, তাদের সঙ্গে যুক্ত যে উত্তম পুরুষের অভিজ্ঞতা, সেগুলিকে সরিয়ে রেখেই তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যথা বা যন্ত্রণার মতো চেতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তা করা যায় না বলেই সার্ল অভিমত প্রকাশ করেছেন (Searle 2004, 121)। ব্যথা বা যন্ত্রণার ক্ষেত্রে তার উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুভবকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা হিসেবে যদি যন্ত্রণাকে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে যন্ত্রণার মূল বৈশিষ্ট্যটিও হারিয়ে যাবে। যন্ত্রণার ক্ষেত্রে তার কারণের তুলনায়, কীভাবে আমরা যন্ত্রণাটি অনুভব করছি সেটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে বলে সার্ল দাবী করেছেন (Searle 2004, 122)।

সার্ল এ প্রসঙ্গে থমাস নেগেল (Thomas Nagel), সল ক্রিপকে (Saul Kripke), ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন (Frank Jackson) প্রমুখ দার্শনিকের কথা বলেছেন। এঁরা সকলেই জড়বাদী তত্ত্বের সমালোচক। প্রথম অধ্যায়ে জড়বাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁদের মত আলোচনা করেছি। থমাস নেগেল তাঁর “What Is It Like to Be a Bat?”

প্রবন্ধে (1974) উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হওয়া এবং প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হবার মতো ধর্মগুলিই যে আলাদা— তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম আর ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) ধর্মগুলিকে যে একপ্রকারভুক্ত করা যায় না, তা ঐ প্রবন্ধে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিস্ফূট হয়েছে। জ্যাকসন (Jackson) তাঁর "What Mary Didin't Know" (2002) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলেও যন্ত্রণা বা যে কোনো সংবেদনের ক্ষেত্রেই যে অনুভবের বিষয়টি থাকে, যে বিষয়ে কেউ অজ্ঞ হতে পারেন। অর্থাৎ মূলগত কারণ জানা থাকলেই ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবকে (subjective experience) জানা যায় না। ক্রিপকে (Kripke 1980) দেখাতে চেয়েছেন যন্ত্রণার মতো কোনো ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবকে স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায় না, কারণ অভিন্নতার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আবশ্যিকতার প্রসঙ্গ আসে। অভিন্নতার দুটি সম্বন্ধীকেই দৃঢ় নির্দেশক (rigid designator) হতে হয়। কিন্তু যন্ত্রণা আর স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার মধ্যে সম্বন্ধ কখনোই আবশ্যিক হতে পারে না। এমন কোনো প্রাণী থাকতেই পারে যার যন্ত্রণার বোধ আছে, কিন্তু স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন, এক্ষেত্রে যে আপত্তিটি স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে, তা হল, এই প্রত্যেকটি যুক্তিই তো জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থাৎ, জ্ঞাতা তার অনুভবকে কীভাবে জানতে পারছে, সেই বিষয়ক; সত্তা সম্বন্ধীয় নয়। সার্ল একথা স্বীকার করেন যে 'আমি যন্ত্রণা অনুভব করছি'— এই কথার মধ্যে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক অবশ্যই আছে এবং সেই কারণেই আমি আমার যন্ত্রণাকে জানতে পারি, অন্যের যন্ত্রণাকে জানতে পারি না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টি তা নয়। এক্ষেত্রে, সার্লের মতে, জগতে কী কী ধরনের ধর্মের (features) অস্তিত্ব আছে, সত্তাগত স্তরে কতরকমের ধর্মের অস্তিত্ব আছে, সেটিই বেশী

জরুরী, আমরা তাদের কীভাবে জানতে পারি,— সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় (Searle 2002, 117-118)।

ব্যক্তিনিষ্ঠতা বিশিষ্ট চেতনাকে যদি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে হয় তাহলে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীসাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীসাপেক্ষ ব্যক্তিনিষ্ঠতাকে কখনোই পাওয়া যাবে না। সার্লের মতে, চেতনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হবে। তাঁর মতে, পর্যাবসান বিরোধী দার্শনিকদের কাছে এই পার্থক্যটি আদৌ জ্ঞানতাত্ত্বিক নয়, এটি অবশ্যই সত্তাগত জগতের পার্থক্য।

চেতনা, সার্লের মতে, কখনোই সত্তাগতভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থায় পর্যাবসানযোগ্য নয়। জড়বাদীরা চেতনাকে ভৌত জগতে পর্যবসিত করতে চান। কিন্তু সেক্ষেত্রে চেতনার কোনো স্বাতন্ত্র্য সেখানে রক্ষিত হয় না। ভৌত জগতের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার আর কোনো পার্থক্য থাকে না। কেবলমাত্র প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাঁরা চেতনাকে বুঝতে চান। জড়বাদীদের এই চিন্তাকে সার্ল সমর্থন করেন না, তাই তিনি বলেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থায় পর্যাবসানযোগ্য নয়। এখন, তাঁর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে, তাহলে কি তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল বর্জন করতে চাইছেন? সার্ল এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেও চেতনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। এই কারণেই তিনি পর্যাবসানের দুটি প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তার মাধ্যমে জড়বাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। জড়বাদীদের মতো তিনি যেমন

বলেন যে, “Consciousness is just a brain process” (Searle 2004, 127) তেমনি দ্বৈতবাদীদের মতো তিনি বলেন যে, “Conscioueness is irreducible to third person nurobiological process.” (Searle 2004, 127)। দ্বৈতবাদীদের মতো তিনি যখন চেতনাকে পর্যাবসানহীন বলে মনে করেন, তখন আবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, তিনি কি তাহলে ভৌত জগতের অতিরিক্ত কোনো জগত স্বীকার করছেন? আবার, জড়বাদীদের অনুসরণ করে যখন তিনি চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে পর্যবসানের অভিযোগও ওঠে। এই উভয়সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার জন্যই সার্ল দুধরনের পর্যাবসান তত্ত্বকেই চেতনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেছেন— কারণিক পর্যাবসান ও সত্তাগত পর্যাবসান। বর্ণ, উত্তাপ, কাঠিন্যের মতো চেতনার ক্ষেত্রেও তিনি কারণিক পর্যাবসানকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করতে তিনি রাজী নন। তাঁর কথায়, “Consciousness is causally reducible but not ontologically reducible.” (Searle 2004, 127)। তিনি চেতনাকে সাধারণ ভৌত জগতের অংশ হিসেবে দেখেছেন, তার অতিরিক্ত কোনো বিষয় হিসেবে নয়। দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি সার্বিকভাবে পরিহার করতে আগ্রহী। তাঁর মতে, দ্বৈতবাদীরা একটি যৌক্তিক সম্ভাবনাকে সামনে রেখে চেতনার সত্তাগত স্তরে পর্যাবসানহীনতা স্বীকার করেছেন— ‘ভৌত জগত অণু-পরমাণুর আচরণের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, এমন একটি জগতের কথা চিন্তা করাই যায় যে জগত ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমাদের জগতের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু সেখানে চেতনা অনুপস্থিত। কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে কখনোই এটা সম্ভব নয়

যে, কোনো দুটি ভৌত জগত অণু-পরমাণুর গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভিন্ন।

এখন, এই যুক্তির ভিত্তিতে, সার্ল মনে করেছেন যে, দ্বৈতবাদীদের অনুসরণ করে কখনোই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় যে, চেতনা বোধহয় মস্তিষ্কের অতিরিক্ত একটি বিষয়। সত্তাগতভাবে, ভৌত আর অ-ভৌত দুটি জগত আছে, চেতনা সেই অ-ভৌত জগতের অংশ। সার্লের মতে, দ্বৈতবাদীরা এক্ষেত্রে যে ভুলটি করেন, তা হল, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে (laws of nature) তাঁরা এই কল্প-পরীক্ষণের বাইরে রাখেন।

সার্ল মনে করেন, যদি আণবিকস্তরের (microparticles) স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা কল্পনা করা হয় তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সেখানে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের ধ্রুবত্বও (constant) মানতে হবে (Searle 2004, 129)। কিন্তু যদি এমন ভাবা হয় যে, আণবিকস্তরের সম্পূর্ণতা আছে কিন্তু চেতনা নেই, তাহলে সার্ল মনে করেছেন যে, এই কল্প-পরীক্ষণের (thought experiement) মধ্যে একটু ফাঁকি থেকে যায়। কারণ, এক্ষেত্রে কল্পনা করে নেওয়া হচ্ছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অণু-পরমাণুর জগতের যেভাবে আচরণ করার কথা সেভাবে তারা কাজ করছে না, অর্থাৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতনাকে সৃষ্টি করার জন্য, বা অনুভব করার জন্য তাদের যেভাবে কাজ করা উচিত, সেভাবে অণু-পরমাণুর জগত কাজ করছে না। ভৌত জগতের নিরিখে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূক্তিকরণ আবিশ্যক বলেই সার্ল বিবেচনা করেন, কারণ ভৌত জগত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অন্যতম উপাদান কারণের ভূমিকা পালন করে।

তাই যখনই তাদের ভৌত জগতের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, তখন চেতনার অস্তিত্ব ঐ প্রাকৃতিক নিয়মগুলি থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, কোনো একটি ঘটনার যৌক্তিক সম্ভাবনা কি এইভাবে বোঝা যায়? সার্ল মনে করেন, যৌক্তিক সম্ভাবনা নির্ভর করে কোনো একটি ঘটনাকে কীভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, তার উপর (Searle 2004, 129)। তাঁর মতে, যৌক্তিক দিক থেকে এমন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, যেখানে ভৌত অণু-পরমাণু সব উপস্থিত কিন্তু চেতনা অনুপস্থিত। যদিও সার্ল মনে করেন যে, ভৌত জগতের যে ব্যাপকতা বিজ্ঞানে স্বীকৃত, তাকে যদি সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি তার অন্তর্ভুক্ত হবে, শুধু তাই নয়, অন্যান্য অনেক বিষয় সেখানে বিবেচনাধীন হয়ে পড়বে। এইসব বিষয়গুলি একসঙ্গে মিলিত হয়েই বাস্তব জগতে চেতনার উৎপত্তি ও অনুভবকে সম্ভব করে তোলে। তাই সার্ল মনে করেছেন যে, একভাবে বর্ণনা করলে যে ঘটনাটিকে যৌক্তিকভাবে সম্ভব বলে মনে হয়, অন্যভাবে বর্ণনা করলেই তা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সার্ল মনে করেছেন, দ্বৈতবাদীরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে, প্রকৃত বিভাজনকেই বুঝতে পারেননি। সার্লের মতে, প্রকৃত বিভাজন রয়েছে ধর্মের জগতে-- এই জগতের কিছু ধর্মের মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতা, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা, পর্যাবসানহীনতা আছে, কিছু ধর্মের তা নেই। এখন এই পার্থক্য থেকেই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, সার্ল তো দ্বৈতবাদীদের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করছেন। দ্বৈতবাদীরা তো এই কথাই বলেন যে, চেতনধর্ম জড়ধর্মে পর্যাবসানহীন (irreducible)। সার্ল বলেছেন যে, এই চিন্তাই সবচেয়ে বড় ভ্রান্তির সূচনা করে। তাঁর মতে, তিনি যে

বিভাজনের কথা বলছেন, আর দ্বৈতবাদীরা যে চিরাচরিত দেহ-মনের বিভাজনের কথা বলেন, তা কখনোই এক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বৈতবাদ মূলগতভাবে জড় ও অজড়র বিভাজন করে। আমরা দেখেছি, দ্বৈতবাদ দুধরনের হতে পারে— দ্রব্যদ্বৈতবাদ ও ধর্মদ্বৈতবাদ। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ দ্রব্যদ্বৈতবাদকেই প্রতিষ্ঠা করে— জড় ও অজড়— দুটি দ্রব্যের মধ্যে দ্বিকোটিক বিভাজন স্বীকার করে। ধর্মদ্বৈতবাদ দ্রব্যের জগতে কোনো বিভাজন করে না, কিন্তু ধর্মের জগতে দুধরনের ধর্ম স্বীকার করে— জড়ধর্ম ও অজড়ধর্ম। এই ধর্মগুলি একটি অন্যটিতে পর্যাবসানযোগ্য নয় বলেই মনে করা হয়। দ্রব্যদ্বৈতবাদই হোক বা ধর্মদ্বৈতবাদ— উভয়তত্ত্বই দ্বৈতবাদী চিন্তার মূলসূত্রকে মেনে চলে। দ্বৈতবাদীরা পর্যাবসানহীনতা বলতে ভৌত জগত বা যে তন্ত্রে চেতনা উৎপত্তি লাভ করে বা অনুভূত হয়, সেই তন্ত্রের অর্থাৎ মস্তিষ্কের অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবকে বুঝতে চান। কিন্তু তা সার্লের মতে সঠিক নয়। সার্ল মনে করেন, চেতনা হল মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কেই তা উৎপত্তি লাভ করে এবং অনুভূত হয় (caused and realized), ফলে, ভৌত জগতের অতিরিক্ত কোনো বিষয় হিসেবে চেতনাকে গণ্য করা যায় না। অথচ, সার্লের মতে, চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (যেমন, ব্যক্তিনিষ্ঠতা, প্রভৃতি) যা তাকে অন্যান্য ভৌতধর্ম থেকে শুধু পৃথক করেনি, অনন্য করে তুলেছে। এই কারণেই সার্ল মনে করেন, চেতনাকে নিছক ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায় না। এখানে, সার্লের বিরুদ্ধে অবধারিতভাবে যে প্রশ্নটি আসবে তা হল, সার্ল কি শেষপর্যন্ত তাহলে সেই দু-ধরনের ধর্মই স্বীকার করে নিলেন— একটি ভৌত জগতে পর্যাবসানযোগ্য এবং অন্যটি নয়? সার্লের এই মত

কি ধর্মদ্বৈতবাদেরই নামান্তর হয়ে গেল না? সার্ল এই আপত্তির উত্তর কীভাবে দেবেন, তা আমরা পরে দেখব।

সার্ল দ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী নয় সে নিয়ে অনেক বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু সেই বিতর্ক সরিয়ে রেখে অন্য একটি সমস্যা নিয়ে আগে আলোচনা করা দরকার। সার্ল এমন একটি ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যে ধর্মটি ভৌত জগত থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভিন্ন এবং সে কারণে তা ভৌত জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। অর্থাৎ সত্তাগত স্তরে তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সার্ল স্বীকার করেন। এখন, সমস্যা হল, দর্শনের জগতে কোনো বিষয়ের সত্তাগত স্তরে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিবর্তনের ফলে এ জগতে কেবলমাত্র সেইসব বিষয়েরই আবির্ভাব ঘটেছে যাদের কোনো না কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রশ্ন হল কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে নির্ধারিত হবে? সাধারণভাবে, কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তার কার্যকারিতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোনো বস্তুর কার্যোৎপাদন সামর্থ্যের ভিত্তিতেই তার প্রয়োজনীয়তা বিচার্য। যে বস্তুর কোনো কার্যোৎপাদন সামর্থ্য নেই তা বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে, মনের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করার জন্য মনের স্বতন্ত্র কার্যোৎপাদন ক্ষমতাও সিদ্ধ করা প্রয়োজন।

মনের কার্যক্ষমতা বলতে কী বোঝায়? একটি মানস ঘটনা যদি অন্য কোনো একটি ঘটনাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে, তাহলেই বলা যাবে যে মনের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা আছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানস ঘটনার কারণিক ভূমিকা আছে বলেই অনুভব করি। আমার হাত তোলার ইচ্ছা হল, তাই আমি হাত

তুললাম। ইচ্ছা একটি মানস ঘটনা। এই মানস ঘটনাটি আমার হাতের পেশী সঞ্চালনের কারণিক ভূমিকা পালন করল। অতএব, মানস ঘটনার কার্যক্ষমতা আছে। দার্শনিক জগতে কিন্তু এত সহজে মানস কারণতা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, আমি যখন স্বেচ্ছায় আমার হাতটি তোলার চেষ্টা করছি, তখন পাশাপাশি আরো একটি ঘটনা ঘটছে। একটি নিছক শারীরবৃত্তিয় স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনা। আমার মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আমার হাতের পেশীকে উদ্দীপিত করে সচল করল, ফলে আমার হাত উত্তোলিত হল। সুতরাং আমার হাত তোলার পিছনে যেমন আমার সচেতন ইচ্ছা কারণ; তেমনি আমার দেহের রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াও কারণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটি ঘটনার একাধিক কারণ হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জগতে একটি ঘটনার একাধিক কারণ স্বীকৃত নয়, একটি ঘটনার দুটি পর্যাপ্ত কারণ থাকলে বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক পরিস্থিতিতে (counter factual) কার্য থেকে কারণকে অনুমান করা সম্ভব হয় না। এই ত্রুটিই দর্শনের জগতে অতিনিয়ন্ত্রণের সমস্যা হিসেবে পরিচিত। এখন, প্রশ্ন হতে পারে যে, অতিনিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কি মানস কারণতা প্রমাণ করা যায়? অনেক মনোদার্শনিকই মনে করেন যে, মানস-ভৌত কারণতা (mental to physical) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল, যখনই কোনো মানস কারণতার কথা বলা হয় তখনই আসলে অতিনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নেওয়া হয় (Kim, 1995)।

বিজ্ঞানানুসারী মনোদার্শনিকরা পদার্থবিজ্ঞানকেই আদর্শ বলে মনে করেন। পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, ভৌত জগত কারণিক দিক থেকে আবদ্ধ। ভৌত জগতের বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা ভৌত জগত কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত হতে পারে না। ভৌত জগতের সব বস্তু এবং ঘটনার ভৌত ব্যাখ্যা (নীতিগতভাবে) দেওয়া সম্ভব। এই

নীতি কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি বা 'principle of causal closure' নামে পরিচিতি। জে. কিম কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "If a physical event has a cause, it has a physical cause. And if a physical event has an explanation, it has physical explanation." (Kim 2006, 199)। ভৌতবাদীরা এই নীতিকে মেনে চলতে চান। তাঁরা মনে করেন যে, এই জগতের যত ঘটনা আছে সবই ভৌত ঘটনা এবং ভৌত ঘটনামাত্রই ভৌত কারণজনিত। কোনো ভৌত ঘটনার কারণ হিসেবে কোনো অ-ভৌত ঘটনা স্বীকার করা যায় না। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের প্রভাবে দর্শনের জগতে পদার্থবিজ্ঞানকে সব বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সব বিজ্ঞানের বিষয়ই পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদযোগ্য বা সব বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই পদার্থবিজ্ঞান প্রদত্ত ব্যাখ্যায় পর্যাবসানযোগ্য বলে মনে করা হয়। এই জগতের সব বিষয় সম্বন্ধে পদার্থবিজ্ঞান প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা ভৌত জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেননা পদার্থবিজ্ঞানে ভৌত জগতের অতিরিক্ত অন্য কোনো জগতের অস্তিত্বই স্বীকার্য নয়। এখন, কোনো একটি ভৌত ঘটনার অ-ভৌত কারণ স্বীকার করলে, তা পদার্থবিজ্ঞানের গন্ডির বাইরে চলে যায়। পদার্থবিজ্ঞান সব বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম— পদার্থবিজ্ঞানের এই সম্পূর্ণতার দাবী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। একইসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান এযাবৎ যত ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেগুলিও সংশয়াধীন হয়ে পড়ে। সেইজন্যেই পদার্থবিজ্ঞান কোনো অ-ভৌত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ।

কারণিক আবদ্ধায়নের নীতির সঙ্গে আরো একটি নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে যা পরিবর্জনের নীতি বা 'exclusion principle' নামে খ্যাত। এই নীতি অনুযায়ী

কোনো একটি ঘটনার দুই বা ততোধিক পর্যাপ্ত কারণ থাকতে পারে না, যারা একই সময়ে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে যদি ভৌত ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হয় তাহলে অন্য কোনো (অ-ভৌত) ধরনের ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব নয়। এই নীতিই প্রকৃতপক্ষে কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণ বা causal overdetermination-কে প্রতিহত করে।

বিজ্ঞান এই নীতিগুলি অনুসরণ করেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। এখন, প্রশ্ন হল সার্ল যে ব্যক্তিনিষ্ঠ পর্যাবসানহীন চেতন ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তার স্বতন্ত্র কারণিক ক্ষমতা কি তিনি দেখাতে পারবেন? মানস দশা বা চেতন দশার স্বতন্ত্র কারণিক ক্ষমতা দেখাতে গেলে অতিনিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে কীভাবে এড়ানো সম্ভব হবে? সার্ল লক্ষ্য করেছেন যে, কার্তেসীয় দর্শনে দৈহিক দশা ও মানস দশাকে যেভাবে বোঝা হয়েছিল, আধুনিক দর্শন তথা বিজ্ঞানের জগত সেই চিন্তাধারাকেই বহন করে চলেছে। মনোদর্শনে স্বীকৃত দেহ-মনের এই দ্বিকোটিক বিভাজনের পাশাপাশি বিজ্ঞান যে দুটি নীতি মেনে চলে— কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি ও পরিবর্জনের নীতি, তাদের সঙ্গে মানস কারণতার চিন্তাটি একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই নীতিগুলিকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে নিয়ে ভৌত জগতের যেকোনো ঘটনাকেই কিন্তু বিজ্ঞান সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু মানস ঘটনার কোনো কারণিক ভূমিকা দেখাতে গেলেই আর এই নীতিগুলি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক হিসেবে সার্ল কারণিক আবদ্ধায়ন এবং পরিবর্জনের নীতিকে রক্ষা করারই পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি মনে করেন কার্তেসীয় দ্বিকোটিক বিভাজনের নীতিটির জন্যই মানস কারণতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। মনোদর্শনের জগতে মনকে ভৌত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র বলেই মনে করা হয়, এখানে মনোজগতকে কোনোভাবেই ভৌত জগতের অংশ হিসেবে ভাবা সম্ভব

হয় না। পরস্পর বিরোধী ধর্মের আধার হিসেবে চিহ্নিত মানস জগত সবসময়ই ভৌত জগতের অতিরিক্ত বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি অনুসারে বিজ্ঞান কোনোমতেই ভৌত ঘটনার অ-ভৌত কারণ স্বীকার করতে চাইবে না, বা কোনো ভৌত ঘটনার অ-ভৌত ব্যাখ্যাও মেনে নেবে না। একটি ভৌত ঘটনার একটি ভৌত কারণ আছে, আবার একটি অ-ভৌত কারণও আছে— পরিবর্জনের নীতি অনুসারে তাও বলা যাবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানস কারণতা কখনোই ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক নীতিগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ আছে তা সার্ল স্বীকার করেন, যদিও তাঁর মতে এটি প্রকৃত অসঙ্গতি নয়, আপাত অসঙ্গতি, যার সমাধান সম্ভব। আমরা আগেই দেখেছি যে, সার্ল একজন বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেই তিনি মন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। আবার, একইসঙ্গে সার্ল মানস জগতের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতেও ইচ্ছুক। মানস দশার এমন বৈশিষ্ট্য (যেমন- ব্যক্তিনিষ্ঠতা) তিনি স্বীকার করেন যা তার নিজ স্বীকৃতি মতেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। অর্থাৎ মানস জগতের জড় জগত অতিরিক্ততা তিনি মানতে চান, তার জন্য মানস জগতের স্বতন্ত্র কার্যকারিতা প্রমাণ করা আবশ্যিক। এই অভিপ্রায়েই সার্ল ঐ আপাত অসঙ্গতি নিরসনে উদ্যোগী হয়েছেন। সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলেই থাকতে চান তাই, বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। এই বৈজ্ঞানিক নীতিগুলির সঙ্গে যে বিষয়ের বিরোধ সেই কার্তেসীয় দেহ-মনের বিভাজনের চিন্তাকেই তিনি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। তাঁর মতে, দেহ-মনের এই বিভেদমূলক চিন্তাই সব সমস্যার জন্য দায়ী। দর্শনের জগতে দ্বৈতবাদ এবং

দ্বৈতবাদের বিরোধী মতের মধ্যে যে বিভাজন তাও প্রায় দ্বিকোটিক বিভাজনের মতোই— কোনো তত্ত্ব দ্বৈতবাদ হলে তা জড়বাদ নয়, আর জড়বাদ হলে তা দ্বৈতবাদ নয়। সার্ল এই চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটাতে চান। তাঁর মতে উভয় তত্ত্বের বিরুদ্ধেই অনেক অভিযোগ থাকলেও উভয়েরই কিছু ভালো দিক আছে, যা গ্রহণীয়। দ্বৈতবাদ সবসময়ই মানস দশার পর্যাবসানহীতায় (irreducibility) বিশ্বাসী। দ্বৈতবাদ অনুসারে মানস দশা কখনোই ভৌত দশায় পর্যবসিত হয় না। ফলে মানস দশা জড় জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয়। আবার জড়বাদীরা মানস দশাকে জড় জগতে বা ভৌত জগতে পর্যাবসানের কথাই বলেন, জড় অতিরিক্ত কোনো কিছুর অস্তিত্বই তাঁরা স্বীকার করেন না। সার্ল এই উভয় সিদ্ধান্তেরই বিরোধিতা করেন। তিনি এই দুই চরমপন্থী মতের মধ্যবর্তী একটি পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন— তিনি দাবী করেছেন যে চেতনা কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য হলেও সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য নয়। এটি সাধারণ জড় জগতেরই অংশ এবং কখনোই তার অতিরিক্ত কিছু নয় (Searle 2004, 127) অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কার্যকারণ সম্বন্ধকে বুঝতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ দুটি ভৌত জগতের ঘটনার মধ্যেই ঘটতে পারে, ভৌত জগতের অতিরিক্ত কোনো ঘটনার সঙ্গে ভৌত জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধ কখনোই বিজ্ঞানে স্বীকৃত নয়। আর একইসঙ্গে সার্ল দ্বৈতবাদীদের মতো, মানস দশার (চেতনার) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চেয়েছেন, চেতনা কেবলমাত্র স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা, তাছাড়া আর কিছুই নয়— একথা তিনি মানতে চাননি।

সার্ল বলছেন, চেতনা কারণিক দিক থেকে ভৌত জগতে অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যাবসানযোগ্য (reducible), তাহলে কি তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত চেতনার কোনো কারণিক ক্ষমতা স্বীকার করবেন? সার্ল এই প্রশ্নের নঞর্থক উত্তরই দেবেন। অর্থাৎ নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশার কারণিক ক্ষমতার থেকে ভিন্ন বা অতিরিক্ত কারণিক ক্ষমতা চেতনায় থাকতে পারে না। কারণিক ক্ষমতার বিচারে তারা দুটি স্বতন্ত্র বিষয় নয়। কারণিক ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতার নিরিখে চেতনা আর স্নায়ুতান্ত্রিক দশা অভিন্ন। "The fact that the causal powers of consciousness and the causal powers of its neural base are exactly the same shows that we are not talking about two independent things, consciousness and neuronal process." (Searle 2004, 127)

সার্লের এই কথা থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এমন কি হতে পারে যে, দুটি বস্তু আলাদা, অথচ তাদের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ অভিন্ন? এই প্রশ্নের সম্ভাবনা সার্লও অনুভব করেছিলেন। বাস্তব জগতে দুটি বস্তু পৃথক হলে, তাদের কার্যক্ষমতাও পৃথক হয়। কিন্তু সার্ল একথা মানতে চাইবেন না। তিনি তরলতার বা কাঠিন্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবেন যে, সব ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্বতন্ত্র হলেও তাদের কার্যক্ষমতা পৃথক হয় না। যেমন, জলের তরলতা তার H_2O আণবিক গঠনের অতিরিক্ত নয়। একটি পেশাই যন্ত্রের কাঠিন্য যেমন তার আণবিক আচরণের অতিরিক্ত নয়, তেমনি তরলতা বা কাঠিন্যের কার্যক্ষমতাও তাদের আণবিক গঠনের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত নয়। সার্লের মতে, চেতনার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধও জলের তরলতার সঙ্গে তার আণবিক আচরণের সম্বন্ধের মতো। কারণ তাঁর মতে, কাঠিন্য, তরলতা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে একটি বস্তুর উপরিতলের ধর্ম (surface feature) যা সম্পূর্ণভাবেই আণবিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সার্ল এক্ষেত্রে

প্রত্যেকটি বস্তুকে একেকটি তন্ত্র বা system হিসেবে গণ্য করেছেন, যাদের দুটি করে স্তর (level) আছে— একটি উচ্চস্তর (higher level) ও একটি নিম্নস্তর (lower level)। এই নিম্নস্তরের দ্বারা সর্বনিম্নস্তর বা আণবিক স্তরকে বোঝানো হয়ে থাকে, যা 'microlevel' নামে চিহ্নিত। অন্যদিকে উচ্চস্তরটিকে 'macrolevel' বা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট স্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়। জলের তরলতা উচ্চস্তরের ধর্ম আর H_2O-র পারমাণকি গঠন হল নিম্নস্তরের ধর্ম। সার্ল মনে করেন, নিম্নস্তর বা আণবিক স্তরের কারণিক ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো কারণিক ক্ষমতা উচ্চস্তরের থাকে না। সমগ্র তন্ত্রের কারণিক ক্ষমতা তার নিম্নস্তরীয় আণবিক ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই কারণেই সার্লের মতে, যে কোনো বস্তুর কারণিক ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের কার্যক্ষমতার ভিত্তিতেই নিরূপিত হয়, তাই প্রতিটি বস্তুই তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনে কারণিকভাবে পর্যাবসানযোগ্য (causally reducible) "...the causes at the level of the entire system are entirely accounted for, entirely causally reducible to, the causation of the microelements" (Searle 2004, 208)।

চেতনার ক্ষেত্রেও সার্ল একই কথা বলবেন। তাঁর মতে চেতনাও এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়। হাত তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর একজন ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে হাত তোলে, তখন তার হাত তোলার ঘটনাটি তার স্নায়ুর কার্যকারিতার ভিত্তিতেই ব্যাখ্যাত হতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো কারণ সেখানে থাকে বলে সার্ল মনে করেন না। বরং তিনি মনে করেন যে, এক্ষেত্রে হাত তোলার বিষয়টির পিছনে যে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি রয়েছে তাকে সামগ্রিক তন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার চেষ্টা হচ্ছে, আণবিক স্তরের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়। হাত তোলার

ঘটনাটিকেই দুভাবে বর্ণনা করা সম্ভব– একটি, হাত তোলার ইচ্ছা হল, তার জন্য হাত উঠল– এভাবে সামগ্রিক তন্ত্রের বিচারে; আবার, মস্তিষ্কের বিশেষ একটি স্নায়ু উদ্দীপিত হল, তার ভিত্তিতে মস্তিষ্কের বহিঃস্থ স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে হাতের পেশীতে পৌঁছোল এবং হাতের পেশীকে বিশেষভাবে সচল করে দিল যার ফলে হাত উপরে উঠল-- এটি স্নায়ুতান্ত্রিক বা নিম্নস্তরীয় বর্ণনা। সার্লের মতে এই দুটি বর্ণনা দুটি ভিন্ন কারণের বর্ণনা নয়, বরং একটি সমগ্র তন্ত্রের দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনামাত্র। তবে, এ প্রসঙ্গে সার্ল খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সব উপমার (analogy) মতো এক্ষেত্রেও কিছু অমিল আছে। তরলতা বা কাঠিন্যের সঙ্গে চেতনার তুলনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। কাঠিন্য আর চেতনার মধ্যে সাদৃশ্য হল তারা উভয়েই কারণিক দিক থেকে তাদের নিম্নস্তরীয় আণবিক অবস্থার কারণিক ক্ষমতায় পর্যাবসানযোগ্য। তবে, সার্লের মতে, জলের তরলতার মতো বা পেশাই যন্ত্রের কাঠিন্যের মতো চেতনা কিন্তু কখনোই তার আণবিক স্তরে সত্তাগত দিক থেকে (ontologically) পর্যাবসানযোগ্য নয়। সত্তাগতভাবে কাঠিন্য তার আণবিক গঠনের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, কিন্তু চেতনার সত্তাগত স্তরে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যবসিত করা যায় না। কিন্তু চেতনা সত্তাগতভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যবসিত না হলেই যে তা ভৌত জগতের অতিরিক্ত বিষয় হবে– এমন দ্বৈতবাদী চিন্তা থেকে সার্ল মুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সত্তাগত পর্যাবসানহীনতা কখনোই স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতাকে বোঝায় না।তাই চেতনার স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কার্যক্ষমতা নেই বলে, চেতনার স্বাতন্ত্র্যও প্রতিষ্ঠিত হল না– এই অভিযোগের সম্ভাবনা অনুমান করেই সার্ল বলতে চেয়েছেন যে, কার্যক্ষমতার সঙ্গে সত্তাগত জগতে স্বাতন্ত্র্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। কার্যক্ষমতা সবসময়ই আণবিক স্তর

দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ফলে, যে কোনো বস্তুর কার্যক্ষমতা সবসময়ই তার আণবিক স্তরে কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্যই হবে। ভৌতবাদীরা সেই কারণেই সব বস্তুকে ভৌত জগতে পর্যাবসানযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু, সার্ল মনে করেন, চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে এই জগতের অন্যান্য বস্তু থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity) চেতনার উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা (first personal perspective) প্রভৃতি কেবলমাত্র চেতনাতেই থাকে, অন্য কোনো বস্তুতে থাকে না, এবং এগুলিকে কোনোভাবেই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বা প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ (third person perspective) থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্লের মতে, চেতনার এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সত্তাগতস্তরে চেতনার পর্যাবসানহীনতা প্রমাণ করে।

সুতরাং, সার্লের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কারণিক অতি নিয়ন্ত্রণের (causal overdetermination) অভিযোগ তোলা সম্ভব নয় বলেই সার্ল মনে করেছেন। কারণ অতিনিয়ন্ত্রণের আপত্তি তখনই ওঠে যখন একটি কার্য একাধিক কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সহজকথায়, একটি কার্যের একাধিক কারণ স্বীকৃত হয়। যেমন, হাত তোলার ক্ষেত্রে স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার দ্বারা পেশী সঞ্চালন যেমন একটি কারণ, তেমনি ব্যক্তির সচেতন ইচ্ছাকেও একটি কারণ হিসেবে দ্বৈতবাদে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ একটি ঘটনার দুটি পর্যাপ্ত কারণ হয়ে যায়, যা বিজ্ঞান মানতে রাজী নয়। কিন্তু সার্লের তত্ত্বে এই সমস্যা আদৌ নেই কারণ, সার্ল চেতনা আর স্নায়বিক উত্তেজনাকে দুটি স্বতন্ত্র কারণ হিসেবে গণ্যই করেন না। তাঁর কাছে, এই দুটি ঘটনা শুধু অভিন্নই নয়, তারা একই তন্ত্রের দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনামাত্র। তাই তাঁর 'biological naturalism' অতিনিয়ন্ত্রণের সমস্যা থেকে মুক্ত বলে তিনি দাবী করেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে অতিনিয়ন্ত্রণের

আপত্তি না উঠলেও, উপবস্তুবাদের আপত্তি কি তিনি সত্যিই এড়াতে পারবেন? চেতন দশাকে কেবলমাত্র বর্ণনার একটি স্তর হিসেবে গণ্য করে কি সত্যিই চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন যে এই তত্ত্ব হবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

তথ্যপঞ্জী

1. Jackson, F. 2002. What Mary Didn't Know. In *The Nature of Consciousness : Philosophical Debates.* ed. Ned Block, O. Flanagen, G. Guzeldere. 567-570. Cambridge, MA : Bradford Book.
2. Kim, J. 1995. Mental Causation in 'Searle's Biological Naturalism'. *Philosophy and Phenomenological Research.* 55 (1) : 189-194.
3. Kim, J. 2006. Being Realistic about Emergence. in *The Re-Emergence of Emergence.* eds. P. Clayton and P. Davis. 189-202. Oxford : Oxford University Press.
4. Kripke, S. A. 1980. *Naming and Necessity.* Cambridge, MA : Harvard University Press.
5. Nagel, T. 1974. What Is It Like to Be a Bat?. *The Philosophical Review.* 83(4) : 435-450.
6. Nagel, T. 1986. *The View from Nowhere.* New York : Oxford University Press.
7. Searle, J. R. 2002. *The Rediscovery of the Mind.* Cambridge, MA : MIT Press.
8. Searle, J. R. 2003. *Minds Brains and Science.* Cambridge, MA : Harvard University Press.
9. Searle, J. R. 2004. *Mind : A Brief Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

তৃতীয় অধ্যায়

সার্লের তত্ত্বের সমালোচনা

সার্লের 'biological naturalism' তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, সার্ল দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানস দশাকে একটি জৈবিক প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বৈতবাদী ও ভৌতবাদী চিন্তার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন, যা অবশ্যই দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, সার্লের এই তত্ত্ব একইসঙ্গে কিছু প্রশ্নেরও সম্মুখীন হয়, সমালোচকরা সার্লের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন তুলে ধরেন। এই অধ্যায়ে আমরা সেগুলি নিয়েই আলোচনা করবো। একইসঙ্গে, সমালোচকদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সার্ল দিতে সক্ষম কিনা, তাও আমরা দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু সার্লের সমালোচকদের বক্তব্য আলোচনার আগে সার্লের তত্ত্বের মূল দাবীগুলি, বিশেষতঃ যে সব বিষয়ে সমালোচকরা আপত্তি করেছেন, সেগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক। সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে আগ্রহী, তাই তিনি মনে করেছেন যে, (১) মানস দশাগুলি মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এবং মস্তিষ্কেই তা অনুভূত হয়। মস্তিষ্ককে তিনি মানস দশার দৈশিক অবস্থানরূপে চিহ্নিত করেছেন। (২) মানস দশাগুলি সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য না হলেও, কারণগত দিক থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যাবসানযোগ্য। কারণগত দিক থেকে কাঠিন্য বা তরলতার

মতো ধর্মের সঙ্গে চেতনার কোনো পার্থক্য নেই। নিম্নস্তরীয় আণবিক স্তরের দ্বারা উভয়েই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। যদিও মানস দশার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা এই জগতের অন্য কোনো ঘটনার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে না বলে সার্ল মনে করেছেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি মানস দশার সত্তাগত পর্যাবসানকে রুদ্ধ করে। (৩) একইসঙ্গে সার্ল মানস দশার কারণিক ভূমিকাও স্বীকার করেন, অর্থাৎ একটি মানস দশা অন্য একটি মানস দশার, এমনকি কোনো একটি ভৌত দশারও জনক হতে পারে।

সার্ল চেতনাকে সত্তাগত দিক থেকে পর্যাবসানহীন দেখিয়ে চেতনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চান, আবার একইসঙ্গে চেতনাকে কারণিক দিক থেকে মস্তিষ্ক দশায় পর্যাবসানযোগ্য হিসেবে দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যও রক্ষা করতে চান। ভৌতবাদীদের মতো তিনি বলতে চান না যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত চেতনা বলে কিছুই নেই। স্নায়ুতান্ত্রিক দশা আর চেতনা অভিন্ন— এই মতবাদ থেকে তিনি নিজের তত্ত্বকে দূরে সরাতেই আগ্রহী। সেই কারণেই তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত চেতনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করারই চেষ্টা করেছেন। চেতনা সর্বৈবভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক দশা-- একথা তিনি মানবেন না। কিন্তু স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কোনো সত্তা স্বীকার করার অর্থ হল, ভৌত জগতের অতিরিক্ত কোনো সত্তা স্বীকার করা, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সার্ল চেতনার কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, চেতন মানস দশাগুলি মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্ক কাঠামোতে অনুভূত হয় ("realized in the structure of brain"- Searle 1983, 265)। এখন, সার্লের এই বক্তব্য থেকে মনে হয়, কোনোকিছুকে চেতন মানস দশা হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে মস্তিষ্কের গঠনের বর্ণনার

মাধ্যমেই তা করতে হবে। যেহেতু মস্তিষ্ক কাঠামোতেই তা অনুভূত হয়। আবার মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফলে যদি চেতন মানস দশার উৎপত্তি হয়, তাহলে একথাও মানতে হবে যে, মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন হলে, মানস দশার পরিবর্তন ঘটবে। ঠিক যেমন, কাঠিন্য বা তরলতার ক্ষেত্রে হয়। জলের যে আণবিক গঠনে জলকে তরল মনে হয়, সেই আণবিক গঠনের পার্থক্য হলেই হয়তো তা আর তরল থাকবে না, বরফ কিংবা বাষ্প হয়ে যাবে, যেহেতু, সব সময়ই উপরিতলের ধর্ম তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অ্যালেস্টার হ্যানে (Hannay 1991) সার্লের এই ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মনে করেননি। সার্ল স্নায়ুতান্ত্রিক দশাকে চেতন মানস দশার ক্ষেত্রে নিম্নস্তর (bottom level) বলে মনে করেছেন। পদার্থবিদ্যায় যাকে মৌলিক আণবিক স্তর বলে, চেতন মানস দশার ক্ষেত্রে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থাকেও সার্ল তাই মনে করেছেন। হ্যানে (Hannay) মনে করেন যে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন কাঠামোকেও তার স্নায়ুতন্ত্রের নিরিখে উচ্চস্তর (higher level) হিসেবে গণ্য করা যায়। ফলে, এক্ষেত্রে সার্ল উপরিতল (surface level) এবং আণবিক স্তরকে একত্রিত করেই 'নিম্নস্তর' রূপে গণ্য করেছেন। যদিও হ্যানের মতে, উপরিতল (surface level) ও সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর স্তরের (sub atomic level) মধ্যবর্তী আরো অনেক স্তর আছে। সার্ল যেভাবে আণবিক স্তরের দ্বারা উপরিতলের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা হ্যানের (Hannay) মতে কখনোই পদার্থবিজ্ঞানসম্মত হয়নি। কোনো একটি বস্তুর উপরিতলের পরিবর্তন তার কাঠামোগত স্তরের (structural level) পরিবর্তনের দ্বারা সাধিত হয়। এই কাঠামোগত স্তরটি আবার আণবিক স্তরের দ্বারা গঠিত, ফলে তাদের তুলনায় উচ্চস্তর। একথা অনস্বীকার্য যে, এই আণবিক স্তরের

গঠনগত ভূমিকা আছে। এই স্তরটি ঐ কাঠামোগত স্তরকে (structural level) ধরে রাখে। এই কাঠামোগত স্তরের পরিবর্তন হলেই উপরিতলের (surface level) পরিবর্তন হয়। ফলে, হ্যানে মনে করেন, সার্ল যখন বলেন যে, উপরিতলের দশা নিম্নস্তরীয় আণবিক দশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তিনি ঠিক কথা বলেন না, কারণ উপরিতলের দশা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তর অর্থাৎ কাঠামোগত স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (Hanney 1991)।

সার্ল অবশ্য এই আপত্তির উত্তর দিতে সক্ষম। সার্ল আর হ্যানে 'নিম্নস্তর' শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন। হ্যানে 'নিম্নস্তর' বলতে 'নিম্নতম' স্তরকে বুঝেছেন যদিও সার্ল উপরিতলের নিচে থাকা যে কোনো স্তরকেই বুঝেছেন। হ্যানে মনে করেছেন যে, সার্ল যেভাবে নিম্নস্তরের (আণবিক স্তরের) কারণিক ক্ষমতার ভিত্তিতে উপরিতলের কারণিক ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তা বিজ্ঞানানুসারী নয়। কারণ উপরিতলের কারণিক ক্ষমতা তার নিম্নতর (নিকটবর্তী) স্তরের অর্থাৎ কাঠামোগত স্তরের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়, আণবিক স্তরের দ্বারা নয়। কিন্তু সার্ল নিম্নস্তরকে অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন, ফলে, নিম্নস্তরের যে কোনো একটি স্তরের পরিবর্তনই উপরিতলের (surface) পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই নিম্নস্তর ও উচ্চস্তরের কারণিক সম্বন্ধকে সার্ল ব্যাখ্যা করতে পারেননি বললে তা সঠিক অভিযোগ হবে না।

আবার, ইউজিম ব্রুকস (Eugene M. Brooks) মনে করেন যে, উপরিতলের সঙ্গে আণবিক স্তরের সম্বন্ধকে সার্ল যেভাবে কারণতার সম্বন্ধ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, তা সঠিক হয়নি। ব্রুকসের মতে, কেবলমাত্র অণু-পরমাণু সংযুক্ত হলেই নতুন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, যেকোনো বস্তুর উৎপত্তির ক্ষেত্রেই শক্তির (energye) একটি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা থাকে। একটি জলের অণু (H_2O) গঠনের জন্য কেবলমাত্র অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণুর উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, উত্তাপের উপস্থিতিও আবশ্যিক। উত্তাপের জন্যই অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু সংযুক্ত হয়ে জলে রূপান্তরিত হয়। যেকোনো পদার্থ তা কঠিন হোক বা তরল, বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে সৃষ্ট হলেও কোনো না কোনো শক্তির ভূমিকা সেখানে আবশ্যিক। তাই ব্রুকস মনে করেন, ঐ পরমাণুগুলিকে উৎপন্ন দ্রব্যের কারণরূপে গণ্য না করে, উপাদান হিসেবে গণ্য করা উচিত। যেহেতু তাঁর মতে শক্তিই মূল কারণিক ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই ব্রুকস মনে করেন যে, কোনো একটি বস্তু যে পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমাণুগুলির সঙ্গে ঐ বস্তুর সম্বন্ধকে কারণিক সম্বন্ধ হিসেবে না দেখে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ (identity relation) হিসেবে দেখা উচিত (Brooks 2007)।

সার্ল চেতনাকে এই জগতের অন্যান্য বস্তুদের মতো সাধারণ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক (natural) বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই এই জগতের অন্যান্য বস্তুর ব্যাখ্যা যেমন অণু-পরমাণু, শক্তি, শক্তিক্ষেত্রের (field of force) সাহায্যে দেওয়া হয়, তেমনি চেতনাকেও এগুলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, কাঠিন্য বা তরলতা যেমন জড়বস্তুর উপরিতলের ধর্ম, যা কেবলমাত্র তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ অণু-পরমাণুর গঠনের মাধ্যমেই তারা উৎপন্ন হয় এবং ঐ ভৌততন্ত্রেই ঐ ধর্মগুলি অনুভূত হয়, চেতনাও ঠিক একইভাবে তার নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার থেকে উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্কেই অনুভূত (realized) হয়। কাঠিন্য যেমন সূক্ষ্ম আণবিক স্তর দ্বারা গঠিত ভৌততন্ত্রের মহৎ রূপ (macro feature), ঠিক তেমনি চেতনাও ভৌততন্ত্রের মহৎরূপ। চেতনাকে কাঠিন্য বা তরলতার সঙ্গে তুলনা

করে সার্ল বোঝাতে চেয়েছেন যে, চেতনাও ততটাই ভৌত জগতের অংশ যতখানি ঐ ধর্মগুলি। অনেক সমালোচক সার্লের এই উপমাকে সঠিক বলে মনে করেননি। যেমন, ড্যানিয়াল ডি. নভোতনি (Danel D. Navotony) মনে করেছেন যে, কাঠিন্য বা তরলতার ক্ষেত্রে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, অ-কঠিন অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত তন্ত্রের থেকে কীভাবে কাঠিন্য ধর্মটি উৎপন্ন হয়েছে বা কীভাবে ভৌতবস্তুরূপে তা অনুভূত হয়। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে তা বোঝা অত সহজ হয় না। ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতন মানস দশা কীভাবে ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা থেকে উৎপন্ন হতে পারে বা ভৌত স্নায়ুতন্ত্রে (মস্তিষ্কে) তা অনুভূত হতে পারে তা বোঝা যায় না (Novotny 2007)।

নভোতনি (Novotny) আরো মনে করেন যে, কাঠিন্য বা তরলতাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, চেতনাকে সেভাবে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। কাঠিন্যকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বলবে, যখন অণু-পরমাণুর মধ্যে দূরত্ব কম থাকে, পরমাণুগুলি যখন একে অন্যের সঙ্গে দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়ে থাকে, তখন ঐ আণবিক গঠনকে কাঠিন্য ধর্মযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যদিকে, তরলতার ক্ষেত্রে অণু-পরমাণুগুলি দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়ে থাকে না। কিন্তু চেতনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যাবে না। কারণ অণু-পরমাণুর দূরত্ব বা শক্তির উপস্থিতির সাহায্যে ব্যাক্তিনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্ল অবশ্য আশা করেছেন যে, অনাগত বিজ্ঞান নিশ্চয়ই একদিন এই ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবে। অণু-পরমাণুর গঠনের সাহায্যে, শক্তির মাধ্যমে যেভাবে ভৌত জগতের সব বিষয়কে পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারছে, ব্যক্তিনিষ্ঠ চেতনাকেও সেভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারবে। কিন্তু নভোতনি (Novotny) মনে করেছেন যে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মবিশিষ্টরূপে চেতনা বিজ্ঞান বর্ণিত

জগতের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কাঠিন্য বা সালোকসংশ্লেষকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, চেতনাকে অবশ্যই সেভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ("We may conclude that conscious minds with their subjective ontology do not fit into the ontology of our contemporary physical and biological sciences — certainly not in the way that solidity and photosynthesis do" (Novotny 2007, 44)

আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি যে, সার্ল চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ভৌত স্তর থেকে মানস দশার উৎপত্তি বোঝানোর প্রসঙ্গে তিনি দুটি স্তরের কথা বলেছেন— উচ্চস্তর এবং নিম্নস্তর। মানস দশা প্রসঙ্গে নিম্নস্তর বলতে তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশাকে (neurological state) বুঝেছেন, অন্যদিকে উচ্চস্তর বলতে তিনি ব্যক্তিনিষ্ঠতাযুক্ত মানস দশাকে বুঝিয়েছেন। একইসঙ্গে সার্ল উভয়স্তরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। সার্লের এই চিন্তার বিরুদ্ধে ওয়াল্টার জে. ফ্রিম্যান (Walter J. Freeman) ও ক্রিস্টিন এ. স্কারদা (Christine A. Skarda) আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে, সার্ল যেভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক দশার দুটি ভিন্ন স্তরের বর্ণনার মাধ্যমে ভৌত দশা ও মানস দশার সম্বন্ধকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা সঠিক হয়নি। তাঁরা বলেন, সার্ল সার্বিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি, বরং সার্বিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং মানস স্তরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আরো অভিযোগ করেন যে, যদিও সার্ল কারণতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেভাবে দুটি স্তরের কার্যকারিতা বা কারণিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন, তা আদৌ ভৌত ব্যাখ্যা নয়, বরং তা মানস স্তরের ব্যাখ্যা বলেই তাঁরা মনে করেছেন (Freeman & Skarda 1991)। সার্ল বিশ্বাস করেন যে, মানস দশাগুলি স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্ক দশায় অনুভূত হয় এবং

সেই মস্তিষ্ক দশার উচ্চস্তরীয় ধর্ম রূপে তিনি ঐ মানস দশাকে গণ্য করেছেন। ফ্রিম্যান ও স্কারদা প্রশ্ন তুলেছেন যে, সার্ল যখন বলছেন যে, মানস দশা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে উৎপন্ন হয়, তখন কি তিনি প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অন্য আরেকটি ভৌত দশার কথা বলছেন, যাকে পরবর্তীকালে মানস বিধেয়র (mental term) সাহায্যে বর্ণনার কথা বলেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে, নিম্নস্তরীয় ভৌত দশা থেকে একটি উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশা উৎপন্ন হয়, যার দুটি বর্ণনা হয়,— একটি ভৌত, অন্যটি মানস। তাহলে তাঁদের মতে যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তা হল, একটি উচ্চস্তরীয় ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক দশাকে মানস বর্ণনাযুক্ত বলে মনে করার কারণ কী? স্নায়ুতান্ত্রিক দশার মানস বর্ণনা দেবার প্রয়োজনই বা কী? তিনি মনে করেন, উচ্চস্তরীয় দশার একটি বর্ণনাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য বর্ণনাতে নেই। সার্লের মতে, উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশাকেই মানস বর্ণনায় ভূষিত করা সম্ভব, নিম্নস্তরীয় ভৌত দশাকে (micro level) তা করা যাবে না, তার ক্ষেত্রে শুধু ভৌত বর্ণনাই দেওয়া সম্ভব। ফ্রিম্যান ও স্কারদা অভিযোগ করেছেন যে, সার্ল তাঁর এই মতের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেননি। তাঁরা আরো মনে করেছেন, নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে আবার উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশা উৎপন্ন হবার সম্ভাবনাও যে থাকতে পারে— সে বিষয়ে সম্ভবতঃ সার্ল ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তাঁরা মনে করেছেন যে, চেতনা প্রসঙ্গে সার্ল প্রকৃত স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা আরো অনুমান করেছেন যে, সার্ল উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশার ক্ষেত্রে যে মানস বর্ণনার কথা বলেছেন, তার কারণ সম্ভবতঃ উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সবসময়ই লক্ষ্যাভিমুখিনতা (goal-directed

behavior) থাকে, যাকে সার্ল বিষয়মুখিনতার সঙ্গে ভুল করেছেন (Freeman & Skarda 1991)।

ফ্রিম্যান এবং স্কারদা আরো অভিযোগ করেছেন যে, সার্ল যেভাবে উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশা (neuronal macro level) ও নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশার (neuronal micro level) মধ্যে পার্থক্য করেছেন তা দেহ-মনের দ্বৈতবাদী চিন্তার তির্যক প্রকাশ বলেই মনে হয়। যদি উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশাই কেবলমাত্র মানস বর্ণনাযোগ্য হয় তাহলে তাকে মানস দশা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। উপরন্তু, সার্ল ঐ উচ্চস্তরীয় দশার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা যখন স্বীকার করেন, এবং তাকে সত্তাগতভাবে পর্যাবসানহীনরূপেও গণ্য করেন, তখন দ্বৈতবাদের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে যে উঠবেই, তা বলাই বাহুল্য (Freeman & Skarda 1991)।

সার্ল অবশ্য এই আপত্তির উত্তরে বলতে পারেন যে, তিনি কখনোই উচ্চস্তরীয় দশাকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত দশারূপে গণ্য করেননি। তিনি নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশারই দুটি বর্ণনার কথা বলেছেন— একটি ভৌত বর্ণনা ও একটি মানস বর্ণনা। তিনি বারবার বলেছেন যে তাঁর মতে, মানস দশা কখনোই স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাই তাঁর বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদের আপত্তি অন্যায্য।

ফ্রিম্যান এবং স্কারদাও সার্লের এই আপত্তির বিরুদ্ধে বলতে চান যে, সার্ল যদি চেতনাকে উচ্চস্তরীয় ঘটনা হিসেবেই গণ্য করেন এবং দাবী করেন যে, চেতনা মস্তিষ্ক দশা ভিন্ন কিছুই নয় অথচ মস্তিষ্ক দশা থেকেই চেতনা উৎপত্তি লাভ করে, তাহলে তাঁর এইসব দাবী থেকে অসঙ্গতির সৃষ্টি হবেই। যদি একই স্নায়ুতান্ত্রিক দশার দুটি ভিন্ন

স্তরীয় বর্ণনা স্বীকার করা হয় তাহলে, একটি স্তর অন্য স্তরকে সৃষ্টি করছে— একথাটি অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ কোনো একটি বস্তু তার নিজের কারণ হতে পারে না। কারণ ও কার্য সবসময়ই দুটি ভিন্ন বস্তু হয়, এক্ষেত্রে তো কেবলমাত্র একটিই বিষয় উপস্থিত— একটি মস্তিষ্ক দশা। তাই তাঁরা এ প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা ও স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করাই সম্ভব নয়, যেহেতু এদের মধ্যে কোনো কারণিক বিধি প্রণয়ন করাই সম্ভব নয় (Freeman & Skarda 1991)।

সার্ল অবশ্য এর উত্তরে বলেছেন যে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্নায়ুতান্ত্রিক স্তর ও মানস স্তরকে কোনো দৃঢ় (strict) নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না, কিন্তু তার থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয় যে, স্নায়ুতান্ত্রিক স্তর ও মানস স্তরের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধই নেই। দৃঢ় কারণিক নিয়মের ভিত্তিতে একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের অনুমান সম্ভব হয়। মানস ও স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরের মধ্যে তেমন কোনো দৃঢ় নিয়ম না থাকলেও তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতেই পারে বলে সার্ল মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সামাজিক বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, যদিও সামজিক বিপ্লবের মতো ঘটনাকে কোনো দৃঢ় নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু সেই কারণে নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না যে, সামাজিক বিপ্লব অকারণেই ঘটে। ঠিক একইভাবে, মানস ও স্নায়ুতান্ত্রিক দশার মধ্যে কোনো দৃঢ় নিয়ম না থাকলেও তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা অসঙ্গত হবে না বলেই সার্ল মনে করেছেন।

এখন, সার্লের এই বক্তব্য বা ব্যাখ্যা তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ বা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনাসাপেক্ষ। সার্ল স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দুধরনের বর্ণনার কথা বলেছেন। নিম্নস্তরকে স্নায়ুতান্ত্রিক ভৌতস্তর বলেছেন আর উচ্চস্তরকে মানসস্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেন তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উচ্চস্তরীয় বর্ণনা আছে বলে মনে করলেন এবং সেই বর্ণনা কেন মানস বর্ণনাই হবে, তা পরিষ্কার নয়। স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরকে তিনি মানস স্তরের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন অর্থাৎ তাঁর মতে, নিম্নস্তর হল উচ্চস্তরের কারণ। কিন্তু উচ্চস্তরের কারণ হিসেবে নিম্নস্তরকে চিহ্নিত করার আগে, দেখানো প্রয়োজন যে কেন মানস বর্ণনা কেবলমাত্র উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করবে, বা কেন উচ্চস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সার্লের বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনি এই চিন্তাকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কোনো যুক্তি প্রদানের চেষ্টা করেননি। বিনা প্রমাণেই তিনি নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরকে উচ্চস্তরের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনো কারণও যে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, সে সম্ভাবনাও তিনি ভেবে দেখেননি।

সার্লের 'biological naturalism'-এর অন্যতম আরেকটি দাবী হল,— মানস দশাগুলি কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য হলেও, সত্তাগত দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য নয়। সার্লের এই দাবী নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সার্ল বিভিন্ন ধরনের পর্যাবসানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং আমরা দেখেছি যে তিনি মন বা চেতনা বিষয়ক আলোচনার জন্য সত্তাগত পর্যাবসানকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কারণিক পর্যাবসানের ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, "... phenomena of type A are causally reducible to phenomena of type B, if and only if the behavior of A's is entirely causally

explained by the behavior of B's, and A's have no causal powers in addition to the powers of B's." (Searle 2004, 119)। অর্থাৎ দুধরনের বস্তুর কারণিক ক্ষমতা যদি এমন হয় যে, একধরনের বস্তুর আচরণকে অন্যধরনের বস্তুর (আচরণের দ্বারা বা তার) কারণিক ক্ষমতার (causal power) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তাহলেই বলা যাবে যে, প্রথম জাতীয় বস্তু দ্বিতীয় ধরনের বস্তুতে কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য (causally reducible) যেমন, কোনো একটি টেবিলের কাঠিন্য তার আণবিক গঠনে কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য। কাঠিন্যের কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন, তার অভেদ্যতা, অন্যবস্তুকে ধারণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি সবগুলিই ঐ বস্তুর আণবিক আচরণের (molecular behavior) দ্বারা বা আণবিক গঠনের কারণিক ক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। অন্যদিকে, সত্তাগত পর্যাবসানকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "Phenomena of type A are ontologically reducible to phenomena of type B if and only if A's are nothing but B's." (Searle 2004, 119)। অর্থাৎ, সার্লের মতে, কোনো একধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে যদি দেখানো সম্ভব হয় যে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অন্য একধরনের বস্তু এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়, তাহলেই বলা যায় যে, প্রথম ধরনের বস্তুগুলি দ্বিতীয় ধরনের বস্তুতে সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য। যেমন, কোনো একটি জড়বস্তুর ক্ষেত্রে বলাই যায় যে, তা প্রকৃতপক্ষে তার আণবিক সংগঠনের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।

এখন সার্ল যখন বলেন যে, চেতনা কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য হলেও সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য নয়, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে বিশ্বাস করেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু নয়, চেতনার কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু তিনি

যন্ত্রণার মতো মানস অনুভবের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যন্ত্রণাকে 'সি-তন্তুর' উত্তেজনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও, অনুভবকারী ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভবের (feel) বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনের বিখ্যাত প্রবন্ধ "What Mary Didn't Know" (Jackson 2002) এর উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, এখানে একজন ব্যক্তি স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করলেও মানস দশার ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভব সম্বন্ধে অজ্ঞ হতে পারেন। অর্থাৎ মানস দশার ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভবকে কোনোভাবেই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই সার্ল সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যেহেতু চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভবকে বস্তুনিষ্ঠ স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায় না, সুতরাং সত্তাগত দিক থেকে চেতনার পর্যাবসানহীনতা (irreducibility) অবশ্য স্বীকার্য। নভোতনি (Novotny) সার্লের এই চিন্তাকে ভৌতবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেছেন (Novotny 2007)। ভৌতবাদ দাবী করে যে, এই জগত জড়কণা দ্বারা গঠিত, আধুনিক ভৌতবাদ অবশ্যই তার সঙ্গে কিছু শক্তি বা শক্তিক্ষেত্রের (field of force) অস্তিত্বও স্বীকার করে। কিন্তু তার অতিরিক্ত এমন কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, যা জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। ফলে, সার্ল যখন বলেন চেতনা সত্তাগতভাবে পর্যাবসানহীন, তখন তাঁর এই বক্তব্য নভোতনির মতে, ভৌতবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে যায় (Novotny 2007)। তবে এ প্রসঙ্গে সার্লের সপক্ষে বলা যায় যে, সার্ল যখন চেতনার সত্তাগত পর্যাবসানহীনতার কথা বলেছেন তখন কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, "... when I speak of the irreducibility of consciousness, I am speaking of its irreducibility according to standard patterns of reduction." (Searle 2002a, 124) অবশ্য, যদিও সার্ল মনে করেন যে, এই মুহূর্তে

আমাদের কাছে যতখানি তথ্য উপস্থিত এবং পর্যাবসানের যে ধারণা নিয়ে আমরা চলছি, তাতে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসানহীনতার কথাই বলতে হয়, কিন্তু, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এমন একদিন আসতেই পারে, এমন কোনো আবিষ্কার হতেই পারে, অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না যেখানে চেতনার জড় জগতে পর্যাবসান প্রতিষ্ঠিত হবে। সার্লের কথায়,— "No one can rule out apriori the possibility of a major intellectual revolution that would give us a new — and at present unimaginable — conception of reduction, according to which consciousness would be reducible." (Searle 2002a, 124)।

সার্লের এই বক্তব্য থেকে নভোতনির মনে হয়েছে যে, সার্লের বোধহয় শাব্দিক (terminological) ভ্রান্তি ঘটেছে। নভোতনির যুক্তি হল, সার্ল যখন দাবী করেছেন যে, বর্তমানে আমরা না জানতে পারলেও ভবিষ্যতে হয়তো জানতে পারবো, তখন সার্ল নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, চেতনার যে পর্যাবসানের কথা তিনি বলছেন তা সত্তাগত পর্যাবসান নয় বরং জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যাবসান। যদি ভবিষ্যতে জানা যায় যে, চেতনা সত্তাগতস্তরে প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত বিষয় নয়, তাহলে মানতে হবে যে, আজও চেতনা একইভাবেই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যাবসানযোগ্য, কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে তা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে থাকার কারণে, আমরা তা জানতে পারছি না। সুতরাং, এটি অবশ্যই জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতের সীমাবদ্ধতা, সত্তাগত স্তরের বিষয় নয়। নভোতনি (Novotny) তাই মনে করেছেন যে, সার্ল এক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সত্তাগত পর্যাবসানের মধ্যে শাব্দিক দিক থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন (Novotny 2007, 49)।

সার্ল তাঁর তত্ত্বে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসানকে মানতে চাননি কারণ তিনি চেতনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি চেতনার কারণিক পর্যাবাসনের উপর জোর দিয়েছেন। চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার না করার অর্থ হল সত্তার স্তরে জড় অতিরিক্ত মানস জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল দ্বৈতবাদ স্বীকার করে নেওয়া। এই দ্বৈতবাদের অভিযোগকে এড়ানোর জন্যই সম্ভবতঃ সার্ল কারণিক পর্যাবসানের উপর জোর দিয়েছিলেন, যদিও সেই প্রচেষ্টায় তিনি সফল হয়েছেন কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। সার্লের অনেক সমালোচকই সার্লের বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের (property dualism) আপত্তি করেছেন। সাধারণভাবে ধর্মদ্বৈতবাদ সত্তার স্তরে এমন একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যেগুলি সত্তাগত দিক থেকে কোনোভাবেই একে অন্যেতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। কিন্তু সে আলোচনায় যাওয়ার আগে, সার্লের বিরুদ্ধে তার সমালোচকদের বক্তব্যগুলি আগে দেখে নেওয়া যাক।

ইউজিন এম ব্রুকস তাঁর "The Identity Theory and the Refutation of Searle's Major Objections" (2007) প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন, যে, সার্ল যদিও কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করে দ্বৈতবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন, কিন্তু ব্রুকসের মতে, সার্লের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সার্ল মনে করেছেন, নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে মানস দশার উদ্ভব হয়। কার্যকারিতার দিক থেকে মানস দশা তাই স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কিছুই নয়, তা স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় কারণিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পর্যাবসানযোগ্য। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, যদি মানস দশা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে সত্তাগত স্তরে তার স্বাতন্ত্র্য কীভাবে থাকতে পারে? সার্ল মনে করেছেন যে,

স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে উৎপন্ন হলেও চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব সেখানে হয় যেমন, বিষয়ীনিষ্ঠতা (subjectivity), বিষয়মুখিনতা (intentionality) প্রভৃতি, যা স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সার্লের মতে মানস দশার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ব্রুকস প্রশ্ন তুলেছেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে উৎপন্ন বলে স্বীকার করে সার্ল মানস দশাকে অভৌত দশা বলে কীভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন, তা বোঝা যায় না। উচ্চস্তরীয় দশা কেন ভৌত জগত থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও অভৌত হবে, তা সার্ল স্পষ্টভাবে বলেননি। ভৌত জগতের অতিরিক্ত বা ভৌত জগত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানস দশা ও স্নায়ুতান্ত্রিক দশার মধ্যে সার্ল কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে, দুটি ভৌতবস্তুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকৃত। একটি ভৌত এবং একটি অভৌত বস্তুর মধ্যে কীভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা নিয়ে ব্রুকস সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সার্লকে যদি স্নায়ুতান্ত্রিক দশা ও মানস দশার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে তাঁকে মানস দশার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করতে হবে, আর যদি তিনি মানস দশার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করতে না চান, তাহলে ব্রুকসের মতে, কেবলমাত্র কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করে তিনি ধর্মদ্বৈতবাদের অভিযোগ এড়াতে পারবেন না।

কে. করকোরানও (Corcoran) মনে করেছেন যে, সার্লের পক্ষে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তিকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সার্ল চেতনাকে একইসঙ্গে বিষয়ীনিষ্ঠ (subjective) বলেও মনে করেছেন আবার, মস্তিষ্কের জৈবিক ধর্ম বলেও দাবী করেছেন; জৈবিক ধর্ম হিসেবে চেতনার একটি দৈশিক অবস্থান আছে, তা মস্তিষ্কে অস্তিত্ববান। আর এই

কারণেই তা প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য, কিন্তু, অন্যদিকে বিষয়ীনিষ্ঠ চেতনা কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তির উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জ্ঞাত হতে পারে। চেতনার এই দুধরনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একই চেতনা বিষয়ীনিষ্ঠও বটে আবার জৈবিকও বটে। একদিক থেকে যা কেবলমাত্র উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য, অন্যদিক থেকে তা আবার বস্তুনিষ্ঠ, প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষণযোগ্য। সার্ল খুব সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে, চেতনা হল মস্তিষ্কের ধর্ম ("Consciousness is the feature of the brain", Searle 2004, 115)। আবার তিনি অন্য জায়গায় বলছেন যে, চেতনা কিন্তু পর্যাবসানহীন মানস ধর্ম ("When we come to consciousness, we cannot perform the ontological reduction", Searle 2002a, 116) করকোরানের মতে, এই দুটি দাবী তো একসঙ্গে সত্য হতে পারে না, যদি না তিনি দ্বৈতবাদ মেনে নেন। সার্ল কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যে, কেন চেতনা দৈশিক অবস্থানযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সর্বৈবভাবে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যবেক্ষণলব্ধ নয়। সার্ল এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই বলবেন যে, যেহেতু চেতনার বিষয়মুখিনতা (intentionality) ও বিষয়ীনিষ্ঠতার (subjectivity) মতো ধর্ম আছে, তাই তা কখনোই সম্পূর্ণভাবে প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জ্ঞাত হতে পারে না। করকোরানের মতে, সার্ল একদিকে বলছেন, 'চেতনা হল পর্যাবসানহীন মানস ধর্ম' আবার অন্যদিকে বলছেন, 'চেতনা হল জৈবিক ধর্ম (অর্থাৎ ভৌত ধর্ম)' — এই দুটি দাবী একমাত্র তখনই সহাবস্থানে আসতে পারে, যদি তিনি দ্বৈতবাদ মেনে নেন। করকোরান সার্লের মন বিষয়ক তত্ত্বকে 'biological property dualism' হিসেবে গণ্য করাই সঠিক হবে বলে মনে করেছেন (Corcoran 2001)।

করকোরান অভিযোগ করেছেন যে, যদিও সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র আধিবিদ্যক সত্তা আছে বলে দাবী করেন, কিন্তু চেতনার আধিবিদ্যক স্তরে বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন না। *The Rediscovery of the Mind* গ্রন্থে তিনি চেতনা প্রসঙ্গে বলছেন যে "It has no deep metaphysical consequences" (Searle 2002a, 122) কারণ তাঁর মতে, "... consciousness is not part of the ultimate furniture of reality" (Searle 2002a, 122)। সার্ল খুব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, "... the irreducibility of consciousness is a trivial consequence of the pragmatics of our definitional practices.' (Searle 2002a, 122)। এখন করকোরান প্রশ্ন তুলেছেন যে, সার্ল যদি চেতনাকে কেবলমাত্র ভাষার জগতেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন, তাহলে চেতনার পর্যাবসানহীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এত আগ্রহের কারণ কী? করকোরানের মতে, সার্লের তত্ত্ব থেকে মনে হয় যে, সার্ল চেতনাকে এই জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ববান বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সত্তাগতভাবে ভৌতস্তরে তাকে পর্যাবসানহীন বলে মনে করেছেন। তিনি চেতনাকে বিষয়ীনিষ্ঠ পর্যাবসানহীন সত্তা হিসেবে যে দাবী করেছেন, সে প্রসঙ্গে করকোরান মনে করেছেন, "The claim losses all its punch as a claim about our lexical practices" (Corcoran 2001, 317)।

সার্ল পরবর্তীকালে যদিও এই সমালোচনার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। *Mind* (searle 2004) গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে, তাঁর সমালোচকদের তাঁকে বুঝতে ভুল হয়েছে। তিনি কখনোই চেতনাকে 'trivial consequence of definitional practices' বলতে চাননি। তিনি রঙের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, রঙের দুধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) রঙকে আলোর বিচ্ছুরণের মাত্রার ভিত্তিতে

ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা একটি বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা হিসেবে গৃহীত হয়। এবং অন্যটি হল (২) ঐ রঙটি চেতন অভিজ্ঞতায় যেভাবে গৃহীত হয়। এটি অবশ্যই বিষয়ীনিষ্ঠ (subjective) ব্যাখ্যা। বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা মাত্রই প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গৃহীত এবং অন্যদিকে বিষয়ীনিষ্ঠ বা ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) ব্যাখ্যা সবসময়ই উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে। এখন, সার্ল মনে করেন যে, রঙের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রাপ্ত বস্তুনিষ্ঠ বাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারি এবং তা আমরা অনেক সময় করেও থাকি। কিন্তু বেদনার (pain) মতো চেতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম হয়ে যায়। কারণ, সার্লের মতে, রঙের ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব না দিলেও চলে, কিন্তু বেদনার মতো চেতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তা করা যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে চেতনার মূল বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে যায়। সার্ল খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, কারণগত বা উৎপত্তিগত দিক থেকে রঙ আর বেদনার মধ্যে বিশেষ কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। রঙ যেমন আলোর বিচ্ছুরণের ফল, বেদনাও তেমনি স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ফল। রঙের কারণের সঙ্গে রঙ যে সম্বন্ধে আবদ্ধ, বেদনার ক্ষেত্রে বেদনাও তার কারণের সঙ্গে একই সম্বন্ধে যুক্ত। কিন্তু সার্ল মনে করেছেন যে, আমাদের ভাষাগত প্রয়োগের দিক থেকে রঙ ও বেদনার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। রঙের ক্ষেত্রে, রঙের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়ে কাজ হতে পারে, কিন্তু বেদনার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভবটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বেদনার সম্বন্ধে কথা বলার ক্ষেত্রে বা বেদনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, তার অনুভবটির উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, যা রঙের ক্ষেত্রে হয় না। সার্লের কথায় "For the definition of 'pain' we care more about how pains feel to us than we do for the definition of 'color" (Searle 2004, 122)।

সার্ল চেতনার সঙ্গে উত্তাপের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে উত্তাপ ও চেতনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু চেতন দশার ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবের বিষয়টি চেতন দশাকে উত্তাপ বা রঙের থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। করকোরানের মতে, উত্তাপের পর্যাবসানকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, এমন ভাবা কখনোই উচিত হবে না যে, উত্তাপের অনুভবযোগ্য দিকটিকে গড় আণবিক গতিশক্তিতে (mean molecular kinetic energy) পর্যবসিত করা যায়। উত্তাপকে যখন আণবিক গতিশক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তার অনুভবের দিকটি উপেক্ষিতই থেকে যায়। সাধারণভাবে যখনই কোনো একটি মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ধর্মকে (macro property) অণুপরিমাণবিশিষ্ট ধর্মে (micro properties) পর্যবসিত করা হয় তখনই একই সমস্যা হয়, তার অনুভবযোগ্য দিকটি উপেক্ষিত হয়। করকোরান মনে করেছেন যে, চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যাবসানের ক্ষেত্রেও সার্ল একই ঘটনা ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ চেতনার অনুভবযোগ্য দিকটি পর্যাবসানযোগ্য নয় বলে সার্ল মনে করেছেন। কিন্তু কারণিক দিক থেকে তা স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যাবসানযোগ্য বলে দাবী করেছেন। সার্ল বারবারই বলেছেন যে, যে স্নায়ুতান্ত্রিক দশা বা কার্যকারিতা থেকে চেতনার উদ্ভব, সেই ভৌত দশায় চেতনা অবশ্যই পর্যাবসানযোগ্য। উত্তাপ বা রঙের ক্ষেত্রে যখন পর্যাবসানের কথা বলা হয়, তখন তো কখনোই উত্তাপের ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভব বা রঙের ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কেবলমাত্র তাদের উৎপত্তির কারণগত দিকটিই বিবেচনাধীন হয়। উত্তাপ বা রঙের যে ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবের দিকও থাকে, তা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পর্যাবসানের ক্ষেত্রে, উত্তাপ বা রঙের ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবটিও চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভবের মতো অপর্যবসিতই থাকে, তাহলে করকোরানের প্রশ্ন হল,

সার্ল যে দাবী করেন যে, চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠ একটি অনুভবের ক্ষেত্র আছে, যা চেতনাকে অনন্য করে তুলেছে, সেইকারণেই উত্তাপ বা রঙের সঙ্গে চেতনার পার্থক্য হয়ে যায় — সেই দাবী কি আদৌ যুক্তিযুক্ত?

ডেভিড চার্মাসও তাঁর *The Conscious Mind* (Chalmers 1997) গ্রন্থে সার্লকে ধর্মদ্বৈতবাদী হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। চার্মাসের মতে, সার্ল যেহেতু 'zombie'-র অস্তিত্বের যৌক্তিক সম্ভাবনা স্বীকার করেন, তাই সার্ল অবশ্যই মানবেন যে, দুটি বিষয় স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের দিক থেকে অভিন্ন হলেও চেতনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতেই পারে। একটি বিষয় চৈতন্যযুক্ত হলেও অন্যটি চেতনাবর্জিতও হতে পারে। সার্লের মতে নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে উচ্চস্তরীয় চেতনার উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে একই ঘটনার দুরকম ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে বলেও তিনি মনে করেছেন। একদিক থেকে দেখলে যা নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনা, অন্যদিক থেকে তাই আবার চেতন বা মানস। এখন, সার্ল এই দুই স্তরের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধের দাবী করেন। চামার্সের মতে, সার্লের এই দাবী যথাযথ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আর চেতনার মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধের যোগ থাকা সম্ভব নয়। কারণ তা যদি থাকত, তাহলে কোনো একটি বিশেষ স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনা ঘটলেই চেতনার উদ্ভব হত। ঠিক যেমন আণবিক গঠনের একটি বিশেষ পর্যায়ে কাঠিন্য এবং অন্য একটি পর্যায়ে তরলতার উদ্ভব হয়, ঠিক তেমনি হত। চামার্স এ প্রসঙ্গে 'zombie'-র কল্প উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এমন 'zombie'-র কথা ভাবা যেতেই পারে, যা, স্নায়ুতান্ত্রিক দিক থেকে মানুষের সঙ্গে অভিন্ন কিন্তু চেতনাহীন, ফলে, যদিও 'zombie'-র ক্ষেত্রে ঐসব স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিই ঘটে, যেগুলি মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে, তবুও 'zombie'-তে চেতনা উৎপন্ন

হয় না। সুতরাং একথা মানতেই হয় যে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে চেতনার যোগ আবশ্যিক নয়। ফলে, সার্লকে মানতেই হয় যে, এরা দুটি ভিন্ন বিষয় এবং চেতনা জড় জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয়, যা দ্বৈতবাদের মূল কথা ("Searle admits the logical possibility of zombies, and infact holds that there is merely a causal connection between the microphysical and conscious experience, so he is perhaps best seen as a property dualist." (Chalmers 1997, 376)।

চামার্স দাবী করেন যে, সার্ল যদিও নিজেকে ধর্মদ্বৈতবাদী হিসেবে স্বীকার করতে চান না, কিন্তু তাঁর তত্ত্বের বিভিন্ন অংশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ধর্মদ্বৈতবাদী বলেই মনে হয়। সার্ল দাবী করেন যে, মস্তিষ্ক দশা থেকে চেতন দশার উদ্ভব হয়, এবং আমাদের মস্তিষ্কে যা ঘটে তা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, চেতনা তার অতিরিক্ত কিছুই নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই বোঝা যায় যে, সার্ল চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। একইসঙ্গে সার্ল বিষয়মুখিনতার অস্তিত্বও স্বীকার করেছেন এবং মনে করেছেন যে, বিষয়মুখী ঘটনাগুলি কখনোই সম্পূর্ণভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনার দ্বারা গঠিত হতে পারে না (Searle 2002a, 156)। কারণ সার্ল বলেছেন যে, "Intrinsic intentional states, whether conscious or unconscious, always have aspectual shapes. I have been using the term of art, "aspectual shape", to mark a universal feature of intentionality." (Searle 2002a)। তারপরই তিনি আবার বলছেন, "The aspectual feature cannot be exhaustively or completely characterized solely in terms of third person, behavioral, or even neurophysiological predicates." (Searle 2002a, 157-158)।

চার্মাস মনে করেছেন, সার্লের এই বক্তব্য ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। সার্ল একদিকে দাবী করছেন যে, মস্তিষ্কে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই কেবলমাত্র থাকে। এই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকেই চেতনার উৎপত্তি হয়। আবার, অন্যদিকে তিনি বিষয়মুখিনতার অস্তিত্বও স্বীকার করছেন, তাকে সৎ বলে দাবী করছেন এবং তা কখনোই সম্পূর্ণভাবে বস্তুনিষ্ঠ প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী সাপেক্ষ স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হতে পারে না বলেও মনে করছেন। এই আপাত বিরোধের একমাত্র সমাধান, চামার্সের মতে, বিষয়মুখিনতার ক্ষেত্রে চেতনাও কিছুটা উপাদান কারণ হিসেবে কাজ করে যেহেতু মস্তিষ্কে স্নায়ুতান্ত্রিক দশার পাশাপাশি চেতনাও অস্তিত্ববান। চামার্স মনে করেন, এই যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তি দিতে পারেন যিনি ধর্মদ্বৈতবাদকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন (Chalmers 1997, 370-71)।

চামার্সের আপত্তির বিরুদ্ধে সার্ল উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। চামার্স যেভাবে চেতনাহীন 'zombie'-র যৌক্তিক সম্ভাবনা স্বীকার করে দেখিয়েছেন যে, চেতনা কেবলমাত্র স্নায়ুতান্ত্রিক দশা নয়, তা সার্লও মেনে নেবেন, এই অর্থে যে, চেতনা তাঁর কাছে আচরণের প্রকাশমাত্র নয়। চার্মাসের কল্প-পরীক্ষণের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সার্ল সহমত হলেও, চামার্স যেভাবে কল্পনা করেছেন যে, জৈবিক দিক থেকে 'zombie' এবং একজন মানুষ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঐ 'zombie' চেতনাহীন হতে পারে — সার্ল তা মানবেন না। সার্লের মতে, মানব মস্তিষ্ক চেতনা উৎপন্ন করতে সক্ষম। তাই কোনো zombie যদি মানব মস্তিষ্কের অনুরূপ, অবিকল একই স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের অধিকারী হয় তাহলে অবশ্যই তারও চেতনা থাকবে। চামার্স জৈবিক নিয়মকে যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক বলে মনে করেননি। চামার্সের মতে, এমন জগত কল্পনা করাই যায় যেখানে অন্য

নিয়মের দ্বারা জগত চালিত হয় অর্থাৎ সেই জগতের নিয়মকানুন আমাদের জগত থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, ফলে, তাঁর মতে, এমন ভাবা যেতেই পারে যে, ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুটি জগত এক হওয়া সত্ত্বেও চেতনার নিরিখে তারা ভিন্ন, অর্থাৎ এই জগতের মানুষের চেতনা আছে, কিন্তু ঐ জগতের zombie-দের চেতনা নেই। চামার্স খুব সহজভাষায় যা বোঝাতে চান তা হল, আমাদের জগতে চেতনার অস্তিত্ব আছে এবং এমন জগত থাকতেই পারে যে জগত ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমাদের জগতের সঙ্গে অভিন্ন হলেও চেতনার দিক থেকে ভিন্ন। সুতরাং, সিদ্ধান্ত করাই যায় যে, চেতনা কেবলমাত্র স্নায়ুতান্ত্রিক দশা অর্থাৎ ভৌতদশার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়, তা তার অতিরিক্ত কিছু (Chalmers 1997, 123)।

সার্ল চামার্সের এই যুক্তির উত্তরে বলেছেন যে, চামার্স যে ধরনের জগতের কথা বলছেন, সেই ধরনের জগতের চিন্তা করতে হলে, একইসঙ্গে কল্পনা করতে হবে যে, সেই জগতের প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আলাদা। ঐ নিয়মগুলির দ্বারা চালিত হয়েই পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা চেতনাকে ব্যাখ্যা করে। শুধু তাই নয়, ঐ নিয়মগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই চেতনার উদ্ভব ঘটে এবং মস্তিষ্কে তা অনুভূত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়ম অভিন্ন হলে চেতন জগতে ভিন্নতা সম্ভব নয় বলেই সার্ল মনে করেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন যে, যদি কেউ প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে তো যে কোনো কিছুই চিন্তা করা যেতে পারে। ভাবা যেতেই পারে যে, শূকরছানা আকাশে উড়ছে। প্রাকৃতিক নিয়ম যদি বদলানোই যায়, তাহলে এমন প্রাকৃতিক নিয়মের কথা কল্পনা করা যেতেই পারে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে শূকর আকাশে উড়তে পারে। আমাদের জগতে ভৌত পদার্থের যে সংগঠন তা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কারণেই সম্ভব

হয়েছে। অণু-পরমাণু থেকে যে মহৎ জগত সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়েই হয়েছে। স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে যে চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে তা জৈবিক কারণেই ঘটেছে। সেই জৈবিক ঘটনাও প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন হলে এর থেকে ভিন্ন কোনো ঘটনা ঘটত বলেই মনে হয়। তাই কোনো জগতে যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন হয়, তাহলে সেখানে জৈবিক ঘটনাও ভিন্ন হবে। সেখানে ভৌত সংগঠনও এক হবে কিনা সে বিষয়েও সংশয় জাগা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন হলে ভৌত জগতের ঘটনাবলীও ভিন্ন হবে, ফলে চেতন জগতে ভিন্নতা হতেই পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অভিন্ন হলে, এবং ভৌত জগতের অন্যান্য বিষয়ও অভিন্ন হলে, চেতন জগতে ভিন্নতা সম্ভব নয় বলেই সার্ল দাবী করেন। সার্ল মনে করেছেন যে, চামার্স এক্ষেত্রে ভেবেছেন, অন্য জগতে এই জগত থেকে ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম থাকা সত্ত্বেও, যাবতীয় ভৌত বৈশিষ্ট্য এক এবং অভিন্ন রয়েছে, শুধু সেখানে চেতনা নেই। এবং এর ভিত্তিতে চামার্স সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন যে, চেতনা এই জগতের বিষয় নয়। কিন্তু সার্ল মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, কারণ তাঁর মতে, চামার্সের কথা মেনে যদি এমন কষ্ট কল্পনা করাও হয় যে, শূকর উড়তে পারে বা পাথরের জীবনীশক্তি আছে, তাহলেও প্রমাণিত হয় না যে, ঐ জীবনীশক্তি ও উড়তে পারার ক্ষমতাগুলি ভৌত জগতের অতিরিক্ত বা অভৌত (non-physical) (Searle 1998, 147-8)।

চামার্স মনে করেছেন, সার্ল এখানে দুটি ভুল করেছেন। প্রথমতঃ সার্লের যুক্তির আকারে ভুল আছে। যদি দেখাতে হয় যে, 'ওড়া' একটি অভৌত বিষয়, তাহলে দেখাতে হবে যে, জগতের ভৌত গঠনের সঙ্গে ওড়ার অভাব সঙ্গতিপূর্ণ। চামার্স মনে করেছেন,

সার্ল আসলে তাঁর যুক্তির আকারটি সঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। চামার্স তাঁর যুক্তিতে দেখাতে চেয়েছেন যে, ভৌত জগতের সব বিষয় বা বৈশিষ্ট্য এক থাকা সত্ত্বেও চেতনার অভাব থাকতে পারে, যৌক্তিকভাবে যেহেতু তা অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং, বলাই যায় যে, চেতনা ভৌত জগতের বিষয় নয়। চেতনার অভাব যেভাবে ভৌত জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, ওড়ার অভাবকেও সেইভাবে ভৌত জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ভৌত জগতে উড়ন্ত শূকরের ধারণা জুড়ে দিলে কিছুই প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত, বিষয়টিকে বা পরিস্থিতিকে সার্ল যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাও চামার্সের মতে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়নি। কোনো জগতে যদি উড়ন্ত শূকর থাকে তাহলে তার ভৌত গঠন অবশ্যই বর্তমান জগতের শূকরের ভৌত গঠনের থেকে ভিন্ন হবে। ফলে, এমন জগতের কল্পনা করা কখনোই যৌক্তিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না, যা ভৌত গঠনের দিক থেকে আমাদের জগতের সঙ্গে অভিন্ন হবে, অথচ সেখানে শূকর নেই বা পাথর নেই। বরং আমরা এমন জগতের কথা ভাবতেই পারি, যা আমাদের জগতের সঙ্গে ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অভিন্ন কিন্তু চেতনাবর্জিত, এতে কোনো যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই (Searle 1998, 164)।

চামার্সের এই যুক্তি থেকে সার্ল মনে করেছেন যে, চামার্সের মতের সঙ্গে তাঁর মতের মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই। চামার্স যা বলেছেন, তিনিও বস্তুতঃ সেই কথাই বোঝাতে চাইছেন। চেতনা যদি জড় মস্তিষ্কের ধর্ম হয়, তাহলে মানতে হবে যে, যেখানে চেতনা নেই সেখানে জড় জগতেই নিশ্চয়ই কোনো পার্থক্য হয়েছে। চামার্স দুটি জগতকে ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অভিন্ন বলে মনে করেও দাবী করেন যে, একটি জগত চেতনাযুক্ত ও অন্য জগত চেতনা বর্জিত। সার্ল মনে করেছেন যে সেটি হতেই

পারে যদি দুটি জগতের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মজনিত ভিন্নতা থাকে। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নিয়মজনিত ভিন্নতা যদি স্বীকারই করা হয়, তাহলে 'শূকর উড়তে পারে' এমন চিন্তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকার কথা নয়। তবে, একথা ঠিক যে, শূকর যদি আকাশে ওড়ে, তাহলে ভৌত জগতে যে কিছু পরিবর্তন হবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। কারণ, তখন শূকরেরা মাটিতে না থেকে আকাশে থাকবে। এ প্রসঙ্গে সার্ল মনে করেছেন যে, তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন— তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, চেতনা হল মস্তিষ্কের ভৌত ধর্ম, সুতরাং চেতনার পরিবর্তনের অর্থই হল ভৌত জগতের পরিবর্তন। সার্লের মতে, চামার্স উপরের যুক্তির দ্বারা, ধর্মদ্বৈতবাদ প্রমাণ করতে তখনই সক্ষম হবেন, কেবলমাত্র যদি চামার্স চেতনাকে অভৌত হিসেবে ধরে নেন। কিন্তু সেটাই তো তাঁর যুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য। সার্ল মনে করেছেন, চামার্স যেটি প্রমাণ করতে চান, সেটিকেই তিনি পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় থেকে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি থেকে, যৌক্তিকভাবেই বোঝা যায় যে, মস্তিষ্ক অবশ্যই চেতন হবে। ঠিক একইভাবে, প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন নিয়ম এবং তথ্যই বলে দেয় যে, শূকর উড়তে পারে না। এই দুটি ঘটনাই সমান্তরাল (parallel)। শুধু একটি বিষয়েই পার্থক্য আছে, তা হল— চেতনা পর্যাবসানহীন। কিন্তু সার্লের মতে, চেতনার পর্যাবসানহীনতা থেকে ধর্মদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না (Searle 1998, 173-4)।

সার্লের এই উত্তর থেকে মনে হয় যে, কোথায় যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। চামার্স যখন zombie নিয়ে সমালোচনা করছেন, তখন কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, zombie-র সম্ভাবনা স্বীকার করার অর্থই হল চেতনার অজড়ত্ব প্রমাণ করা। zombie-র অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করার জন্যই কিন্তু তিনি সার্লের

বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি এনেছেন। যদিও সার্ল বারবার চেতনার জড়ত্বের উপর জোর দিয়েছেন। চামার্সের যুক্তির বিরুদ্ধে সার্ল যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, চেতনা মস্তিষ্কের ধর্ম, যে মস্তিষ্কে চেতনা নেই, সেই মস্তিষ্ক, অবশ্যই যে মস্তিষ্কে চেতনা আছে, তার থেকে ভৌত গঠনের নিরিখে বা অন্য কোনো ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভিন্ন হবে। ফলে, তাঁর কাছে চেতনা অবশ্যই ভৌত বিষয়। কিন্তু কেন সার্ল চেতনাকে ভৌত বলতে চেয়েছেন, তা খুব স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যায় যে, তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের বাইরে যেতে চাননি এবং কোনোভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদের অভিযোগ উঠুক, তা তিনি চাননি। কিন্তু সত্যিই কি তিনি দ্বৈতবাদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন? সার্ল চেতনাকে স্বাভাবিক জৈবিক ধর্ম হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এই জগতের, অন্যান্য বিষয়ের মতো চেতনাও একটি বিষয়, তার থেকে আলাদা কিছু নয়। অথচ তা পর্যাবসানহীন। তাঁর এই চিন্তাধারাই দ্বৈতবাদের পথ প্রশস্ত করে।

সার্ল মনে করেছেন 'biological naturalism'-এর মাধ্যমে তিনি দেহ-মনের তত্ত্বের সহজ, সরল সমাধান উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সার্লের তত্ত্ব এবং সমালোচকদের আপত্তিগুলি অনুধাবন করলে লক্ষ করা যায় যে, তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। সার্ল চেতনাকে সত্তাগতভাবে জড় জগতে পর্যাবসানহীন বলেই মনে করেন। সার্লের মতে, চেতনা কখনোই জড় জগতে সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য নয়, অর্থাৎ তিনি চেতনার সত্তাগতস্তরে স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করার পক্ষপাতী। অথচ, তিনি তাঁর তত্ত্বের প্রাথমিক স্তরেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, চেতনা হল মস্তিষ্কের উচ্চস্তরীয় ধর্ম (higher level system feature) এবং তিনি চেতনাকে অন্যান্য জৈবিক ধর্ম থেকে আলাদা করতেও রাজী নন। পাচনক্রিয়া যেমন পাচনতন্ত্রের ধর্ম, তেমনি চেতনা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার ফল বা

ধর্ম। ফলে, চেতনা সার্লের কাছে যে নিছক মস্তিষ্কের জড়ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তা মানতেই হয়। এখন, সার্ল যদি একইসঙ্গে চেতনাকে মস্তিষ্কের উচ্চস্তরীয় ধর্মরূপেও স্বীকার করেন আবার চেতনার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যও মানেন, তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সার্ল চেতনাতে একইসঙ্গে মানস ও জড় ধর্মের উপস্থিতি স্বীকার করতে চান। সার্ল কার্তেসীয় দ্বৈতবাদের তীব্র বিরোধী। দেকার্তের মতো তিনি কখনোই আলাদাভাবে জড় ও মানস দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইবেন না। ফলে, দ্রব্য অদ্বৈতবাদ (substance monism) মানতেই হবে। দ্রব্য অদ্বৈতবাদ অনুসারে, এ জগতে কেবলমাত্র এক ধরনের দ্রব্যই থাকতে পারে। সে দ্রব্য জড় হতে পারে, বা মানস। সার্ল জড় দ্রব্যকেই একমাত্র দ্রব্য হিসেবে মানতে চেয়েছেন,— "the world consists entirely of physical entities." (Searle 1995, 229)। সূক্ষ্মস্তরে (microlevel) কেবলমাত্র জড় পদার্থের অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করেছেন। সুতরাং, সেদিক থেকে চেতনা বা মানস দশা স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও ঐ জড় দ্রব্যের দুধরনের ধর্ম থাকতেই পারে,— ভৌত ধর্ম ও মানস ধর্ম। যদিও, কোনো একটি ধর্ম একাধারে ভৌত এবং মানস হতে পারে না। হয় তা ভৌত ধর্ম হবে অথবা তা মানস ধর্ম হবে। সার্ল যদি চেতনাকে জড় মস্তিষ্ক তন্ত্রের ধর্ম বলে স্বীকার করেও চেতনার মধ্যে অজড় ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে ধর্মদ্বৈতবাদের সম্ভাবনা মেনে নিতে হবে।

সার্ল অবশ্যই এই আপত্তিকে মেনে নিতে চাননি। সার্ল দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, চেতনা মস্তিষ্কের জড় ধর্ম। তবে, কোনো একটি বিশেষ জড় ধর্মের সঙ্গে তা অভিন্ন না হলেও, সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে তা অভিন্ন,— "It is just the state that the

brain is in" (Searle 2004, 208)। কিন্তু, একথার মাধ্যমে সার্ল ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি থেকে মুক্ত হতে পারলেও চেতনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে অসফল হন।

ধর্মদ্বৈতবাদ জগতে দুটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই তত্ত্ব অনুসারে, জড় ধর্মের অতিরিক্ত এবং জড় ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু সার্ল তাঁর তত্ত্বে মানস ধর্মকে জড় ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সে কারণে তিনি দাবী করেন যে, তিনি ধর্মদ্বৈতবাদী নন। তিনি চেতনার কারণিক পর্যাবসানের কথা বলেন অর্থাৎ, চেতনা কারণিক দিক থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়, এবং সেজন্যই চেতনা সম্পূর্ণভাবে নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে। ফলে, ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি তাঁর বিরুদ্ধে অসঙ্গত বলেই তিনি মনে করেন। তাছাড়াও সার্ল চেতনাকে কাঠিন্য ও তরলতার মতো ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে, কাঠিন্য বা তরলতার মতো ধর্মগুলি আসলে উপরিতলের ধর্ম (surface feature) বা উচ্চস্তরীয় ধর্ম (higher level feature) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রতিটি ধর্মের পিছনেই আছে মূলগত আণবিক স্তর। আণবিক গঠনের ভিন্নতার জন্য উপরিতলের ধর্মের চরিত্র বদল হয়। ফলে, সার্লের সিদ্ধান্ত হল, উচ্চস্তরীয় আর নিম্নস্তরীয় ধর্মগুলি স্বভাবতই অভিন্ন। তাদের বোঝার ক্ষেত্রে বা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা অনেকসময়ই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি।

এখন, সার্ল যদি কেবলমাত্র বর্ণনার স্তরেই মানস ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহলে সেই ধর্মের সত্তাগত পর্যাবসানহীনতার দাবী তিনি করতে পারেন কি? আর যদি

মানস ধর্মের সত্তাগত স্তরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার নাই করেন, তাহলে তিনি মনকে ব্যাখ্যা করেছেন, এই দাবী তিনি ন্যায্যতঃ করতে পারেন না।

দার্শনিক কিমও (Jaegwon Kim) সার্লের বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি তুলেছেন। কিমের প্রশ্ন, সার্ল যখন মানস ধর্মকে মস্তিষ্কের উচ্চতর বৈশিষ্ট্য (higher level feature of the brain) বলেছেন, তখন কি তিনি প্রকৃতপক্ষে মানস ধর্মকে দৈহিক ধর্ম (physical feature of the brain) হিসেবে বুঝতে চাইছেন? কিমের মতে, প্রশ্নটি আরো গুরুতর হয়ে ওঠে যদি আধিবিদ্যক স্তরে গিয়ে প্রশ্ন করা হয়,— সার্ল মস্তিষ্কের যে উচ্চস্তরীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা যদি জড়ধর্মী হয়ও তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ জড়ধর্মী উচ্চস্তরীয় মস্তিষ্কের ধর্মগুলি কি নিম্নস্তরীয় ধর্মতে পর্যাবসানযোগ্য? সার্ল উচ্চস্তরীয় ধর্ম ও নিম্নস্তরীয় ধর্মের মধ্যে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করবেন, কিন্তু পর্যাবসান কি স্বীকার করবেন? সার্ল অবশ্যই এই প্রশ্নের নঞর্থক উত্তরই দেবেন। কিম মনে করেন, সার্লের এই নঞর্থক উত্তরই সার্লকে ধর্মদ্বৈতবাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ, সার্ল যদি উচ্চস্তরীয় ধর্মকে নিম্নস্তরীয় ধর্মতে পর্যাবসানযোগ্য রূপে স্বীকার না করেন, তাহলে তাঁকে মানতে হবে যে, তিনি দুটি স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল ধর্মদ্বৈতবাদ (Kim 1995, 192)।

সার্ল তাঁর 'Why I Am Not a Property Dualist' (2002b) প্রবন্ধে নানা যুক্তি প্রয়োগ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, তিনি কোনোভাবেই ধর্মদ্বৈতবাদী নন। দেহ-মনের সমস্যা সমাধানের পথে দুটি অন্তরায় আছে বলে তিনি মনে করেছেন। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিষয়ে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্রিয়ার ফলে কীভাবে

চেতনা উৎপন্ন হয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। দ্বিতীয়ত, প্রথাগত শব্দবন্ধের ব্যবহার, যা ভৌত ও মানস দশাকে পরস্পরের থেকে এত দূরে সরিয়ে দিয়েছে যে আমরা তাদের বিরোধী হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। সার্ল মনে করেছেন যে, এই দুটি অন্তরায়কে অতিক্রম করতে না পারলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এখন, প্রথম অন্তরায়টি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ফলে, তা যে একটু সময় সাপেক্ষ সেকথা সার্ল মানেন। কিন্তু দ্বিতীয় অন্তরায়টিকে অতিক্রম করা খুব সহজেই সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। চিন্তার জগতে যে ভ্রান্ত ধারণা গেঁথে আছে, তার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা সার্ল করেছেন বলে দাবী করেন। একইসঙ্গে সার্ল ধর্মদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তাঁর মতবাদের সঙ্গে ধর্মদ্বৈতবাদের পার্থক্য নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন।

ধর্মদ্বৈতবাদী জগতে দুধরনের ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন,— ভৌত ধর্ম ও মানস ধর্ম। ভৌত ধর্ম বস্তুসাপেক্ষ (objective) আর মানস ধর্মগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective), যেহেতু সেগুলি মানুষ বা কোনো না কোনো জীবের দ্বারা অনুভূত হয়। কিন্তু সার্ল এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, 'জগতে কতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে?'— এই প্রশ্নটিই অর্থহীন। আধিবিদ্যক স্তরে (metaphysical level) দুটি পদার্থ আছে— একথা বলার কোনো অর্থই হয় না। কারণ আমরা যে জগতে বাস করি, তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যেতে পারে, বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। আমাদের এই জগত একটিই জগত, যার অনেক ধর্ম আছে। প্রয়োজনে আমরা জগতকে বিভিন্নভাগে ভাগ করি। সেরকমই একটি বিভাজন হল জৈব আর অজৈবের (biological and non-biological) বিভাজন। চেতনা যেহেতু জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলেই

উৎপন্ন হয়, অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই তা কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, তাই চেতনাকে মৌলিকভাবে জৈবিক ঘটনা হিসেবেই গণ্য করা উচিত বলে সার্ল মনে করেছেন। পাচনক্রিয়া, সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) প্রভৃতি জৈবিক ক্রিয়ার মতো চেতনাও একটি জৈবিক ক্রিয়া। দ্বৈতবাদী জগতকে যেভাবে ভৌত আর অভৌত অংশ ভাগ করে ফেলেন, তা একেবারেই উচিত নয়। তাঁরা বলবেন, চেতনা যেহেতু মানস, তাই তা অবশ্যই অভৌত হবে; কোনোভাবেই ভৌত জগতের অংশ হতে পারবে না। কিন্তু সার্ল বলবেন, "... consciousness is a mental and therefore biological and therefore physical feature of the brain." (Searle 2020b, 61)। একটি বিষয়কে একদিক থেকে দেখলে হয়তো ভৌত অন্যদিক থেকে দেখলে অ-ভৌত বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি, একদিক থেকে হয়তো তার বস্তুগত ভিত্তি আছে, কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে তা হয়তো একেবারেই ব্যক্তিগত।

ধর্মদ্বৈতবাদে ভৌত দশা ও মানস দশাকে দুটি স্বতন্ত্র দশা হিসেবে গণ্য করার অন্য একটি কারণ হল, ধর্মদ্বৈতবাদে মনে করা হয় যে, মানস দশা কোনোভাবেই স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থায় পর্যবসিত হয় না। কারণ, তারা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে স্বতন্ত্র একটি বিষয়। সার্ল কিন্তু ধর্মদ্বৈতবাদের এই মতকেও সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মদ্বৈতবাদের পার্থক্যের এটি অন্যতম কারণ, চেতনা কারণিক দিক থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থায় পর্যাবসানযোগ্য, তা স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবে, কারণিক দিক থেকে পর্যাবসান সম্ভব হলেও সত্তাগত দিক থেকে তা কখনোই পর্যাবসানযোগ্য নয়। ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) বা বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মগুলি বা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাত হবার যে ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য চেতনার

আছে, তা প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। ফলে, চেতনা কখনোই সত্তাগতভাবে পর্যাবসানযোগ্য নয়। চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। অর্থাৎ একদিক থেকে চেতনা পর্যাবসানযোগ্য আবার, অন্যদিক থেকে তা নয়। প্রথম পুরুষের (third person) দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার বস্তুগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

কারণিক দিক থেকে, সার্ল, চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় পর্যাবসানযোগ্য বললেও সত্তাগত দিক থেকে কিন্তু চেতনা পর্যাবসানযোগ্য নয়। অর্থাৎ কারণিক পর্যাবসান কিন্তু সত্তাগত পর্যাবসানকে সুনিশ্চিত করে না। বর্ণ বা কাঠিন্যের মতো ধর্মগুলির ক্ষেত্রে কারণিক পর্যাবসানের ভিত্তিতে সত্তাগত পর্যাবসান সম্ভব হয়। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সার্লের মতে, চেতনার উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত হবার সামর্থ্য আছে, কোনো না কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবেই চেতনার অস্তিত্ব স্বীকৃত, ফলে, তা কখনোই সত্তাগতভাবে এমন কোনো কিছুতে পর্যবসিত হতে পারে না, যা সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ।

একইসঙ্গে, সার্ল একথা বলেন যে, যদিও তিনি সত্তাগতস্তরে পর্যাবসানহীন চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী করেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর তত্ত্বকে ধর্মদ্বৈতবাদ হিসেবে গণ্য করা কখনোই সঠিক নয়। ধর্মদ্বৈতবাদী স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন একটি অভৌত মস্তিষ্ক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু, সার্ল চেতনাকে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের একটি অবস্থা হিসেবে গণ্য করেন, ঠিক যেমন তরলতা বা কাঠিন্য হল জলের বিভিন্ন অবস্থা।

সার্লের মতে, ধর্মদ্বৈতবাদীর কাছে চেতনা যেহেতু মানস বিষয় সেহেতু তা অজড় হতে বাধ্য। কিন্তু সার্লের কাছে চেতনা মানস ধর্ম, তাই তা জৈবিক, আর যা জৈবিক তা অবশ্যই মস্তিষ্কের জড় ধর্ম হবে। সার্লের মতে, প্রকৃত সমস্যার জনক হল প্রথাগত চিন্তা। প্রথাগত চিন্তা ও ভাষা প্রয়োগকে সার্ল বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন। চেতনা এমন এক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) বা বিষয়মুখিনতার (intentionality) মতো বৈশিষ্ট্যগুলি আছে। তিনি মনে করেন যে, এমন একদিন হয়তো আসবে, যেদিন এমন এক বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যার মধ্যে চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষতা, একটি জড় ধর্ম হিসেবে উপস্থিত থাকবে।

সার্ল এক্ষেত্রে প্রথাগত ভাষা ব্যবহারকেই দায়ী করেছেন। শব্দ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার কারণেই দেহ-মনের সমস্যা এতটা জটিল হয়ে গেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। ধর্মদ্বৈতবাদীরা মনে করেন যে, চেতনা যেহেতু মানস, তাই তা জড় হতে পারে না, ফলে তা মস্তিষ্কের ভৌত ধর্ম হতে পারে না। কিন্তু সার্ল মনে করেন যে, চেতনা যেহেতু মানস ধর্ম, ফলে তা জৈবিক ধর্ম হবে, আর তাই তা মস্তিষ্কের ভৌত ধর্ম হবে, কিন্তু প্রথাগত চিন্তা সার্লের এই বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানেই সার্লের অভিযোগ। প্রথাগত চিন্তা অনুসারে, মানস ধর্ম ও ভৌত ধর্ম সবসময় বিরুদ্ধ কোটিতে অবস্থান করে। একই বস্তু কখনোই একসঙ্গে মানস ও ভৌত হতে পারে না। ফলে, সার্লের বক্তব্য এই চিন্তা অনুসারে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু সার্ল এর জন্য প্রথাগত শব্দ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাকেই দায়ী করেন। প্রথাগত চিন্তাই, তাঁর মতে সমস্যার জনক। তাই তিনি প্রথাগত চিন্তা ও ভাষা ব্যবহারকে বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন (Searle 2002b)।

জে. কিম (J. Kim) সার্লের 'biological naturalism' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সার্ল তাঁর তত্ত্বে মানস জগতের সম্পূর্ণ কারণিক ক্ষমতা যে স্বীকার করেছেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। সার্লের বক্তব্য থেকে কিমের মনে হয়েছে যে, সার্ল যে মানস দশার কেবলমাত্র সত্তাগত অস্তিত্বই স্বীকার করেছেন তাই নয়, চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষতার মতো বৈশিষ্ট্যও স্বীকার করেছেন এবং একইসঙ্গে চেতনার কারণিক ক্ষমতা আছে বলেও মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিম, সার্লের *The Rediscovery of the Mind* থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন : "...consciousness enables the organism to act on all sorts of things" (Searle 2002a, 107)। কিম মনে করেন দেকার্তের সময় থেকেই, বিশেষতঃ কার্তেসীয় দ্বৈতবাদের প্রভাবে দেহ-মনের (কার্যকারণ) সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে। দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানস কারণতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড (acid test) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে বলে কিম মনে করেছেন। কিম এখানে প্রশ্ন করেছেন যে, সার্ল যেভাবে চেতনার ব্যক্তিসাপেক্ষতা, পর্যাবসানহীনতা বা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন, তারপর কি তাঁর পক্ষে চেতনার কারণিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে? (Kim 1995)।

কিম সাংকেতিক উদাহরণের সাহায্যে মানস কারণতার বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, মনে করা যাক্ 'M' হল একটি মানস ধর্ম। এখন, সার্লের মতে, প্রতিটি মানস ধর্মের পশ্চাতে একটি জৈবিক ধর্ম থাকে। ধরা যাক্ সেটি হল 'B'। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ যে, 'M'-এর কারণিক ক্ষমতা আছে। এ প্রসঙ্গে কিম্ দুধরনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন,— (১) M-র থেকে যে ধর্মের উৎপত্তি হবে তা মানস ধর্ম হতে পারে অথবা (২) নতুন ধর্মটি একটি জড় ধর্ম হতে পারে। এখন, আমরা জানি

যে, জড় ধর্মগুলি নিম্নস্তরীয় আণবিক স্তরের ধর্ম আর মানস ধর্ম হল উচ্চস্তরীয় ধর্ম। M থেকে যদি জড় ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহলে বলা যাবে যে, মানস ধর্ম থেকে জড় ধর্মের সৃষ্টি হল অর্থাৎ, উচ্চস্তরীয় ধর্ম তার নিম্নস্তরীয় ধর্মের উৎপত্তির কারণ হল। কিম্ মনে করেন, সার্ল এই দুটি সম্ভাবনাকেই রাখতে চান। প্রথম সম্ভাবনাটি নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক্। 'M' থেকে ধরা যাক্, একটি নতুন মানস ধর্মের উৎপত্তি হল 'M*'। এখন যেকোনো মানস ধর্মের পশ্চাতে যেহেতু একটি জৈবিক ধর্ম অবশ্যই থাকে, সেহেতু M*-র পশ্চাতেও নিশ্চয়ই একটি জৈবিক ধর্ম থাকবে। মনে করা যাক্, সেটি হল B*। এখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, M*-এর দুটি পর্যাপ্ত কারণ এখানে উপস্থিত-- M এবং B*। 'M' নামক মানস ঘটনা যেমন M*র উৎপত্তির কারণ তেমনি B* ও জৈবিক জড় ঘটনারূপে কারণ। এখন, আমরা জানি যে, একটি ঘটনার যদি একাধিক পর্যাপ্ত কারণ থাকে, তাহলে ঘটনাটিকে অতিনিয়ন্ত্রিত (over determined) হিসেবে গণ্য করা হয়। এটিও অবশ্যই কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের (causal overdetermination) একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হবে। আবার, দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও 'M' নামক মানস ধর্ম, যা আসলে উচ্চস্তরীয় ধর্ম, তা যদি B* নামক একটি নিম্নস্তরীয় ভৌত ধর্মের কারণ হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, B*-এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো একটি ভৌত ধর্ম আছে। মনে করা যাক সেটা হল, B। ফলে এক্ষেত্রে M থেকে B*-র উৎপত্তি অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল হিসেবেই পরিগণিত হবে, যেহেতু B*-এর উৎপত্তির দুটি পর্যাপ্ত কারণ স্বীকার করতে হবে— M এবং B। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পর্যাপ্ত কারণ বা পর্যাপ্ত শর্ত বলতে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, যে কারণটি উপস্থিত থাকলেই কার্যটি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ A-কে B-র পর্যাপ্ত শর্ত তখনই বলা যাবে যদি,

এমন হয় যে, যখনই A ঘটনাটি ঘটে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গেই B-র আবির্ভাব ঘটে। এরকম ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, একটি ঘটনার একটিই পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে। কারণ তা না হলে বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক (counter factual) পরিস্থিতিতে কার্য থেকে কারণের অনুমান করা সম্ভব হবে না। সেই চিন্তাপটভূমি থেকেই কিম মনে করেছেন যে, যদি একটি ঘটনার একাধিক পর্যাপ্ত কারণ স্বীকার করা হয়, তাহলে সেটি অবশ্যই অতিনিয়ন্ত্রণের (over determination) স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে। সার্লের কাছে, কিমের প্রশ্ন হল, যদি সার্ল স্বীকারই করেন যে, সব মানস ঘটনার একটি জৈবিক জড় কারণ অবশ্যই থাকে, তাহলে জড় অতিরিক্ত অন্য আরেকটি মানস কারণ স্বীকার করার প্রয়োজন কী? (Kim 1995)।

দ্বিতীয়তঃ কিম্ মনে করেছেন যে, যদি সার্ল দেহ-মনের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেন অর্থাৎ, মানস কারণতা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে তাঁকে স্পষ্টতঃ দেখাতে হবে যে, তিনি নিম্নমুখী কারণতার (downward causation) সম্বন্ধ স্বীকার করেন। অর্থাৎ মহৎ স্তর (macro level) থেকে সূক্ষ্ম স্তর (micro level) উৎপন্ন হয়। উচ্চ-নীচ (top-down) কারণতার সম্বন্ধ স্বীকার না করলে সার্ল কখনোই মানস কারণের জন্য দৈহিক আচরণের পরিবর্তনকে স্বীকার করতে পারবেন না। অন্যদিকে, সার্ল যদি নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধকে সম্ভব বলে স্বীকারও করেন, কিমের মতে, তার ফলস্বরূপ তিনি একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কারণ, মানস ধর্ম যদি দৈহিক বা স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে, তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে জড় জগতের বাইরের কোনো কারণের দ্বারা জড় জগত প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি (principle of causal closure) তা অনুমোদন করে না। এই

নীতি অনুসারে, জড় জগতের যাবতীয় ঘটনার জড় কারণ আছে এবং নীতিগতভাবে প্রতিটি ঘটনার কোনো না কোনো জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। সুতরাং, সার্ল যদি মানস কারণতা স্বীকার করেন এবং অজড় মানস দশার দ্বারা দৈহিক দশার পরিবর্তন সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে তাঁকে আবদ্ধায়ণের নীতিকে অমান্য করতে হয়। বিজ্ঞান সর্বতোভাবে আবদ্ধায়নের নীতিকে অনুসরণ করারই পক্ষপাতী। সার্লও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করার দাবী করেন। এখন যদি সার্ল আবদ্ধায়নের নীতিকেই অমান্য করেন, তাহলে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার দাবী থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হবে (Kim 1995)।

সার্ল অবশ্য এই আপত্তির উত্তরে বলবেন যে, তিনি মানস দশাকে জড় দশা রূপেই গণ্য করেন। কারণিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মানস দশা ও দৈহিক দশার (স্নায়ুতান্ত্রিক দশা) মধ্যে তিনি কোনো ভেদ করেন না। মানস দশা কারণিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তার নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থায় পর্যাবসানযোগ্য বলেই তিনি মনে করেন। এ কারণেই তিনি বারংবার বলেছেন যে, মানস দশা মস্তিষ্কের জৈবিক ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়,— "Cousciousness... is a biological feature of human and cartain animal brains." (Searle 2002a, 90)। তিনি তাঁর অন্য গ্রন্থ *Minds, Brains and Science*-এ (2003) বলছেন, "Pains and other mental phenomena just are features of the brain." (Searle 2003, 16)। অন্যান্য জৈবিক দশার মতো, মানস দশাও একটি জৈবিক দশা। ফলতঃ তা কারণিক দিক থেকে অন্য কোনো দৈহিক দশাকে প্রভাবিত করতেই পারে, এতে কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি কোনোভাবেই বিঘ্নিত হয় না।

সার্ল বলেন, মানস দশা মস্তিষ্কের জৈবিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কথার অর্থ হল, সার্ল স্বীকার করেন যে, মানস দশা মস্তিষ্কের উপর কারণিক দিক থেকে প্রনির্ভর (causally supervenient) অর্থাৎ মস্তিষ্ক দশার পরিবর্তনে মানস দশাও পরিবর্তিত হয়। মস্তিষ্ক দশাই মানস দশার নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক। মস্তিষ্ক দশার অতিরিক্ত তার আর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা থাকার কথা নয়। কিম প্রশ্ন করেন, মানস দশাকে মস্তিষ্ক দশা প্রনির্ভর (supervenient) বলে স্বীকার করার পরও যদি সার্ল মানস দশার ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) বা বিষয়মুখিনতার (intentionality) মতো ধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে তিনি কীভাবে কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে রক্ষা করবেন? কিম বলেছেন, "...Searle cannot get off so easily : we should keep in mind that his claim that mental phenomena are biological features of the brain only amounts to the claim that mental phenomena are "causally supervenient" on brain phenomena." (Kim 1995, 194)।

তাছাড়া কিম্ আরো মনে করেন যে M আর M*-কে জৈবিক ঘটনা বলে কখনোই অতিনিয়ন্ত্রণের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ M-কে হয় B*-এর সঙ্গে অথবা অন্য কোনো নিম্নস্তরীয় জৈবিক ঘটনার সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করতেই হবে। এখন, যদি M, B*-এর সঙ্গে অভিন্ন হয়, অথবা অন্য কোনো নিম্নস্তরীয় ঘটনার সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাহলে মানতে হবে যে, যেকোনো মানস দশাই আসলে একটি জৈবিক নিম্নস্তরীয় দশা। যেমন, যখন আমি রসগোল্লা খেতে চাইছি তখন আমার ঐ ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে একটি নিম্নস্তরীয় (আণবিক স্তরের) জৈবিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সার্ল কখনোই তা মানবেন না। কিন্তু M-কে যদি তিনি B* বা অন্য কোনো

আণবিক স্তরের ঘটনার সঙ্গে অভিন্ন বলে না মানেন, তাহলে M-কে অতিনিয়ন্ত্রিত বলে মানতেই হবে। ফলে, M আর M*-কে জৈবিক ঘটনা বলে স্বীকার করেও সার্ল অতিনিয়ন্ত্রণের অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না।

সার্লের তত্ত্ব কারণতার নিয়মকে লঙ্ঘন করে বলেও কিম্ অভিযোগ করেছেন। কার্যকারণ সম্বন্ধের বিধি অনুসারে কার্য ও কারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকার কথা। কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি। ফলে, কালগত দিক থেকে আগে কারণ ঘটবে তারপর কার্য ঘটবে। কিম্ মনে করেন, এমনটাই হয় বলে কারণ ঘটার পরেও অনেক সময় কারণিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে কার্য ঘটায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকসময়ই চিকিৎসকদের এমন ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। যেমন, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর রোগগ্রস্ত কোষগুলিকে নির্মূল করার সময় তার পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এটি ঐ ওষুধ বা চিকিৎসার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু সেই ফলাফল যা অনাকাঙ্ক্ষিত, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য চিকিৎসকরা অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ কারণ থেকে অবধারিতভাবে কার্য উৎপন্ন হওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার ফলে অবশ্যম্ভাবী কার্যোৎপাদনের পথ রুদ্ধ হয়। কার্যকারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার জন্য সাধারণভাবে দার্শনিকরা প্রনির্ভরতা (supervenience), নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism), বা উদ্ভবতত্ত্বের (emergentism) কথা বলেন। সার্লও উদ্ভবতত্ত্ব ও প্রনির্ভরতা সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিমের মতে, সার্ল কার্যকারণ সম্বন্ধকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। সূক্ষ্ম ও মহৎ (micro and macro) স্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, আবার দাবী করেছেন যে, মহৎস্তর

(macro level) প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মস্তর অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। সার্লের বিভিন্ন বক্তব্যে তা স্পষ্ট। যেমন, সার্ল বলছেন, "Both consciousness and solidity function causally. But neither is 'over and above' the systems of which they are a part." (Searle 2004, 131); আবার অন্য আরেকটি জায়গাতেও তিনি বলেছেন, "Causally speaking, they [conscious states] are not something 'over and above' neurobiological processes." (Searle 2004, 113)। সূক্ষ্ম স্তর ও মহৎ স্তরের মধ্যে এইধরনের কারণিক সম্বন্ধ স্বীকার করে, সার্লের কী সুবিধা হয়েছে, তা কিম্ বুঝতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন (Kim 1995, 194)।

ব্রায়ান গ্যারেটও (Brian Garrett) সার্লের কারণতা বিষয়ক ধারণাকে সঠিক বলে মনে করেননি। কার্যকারণ সম্বন্ধে, কার্য ও কারণ সবসময়ই দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা হিসেবে গণ্য হয়। সার্ল যখন বলেছেন যে, বস্তুর কাঠিন্যকে তার আণবিক গঠনের (molecular structure) দ্বারা কারণিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তখন নিশ্চয়ই মানতে হবে যে, আণবিক গঠন আর কাঠিন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আণবিক গঠন হল কারণ, আর কাঠিন্য হল তার কার্য। তাহলে আণবিক গঠন আর কাঠিন্য কি স্বতন্ত্র না হয়ে পারে? গ্যারেটের ভাষায়, "... the solidity and the molecular structure appear to be spatially and temporally co-extensive. Such spatial and temporal overlap is the mark of a relation of constitution, not of causation, especially if you think that causal relations cannot hold synchronically." (Garrett 1995, 212) ।

মানস কারণতা প্রসঙ্গে কিম্, গ্যারেট প্রমুখ দার্শনিকরা সার্লের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করেছেন, সার্ল তার যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। সার্লের মতে, কিম্, গ্যারেট প্রমুখ দার্শনিক হিউম (Hume) প্রদত্ত কারণিক সম্বন্ধের ধারণায় বিশ্বাসী।

যেখানে কার্য ও কারণ দুটি ভিন্ন ঘটনা এবং কারণ সবসময়ই কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি। ধরা যাক্, একটি বল অন্য একটি বলকে ধাক্কা দিয়ে গতিশীল করল এবং নিজে থেমে গেল। কিন্তু সার্ল মনে করেন, সব কারণিক ঘটনাই এই বলের মতো নয়। শুধু একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুকে ধাক্কা দিলো, তার ফলে দ্বিতীয় বস্তুটির মধ্যে গতির সঞ্চার হল,-- সার্লের মতে, এত সরল কারণিক ঘটনা সবক্ষেত্রে ঘটে না। সার্লের ভাষায় 'simultaneous causation'ও অনেকক্ষেত্রেই কাজ করে (Searle 2004, 123)। সার্ল 'simultaneous causation' বা যুগপৎ কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা জানি, এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, এর কারণ হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্রমাগত প্রকৃতিতে কাজ করে চলেছে। এটা কিন্তু কোনো ভিন্ন ঘটনা নয়। সার্ল বলছেন, "...think of the causal explanation of the fact that the table exerts pressure on the rug. This is explained by the force of gravity, but gravity is not an event." (Searle 1998, 7)। সার্ল আরো কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। টেবিলের কাঠিন্য বা জলের তরলতা হল টেবিলের বা জলের উপরিতলের ধর্ম (surface feature)। এই কাঠিন্য বা তরলতার কারণ হল আণবিক স্তরের গঠন এবং অণু-পরমাণুর আচরণ। ফলে, কাঠিন্য বা তরলতার সঙ্গে আণবিক গঠনের সম্বন্ধ অবশ্যই কারণিক, কিন্তু তারা কখনোই এমন দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা নয়, যারা একের পর অন্যটি ঘটে। সার্লের ভাষায় : "...the solidity of the table... is explained causally by the behavior of the molecules of which the table is composed. But the solidity of the table is not an extra event; it is just a feature of the table." (Searle 1998, 7)। সার্ল মনে করেন, দুটি ঘটনার মধ্যে

কারণিক সম্বন্ধ থাকার অর্থ কখনোই এমন নয় যে, তাদের মধ্যে একটি ঘটনা সবসময়ই আগে ঘটবে এবং অন্যটি তার পরে ঘটবে। কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো শর্তের আবশ্যিকতা আছে বলে সার্ল স্বীকার করেন না। সার্ল আরো একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একটি বরফকে গলিয়ে জলে রূপান্তরিত করার ঘটনাকে কারণিক দিক থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এগুলির প্রত্যেকটিই পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, বরফকে তাপপ্রদান করা হল, শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেল, ফলে, পরমাণুগুলির গতিবৃদ্ধি হল, “An increase in energy caused an increase in molecule movement.” (Searle 1995, 219), অথবা বলা যায় পরমাণুগুলি এলোমেলোভাবে গতিশীল হয়ে উঠল, “The molocules are moving over each other in a random fashion.” (Searle 1995, 219)। এখন, সার্লের বক্তব্য হল, এক্ষেত্রে একটি ঘটনার কারণ তিনভাবে দেখানো হল। কিন্তু সেই কারণে কি বলা যায় যে, ঘটনাটি অতিনিয়ন্ত্রিত? সার্লের মতে, নিশ্চয়ই নয়, অবশ্যই নয়। কারণ একটি ঘটনাকেই স্তরভেদ অনুসারে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। একই তন্ত্রের বিভিন্ন স্তর অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য কারণিক আবদ্ধায়ণের নীতি বিঘ্নিত হয় না। আর একে কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল (causal overdetrmination) বলেও গণ্য করা যায় না। আবার, এর ভিত্তিতে কাঠিন্য বা তরলতা উপবস্তু হিসেবেও গণ্য হওয়া উচিত নয়।

একইভাবে মস্তিষ্ক ও চেতনার সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে সার্ল মনে করেছেন। যন্ত্রণার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যন্ত্রণাও স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার ফলে উৎপন্ন হয়। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই অনুভূত হয় (realized)। ঐ

যন্ত্রণার কারণেই যদি একটি যন্ত্রণা উপশমকারী ওষুধ খাবার ইচ্ছা হয়, তাহলে বলা যায় যে, ঐ ইচ্ছার মূল কারণ হল কতগুলি স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা। এখানে ওষুধ খাবার ইচ্ছার দুটি কারণ,-- যন্ত্রণা ও স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা। ঠিক যেমন, বরফ আর জলের ক্ষেত্রে হয়েছিল। যন্ত্রণা যেমন ওষুধ খাবার ইচ্ছার কারণ, তেমনি ঐ স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনাও অন্য স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনার কারণ, এরা দুটি ভিন্ন বিষয় নয় বরং একই তন্ত্রের দুটি ভিন্নস্তরীয় বর্ণনামাত্র। সার্লের ভাষায়, "Top-down causation always works across time, and it works because the top level is grounded in the lower levels... the same system admits of different causal descriptions at different levels..." (Searle 1995, 219)।

নিম্নস্তরীয় ঘটনাও উচ্চস্তরীয় ঘটনার দ্বারা কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত হতে পারে বলে সার্ল মনে করেছেন। উচ্চস্তরীয় মানস দশার কারণের প্রভাবে যখন কোনো স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনা ঘটে, যেমন, নিজের ইচ্ছায় আমরা যখন কোনো কাজ করি তখন অবশ্যই উচ্চস্তরীয় দশা নিম্নস্তরীয় ভৌত (জৈবিক) দশাকে ঘটতে সাহায্য করে। কিন্তু সার্ল মনে করেন যে, তার ফলে কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি (principle of causal closure) বিঘ্নিত হয় না বা অতিনিয়ন্ত্রণের (overdetermination) ঘটনাও ঘটে না। তার কারণ, উচ্চস্তরের কারণিক ক্ষমতা থাকলেও তা নিম্নস্তরের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সার্লের মতে, কারণতা হল একটি সম্বন্ধ যা এমন দুটি ঘটনার মধ্যে ঘটতে পারে যারা একই তন্ত্রের (system) দুটি ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। (Searle 1983, 266)। তাই সার্ল মনে করেন, যদি কারণতার ধারণা পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, তাহলে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে সমস্যা হবে।

সার্ল মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ— এই অভিযোগে সমালোচকরা সার্লকে উপবস্তুবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও সার্ল এই আপত্তিকে ভিত্তিহীন বলেই মনে করেছেন। কারণতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা যেমন তাঁকে বা তাঁর তত্ত্বকে বুঝতে না পারার একটি কারণ, তেমনি তিনি মনে করেন যে, জড় ও মন বিষয়ক যে দ্বৈতবাদী বিভাজনের চিন্তা তথাকথিতভাবে দার্শনিক মহলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেই চিন্তাকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করার কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে উপবস্তুবাদের আপত্তি ওঠে। দ্বৈতবাদী চিন্তায় মনে করা হয় যে, জড় ও মন হল দুটি ভিন্ন সত্তা। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কারণিক সম্বন্ধ কীভাবে থাকতে পারে? কিন্তু সার্লের মতে, তারা দুটি ভিন্ন সত্তা নয়। দেহ-মনের দ্বৈতবাদ তিনি স্বীকার করেন না। কারণ তাঁর মতে, মানস দশা, মস্তিষ্কের সাধারণ ধর্ম, মস্তিষ্কের আণবিক গঠনের সমাহারের থেকে মানস দশা গঠিত হয়। ঠিক যেমন জলের তরলতা জলের আণবিক গঠনের ফলে তৈরি হয়। 'H_2O'র আণবিক গঠনের সমাহার থেকেই জলের উপরিতলের ধর্ম (surface feature) সৃষ্টি হয়, তেমনভাবেই মানস দশাগুলিও মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের আচরণের ফলে মস্তিষ্কের উপরিতলের ধর্ম হিসেবে সৃষ্ট হয়। স্থূল স্তর বা মহৎ স্তরের (macro level) যা কারণ তা সূক্ষ্ম স্তরের কারণের থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়। চেতনা মস্তিষ্কের থেকে ভিন্ন কিছু নয়, মস্তিষ্কের ধর্মমাত্র। টেবিলের কাঠিন্যের সঙ্গে তার আণবিক আচরণের যা সম্বন্ধ, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে চেতনারও সেই একই সম্বন্ধ। জলের তরলতাই হোক বা টেবিলের কাঠিন্য বা মস্তিষ্কের চেতনা — যাই-ই হোক না কেন, কোনো ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের কারণ কখনোই নিম্নস্তরের কারণের অতিরিক্ত নয়। ("...the causes at the level of the entire system are entirely accounted for, entirely causally reducible to, the

causation of the micro elements. That is as true of brain processes as it is of car engines...” (Searle 2004, 208)। মনে করা যাক্, একজন ব্যক্তি জল পান করার ইচ্ছায় টেবিলের উপর থেকে জলের গেলাসটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো। এখন, তার হাতের পেশীর সংকোচন প্রসারণ ঘটল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক স্নায়ুর মাধ্যমে হাতের পেশীকে সংকোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দিল। ঐ স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া যে ঐ ব্যক্তির হাত বাড়ানোর কারণ— তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিম্ প্রমুখ ভৌতবাদীরা বলবেন যে, এখানে একটিমাত্র কারণই কাজ করেছে, তা হল, ঐ স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া। সার্লও মনে করেন, এখানে একটিমাত্র স্নায়ুতান্ত্রিক ঘটনাই রয়েছে। কখনো সেটা মানস অভিধায় বর্ণিত হচ্ছে, কখনো বা নিম্নস্তরীয় দৈহিক অভিধায়। তবে একটি কথা সার্ল এখানে লক্ষ করতে বলেছেন, সব সাদৃশ্যানুমানের (analogical argument) মতোই এখানেও কিছু অমিল থেকে গেছে। জলের তরলতাকে জলের আণবিক গঠনে পর্যবসিত করা যায়। জলের তরলতা সত্তাগতভাবেই তার আণবিক গঠনের অতিরিক্ত কিছু নয়। টেবিলের কাঠিন্যও ঠিক তাই। সত্তাগত দিক থেকে টেবিলের কাঠিন্যকে তার আণবিক গঠনে বা আণবিক আচরণে পর্যবসিত করা যায়। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে সার্ল ব্যতিক্রম স্বীকার করেন। তাঁর মতে, চেতনাকে সত্তাগতভাবে মস্তিষ্ক ক্রিয়ায় পর্যবসিত করা সম্ভব নয়— “...the ontological irreducibility of consciousness comes not from the fact that it has some separate causal role to play; rather, it comes from the fact that consciousness has a first person ontology and is thus not reducible to something that has a third person ontology, ...” (Searle 2004, 209)।

এখন, সার্লের মতে, মানস দশা যদি মস্তিষ্কের ধর্ম হয় তাহলে আর মানস-ভৌত দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ ওঠে না। যদি মানস দশা আর ভৌত দশা দুটি ভিন্ন জগতের বিষয় না-ই হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতেও কোনো সমস্যা হয় না আর উপবস্তুবাদের প্রসঙ্গও ওঠে না।

উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের কারণতা প্রতিষ্ঠা করা যে সমস্যাজনক, সে বিষয়ে সার্ল সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি স্পষ্টভাবে নিম্নমুখী কারণতার (downward causation) কথা বলেননি। তিনি মানস কারণতা ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যেই কারণিক পর্যাবসান আর সত্তাগত পর্যাবসানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 'মানস দশার কারণিক পর্যাবসান সম্ভব' — একথা বলার মাধ্যমে তিনি এই সম্বন্ধকে সমস্তরীয় কারণতার সম্বন্ধ (same level causation) হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, এবং একইসঙ্গে উচ্চ-নীচ কারণতার সমস্যাকে এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা, অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা হল কিনা— সেটাই বড়ো প্রশ্ন। সার্ল যখন মানস দশা আর ভৌত দশার মধ্যে কারণিক সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন তখন মানস দশাকে অভৌত (ভৌত জগতের অতিরিক্ত) দশা হিসেবে স্বীকারই করছেন না। মানস দশা আর ভৌত দশা তখন তাঁর কাছে অভিন্ন, মানস দশা সেই কারণেই ভৌত দশায় পর্যাবসানযোগ্য। সার্লের তত্ত্বে মানস দশা যখন ভৌত দশাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করছে, তখন তা মানস ধর্ম পুরস্কারে দৈহিক দশাকে প্রভাবিত করছে না, বরং তা ভৌত ধর্ম পুরস্কারে কার্যকারণ সম্বন্ধে অংশগ্রহণ করছে। তাই মানস দশার এই কারণিক ভূমিকাকে মানস কারণতার দৃষ্টান্তরূপে আখ্যা দেওয়াই অন্যায্য এবং অযৌক্তিক।

মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সার্ল মানস দশাকে ভৌত জগতে পর্যবসিত করেছেন। কারণ, তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে, কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি মেনে যখন মানস দশার কারণিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তখন তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই বলতে হয়েছে যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কোনো কারণিক ক্ষমতা মানস দশায় থাকে না। চেতন দশা কারণিক দিক থেকে ভৌত দশায় পর্যাবসানযোগ্য। এখন, একথা বললে মানস দশার যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তা কি অবশিষ্ট থাকে? সার্ল যদিও মানস দশার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে বলেই দাবী করেছেন। ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectvity), বিষয়মুখিনতার (intentionality) মতো চেতনার কতগুলি ধর্মের কথা তিনি বলেছেন, সেগুলি পর্যাবসানহীন এবং এগুলিই চেতনাকে অনন্য করে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হল সার্ল যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করে চেতনাকে মানস জগতে অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন, সেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য অবচ্ছিন্নরূপে কি মানস দশা ভৌত দশাকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে? যদি তিনি তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলেই কেবলমাত্র বলা যাবে যে, মানস দশার স্বকীয়তা এবং মানস কারণতা তাঁর তত্ত্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সার্ল তাঁর *Mind* (2004) গ্রন্থে মানস কারণতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে কোনো সমস্যাই হবে না, যদি আমরা মানস জগতকে পর্যবসানহীনরূপে গণ্য না করি; মানস জগত, ভৌত জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয়— এই পূর্বস্বীকৃতিকে যদি আমরা বর্জন করতে পারি, তাহলেই মানস কারণতা ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে যাবে। তাঁর মতে, মানস দশা (ভৌত) মস্তিষ্কের ধর্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেছেন, কারণিক দিক থেকে, এরা দুটি পৃথক দশাই (ঘটনাই) নয়, অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক দশা আর চেতনা দশা দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র নয়। তারা একই

মস্তিষ্কতন্ত্রের দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনামাত্র— একটি স্তরে স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে, অন্য স্তরে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রভৃতি মানস দশার মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে। জল পান করার ইচ্ছায় হাত বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আর চেতন ইচ্ছা— দুটিই থাকে বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু সার্লের মতে, বস্তুতঃপক্ষে সেখানে দুটি ঘটনা থাকে না, একটি ঘটনারই দুটি ভিন্ন স্তরীয় বর্ণনা থাকে মাত্র। এখন প্রশ্ন হল, সার্ল যদি চেতন ইচ্ছা বা বেদনাকে কেবলমাত্র ভৌত মস্তিষ্ক তন্ত্রের একটি বর্ণনা বলে ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনার অতিরিক্ত তার আর কোনো সত্তা স্বীকার না করেন, তাহলে কি সার্ল চেতন দশার সত্তাগত পর্যাবসানহীনতার (ontological irreducibility) দাবী করতে পারেন?

সার্লের তত্ত্বে নানা সমস্যা থাকলেও একটি বিষয় অবশ্য লক্ষ্যণীয়, তা হল, সার্ল কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে এমন কিছু গুণের কথা স্বীকার করেছেন যা তাঁর মতে, ভৌত জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। অথচ, তিনি একথা মানেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকেই উৎপন্ন হয়। চেতনায় ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity) বা বিষয়মুখনিতার (intentionality) মতো ধর্মগুলি থাকে, যা চেতনাকে জগতের সব বিষয় থেকে অনন্য করে তোলে অথচ এই গুণগুলি স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় অনুপস্থিত। সার্ল চেতনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন, যেমন কাঠিন্য, তরলতা প্রভৃতি, সেগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যে পারমাণবিক গঠন থেকে তরলতা বা কাঠিন্যের উৎপত্তি, সেই সব পারমাণবিক গঠনের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের কোনো গুণ থাকে না। অর্থাৎ সার্ল এমন সম্ভাবনা স্বীকার করেন যে, নিম্নস্তরীয় উপাদান কারণে কোনো গুণ অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উচ্চস্তরীয় কার্যে তা আবির্ভূত হতে পারে, এই চিন্তা

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নতুন দিশা দেখায়। জড় জগত থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চেতনা যে জড় জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয় হতে পারে, সেই সম্ভাবনার পথ এই চিন্তা খুলে দিতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা বা ভৌতবাদের পর্যাবসানমূলক চিন্তা দেহ-মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, এই নতুন চিন্তা হয়তো তা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সার্ল যদি সত্যিই মনে করেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক জগত থেকে এমন গুণের আবির্ভাব হয়, যা স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়, তাহলে সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন এবং সার্লের চিন্তাকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে দেহ-মনের সম্বন্ধকে নতুন চিন্তার হাত ধরে ব্যাখ্যা করাও সম্ভবপর হতে পারে।

তথ্যপঞ্জী

1. Brooks, Eugene M. 2007. The Identity Theory and Refutation of Searle's Major Objections. *Imagination, Cognition and Personality.* 20 (1-2) : 117-138.
2. Chalmers, D. 1997. *The Conscious Mind.* Oxford : Oxford University Press.
3. Corcoran, K. 2001. Trouble with Searle's Biological Natualism. *Erkenntnis.* 55 : 307-324.
4. Freeman, W. J. and Skarda, C. A. 1991. Mind/Brain Sciences : Neuroscience on Philosophy of Mind. in *John Searle and His Critics.* eds. E. Lepore and R. V. Gullick. 115-127. Oxford : Oxford University Press.
5. Garrett, B. J. 1995. Non-reductionism and John Searle's The Rediscovery of the Mind. *Philosophy and Phenomenological Research.* 55(1) : 209-214.

6. Hannay, A. 1991. Consciousness and the Experience in Freedom. in *John Searle and His Critics*. ed. E. Lepoire and R. V. Gulick. 129-139. Oxford : Blackwell.
7. Jackson, F. 2002. What Mary Didn't Know. in *The Nature of Consciousness : Philosophical Debates*. eds. Ned Block, O. Flannagan, G. Guzeldere. Cambridge, MA : Bradford Book.
8. Kim, J. 1995. Mental Causation in Searle's Biological Naturalism. *Philosophy and Phenomenological Research*. 55(1) : 189-194.
9. Novotny, D. 2007. Searle on the Unity of the World. *Axiomathes*. 17 : 41-51.
10. Searle, J. R. 1983. *Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge : Cambridge University Press.
11. Searle, J. R. 1995. Consciousness, the Brain and the Connection Principle : A Reply. *Philosophy and Phenomenological Research*. 55(1) : 217-232.
12. Searle, J. R. 1998. *The Mystery of Consciousness*. London : Granta Books.
13. Searle, J. R. 2002a. *The Rediscovery of the Mind*. Cambridge, MA : A Bradford Book.
14. Searle, J. R. 2002b. Why I Am Not a Property Dualist. *Journal of Consciousness Studies*. 9 (12) : 57-64.
15. Searle, J. R. 2003. *Minds, Brains and Science*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
16. Searle, J. R. 2004. *Mind : A Brief Introduction*. Oxford : Oxford University Press.

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভবতত্ত্ব ও সার্ল

সার্ল বিজ্ঞানসম্মতভাবে চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি বারবার চেতনার ব্যাক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity), বা বিষয়মুখিনতার (intentionality) মতো গুণগুলির কথা বলেছেন। চেতনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার দ্বারাও তা সমর্থিত হয়। এখন, এই গুণগুলি চেতনাতে উপস্থিত থাকলেও, যেসব স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে তার উৎপত্তি, সেই ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক দশাতে সেগুলি উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ, নিম্নস্তরীয় উপাদান কারণ থেকে উচ্চস্তরীয় কার্যের উৎপত্তির সময়ে সেখানে এমন কিছু গুণের আবির্ভাব সার্ল স্বীকার করেছেন যা অভিনব এবং একইসঙ্গে তা তার উপাদান কারণে পর্যাবসানহীন। এক্ষেত্রে তাই মনে করা হয় যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে চেতনার উৎপত্তিকে সার্ল সাধারণ সৃষ্টি হিসেবে দেখেননি। সার্লের তত্ত্বে চেতনার উৎপত্তি, উদ্ভব বা উন্মেষের (emergence) ধারণাকেই বহন করে। সার্লের তত্ত্ব উদ্ভবের ধারণার সাহায্যে দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় কোনো নতুন দিকের সন্ধান দিতে পারে কিনা, তা বিচার করে দেখা যেতেই পারে। কিন্তু তার আগে সার্লের উদ্ভবতত্ত্ব বোঝার জন্য বা আরো ভালোভাবে বললে, তার বিশেষত্ব অনুধাবন করার জন্য উদ্ভবতত্ত্বে উদ্ভবের ধারণাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, উদ্ভবের দৃষ্টান্তে কী কী বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকা আবশ্যিক, উদ্ভবতাত্ত্বিকদের দাবীগুলিই বা কী, সে বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উৎপত্তি, উদ্ভব, উন্মেষ প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণভাবে, একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোনো একটি নতুন বিষয়ের আবির্ভাবকেই বোঝানো হয়। কোনো আবির্ভাবই শূন্য থেকে হতে পারে না, তার কোনো না কোনো কারণ অবশ্যই থাকবে। উপাদান কারণ থেকে কোনো বিষয়ের আবির্ভাবকেই উৎপত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু দর্শনের জগতে কোনো কোনো উৎপত্তিকে উদ্ভব বা উন্মেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সব উৎপত্তিকে নয়। অর্থাৎ, সাধারণ উৎপত্তি ও 'উদ্ভব' বা 'উন্মেষে'র মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে বলে উদ্ভববাদী দার্শনিকরা দাবী করেন।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক গ্যালেনের (Galen) লেখায় উদ্ভবের ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্যালেনের মতে, সরল উপাদানে গঠিত কোনো জটিল বস্তুর মধ্যে ঐ সরল উপাদানগুলির কোনো জটিল সম্পর্কের কারণে, যদি এমন কোনো নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়, যা ঐ সরল উপাদানের কারোর মধ্যেই নেই, তাহলে সেটি উদ্ভবের স্থল হিসেবে গণ্য হবে (Caston 1997)। গ্যালেনের এই ধারণাই উদ্ভবের তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা যা বহুকাল ধরে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। আধুনিক যুগে যে উদ্ভবের ধারণা প্রচলিত তার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই চিন্তা ঘরানা দর্শনের জগতে 'british emergentism' নামে পরিচিত। এই ব্রিটিশ এমার্জেন্টিজমের জনক হলেন জে. এস. মিল (J. S. Mill) । মিলের *A System of Logic* (1843) গ্রন্থে প্রথম এই চিন্তার সূচনা হয়। এর পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার বেনের (Alexander Baine) *Logic* (1870), স্যামুয়েল আলেকজান্ডারের (Samuel Alexander) *Space, Time and Deity* (1920), লয়েড মর্গ্যানের (Lloyd Morgan) *Emergent Evolution* (1923) এবং সি. ডি. ব্রডের (C. D. Broad)

The Mind and its Place in Nature (1925) প্রভৃতি গ্রন্থ এই ঘরানার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে পরিচিত।

যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism) ও প্রাণবাদের (vitalism) বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই যান্ত্রিকতাবাদ ও প্রাণবাদের বিবাদকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্বের সূচনা হয়েছিল। যান্ত্রিকতাবাদের (mechanism) মূল বক্তব্য ছিল – সমগ্র হল তার অংশের সমষ্টি। অন্যদিকে, প্রাণবাদ (vitalism) অনুসারে, জৈব ঘটনাকে (organic phenomenon) কখনোই অজড় উপাদানের উপস্থিতি ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সেখানে জৈব আর অজৈব (living and non-living) একে অন্যের থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। কারণ, তারা ভিন্ন নীতির দ্বারা চালিত হয়। উদ্ভবতত্ত্ব (emergentism) একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদের দ্বন্দকে ব্যাখ্যা করতে চাইল, একটা নতুন পথ খুঁজতে চেষ্টা করল। ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্ব মেনে নিল যে, এই জগতের সবকিছুই মূলগতভাবে জড় পদার্থ দিয়ে গঠিত। সেখানে কার্তেসীয় আত্মাও নেই, অ্যারিস্টটলের 'entelechies'ও নেই, 'vital elan' বা ঐজাতীয় কিছুই নেই। ম্যাকলাগ্লিনের (McLaughlin) ভাষায়, "There are, for example, no Cartesian soul, or entelechies, vital elan or the like" (McLaughlin 2008, 19)। গতির সঞ্চারই জাগতিক পরিবর্তনের মূল; মৌলিক জড়কণাগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার ভিন্ন এ জগতে পরিবর্তন ঘটতে পারে না, যান্ত্রিকতাবাদের এই দাবী উদ্ভবতত্ত্ব স্বীকার করে। একইসঙ্গে উদ্ভবতাত্ত্বিকরা বলেন যে, জড়কণা দ্বারা গঠিত জগতের বিভিন্ন জটিল সংগঠনের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ বর্তমান। নিম্নস্তর থেকে ক্রমশঃ উচ্চস্তরের দিকে এগোলে পাওয়া যাবে যথাক্রমে, জড় স্তর, রাসায়নিক স্তর, জৈব স্তর, এবং সর্বশেষে হল মানস স্তর। প্রত্যেক স্তরই তার নিম্নস্তরকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং শেষপর্যন্ত কোনো না কোনো

প্রকারের জড়কণার দ্বারাই নির্মিত হবে। প্রত্যেক স্তরের কিছু সাধারণ ধর্ম থাকবে, যা পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাধীন। কিন্তু তাছাড়াও কিছু ধর্ম থাকবে, যার জন্য ঐ জড় পদার্থগুলো কোনো না কোনো বিশেষ স্তরে বিশেষ সাংগঠনিক সম্বন্ধে অংশগ্রহণ করবে। বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার কাজই হবে ঐ বিশেষ স্তরের যে বিশেষ সাংগঠনিক সম্বন্ধ, সে বিষয়ে আলোচনা করা এবং ঐ সম্বন্ধগুলির নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি গঠন করা (McLaughlin 2008, 20)। অর্থাৎ, জড় পদার্থ বিষয়ক আলোচনা পদার্থবিজ্ঞানে হলেও, তার পরবর্তীক্ষেত্রে জড়কণাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে রসায়ন আরও গভীরভাবে আলোচনা করবে, তাদের মিশ্রণের প্রকৃতি, অনুপাত প্রভৃতি অনুধাবন করে সেই বিষয়ক নীতি প্রণয়ন করবে। তারও পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন কোষ বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে জীববিজ্ঞান আলোচনা করবে।

ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ধারণাকে সামনে রেখে জগতকে ব্যাখ্যা করতে চায়। এখানে মনে করা হয় যে, জড় কণার দ্বারা যে বিভিন্ন ধরনের সাংগাঠনিক কাঠামো তৈরি হয়, যা বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, তাদের মৌলিক কারণিক ক্ষমতা বা কার্যশক্তি (causal power) থাকে। এই কার্যশক্তি জড় উপাদানের ঐ বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামো থেকে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক পদার্থগুলি (elements) তাদের সূক্ষ্ম কাঠামোর জন্যই অন্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন জৈবিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। জৈব পদার্থগুলি তাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, খাদ্যগ্রহণ বা প্রজনন জাতীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে (Broad 1925, 78-81)। কোনো কোনো বিশেষ ধরনের জৈব সংগঠন আবার তাদের স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের জন্য জ্ঞান

অর্জনে সমর্থ হয়, এবং অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে নতুন অভিজ্ঞতাকে বিচার করতেও সক্ষম হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্ব খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। *The Rise and Fall of British Emergentism* প্রবন্ধে (2008) ব্রায়ান ম্যাকলাগ্লিন (Brian McLaughlin) ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্বের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ব্রডের *The Mind and its Place in Nature* প্রকাশিত (1925) হবার কিছুদিনের মধ্যেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স (quantum mechanics) আবিষ্কৃত হল, যার ফলে পরমাণু বা অণুসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের অর্থাৎ 'রাসায়নিক বন্ধনে'র (chemical bonding) ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স রাসায়নিক বন্ধনকে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করল। তারই পরবর্তী স্তরে DNA-র আবিষ্কারের ফলে জীববিজ্ঞানের জগতেও এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এল, জীববিজ্ঞানও আণবিক স্তরে প্রবেশ করল। এইসব নতুন আবিষ্কার উদ্ভূত ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত বক্তব্য এবং তৎকালীন রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের প্রথাগত সূত্রগুলিকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করল। যদিও তাত্ত্বিক জগতের এই পরিবর্তন, মানস জগতের উদ্ভবকে প্রতিহত করেছে, নাকি সহায়তাই করেছে, সে বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব। ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ঐ প্রথাগত সূত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সেগুলি ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ায় ব্রিটিশ উদ্ভততত্ত্বও তার গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। উদ্ভবতত্ত্ব সে যুগে গুরুত্বহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও, তা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। দর্শন ও বিজ্ঞানের জগতে উদ্ভবতত্ত্বের একটি ধারা চিরদিনই ফল্গুর মতো অন্তর্লীন হয়ে

বয়ে চলছিল। সত্তরের দশকের পর থেকে তা আবার নতুন করে ফিরে আসার চেষ্টা করল। দর্শনের জগতে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের (logical positivist) আগমনের কারণেই ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্ভবতত্ত্ব একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের পর্যাবসানমূলক ভৌতবাদ (reductive physicalism) যখন পতনের মুখে পড়ল এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে একীকরণের (unification of sciences) প্রচেষ্টা যখন বিফল হল, তখন উদ্ভবতত্ত্বের পুনরাবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হল। স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (Samuel Alexander), লয়েড মর্গান (Lloyd Morgan) প্রমুখ উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, তাঁরা যান্ত্রিকতাবাদী পর্যাবসানবাদ (mechanistic reductionism) এবং দ্বৈতবাদের মতো দুটো চরমপন্থাকে বর্জন করে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে, এ জগতের সবকিছুই জড় পদার্থ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কোনো বিজাতীয় বা বহিঃস্থিত সত্তার বা শক্তির প্রবেশ ঘটে না। অথচ, এই জড়কণা দ্বারা নির্মিত যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে এমন কিছু নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, যাদের ঐ পদার্থের মৌলিক কণায় পর্যবসিতও (reduce) করা যায় না, বা ঐ মৌল পদার্থের ভিত্তিতে নতুন ধর্মগুলি সম্বন্ধে কোনো পূর্বাভাস বা ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব হয় না। বর্তমান যুগে উদ্ভবতত্ত্ব একধরনের অ-পর্যাবসানমূলক জড়বাদের (non-reductive materialism) একটি প্রকার হিসেবে চিহ্নিত, যা পর্যাবসানমূলক জড়বাদ (reductive materialism) এবং চরম দ্বৈতবাদের (all out dualism) মধ্যবর্তী একটি পন্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব জড়বাদকে অনুসরণ করে বলে যে, জড়কণাই হল এ জগতের মূল উপাদান। কিন্তু ঐ জড়কণা থেকে সৃষ্ট যৌগিক পদার্থগুলি যে সবসময় জড়ই হবে এবং শেষ পর্যন্ত জড়পদার্থেই পর্যবসিত হবে এবং তার অতিরিক্ত কিছুই সেখানে থাকবে না,

একথা তাঁরা মানেন না। পর্যাবসানমূলক জড়বাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হলেও তার আলোচনা যে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে স্রোত জড়বাদী তত্ত্বগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আজ সেই স্রোতটি অভিমুখ পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পর্যাবসানহীন (non-reductive) জড়বাদের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে, যা উদ্ভবতত্ত্বের জমিকে উর্বর করে তুলেছে। উদ্ভবতত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলাই যায় যে, এই তত্ত্ব যতই মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা বলুক না কেন, এটি হয় পর্যাবসানমূলক জড়বাদে অথবা কোনো একধরনের দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হবে। এই আশঙ্কা যথার্থ না অমূলক, তা অন্যতম একটি বিতর্কের বিষয় হতেই পারে, কিন্তু তা আমাদের কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হল উদ্ভবের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা। সত্যিই কি যৌগিকতন্ত্রে এমন কোনো ধর্ম থাকতে পারে, যা উদ্ভূত এবং ঐ তন্ত্রেরই বাকি ধর্মগুলির থেকে আলাদা, কারণ সেগুলি উদ্ভূত নয়? যদি উদ্ভূত ধর্মের (emergent property) সুসংহত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে অন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হল, কোনো কোনো বিশেষ ধরনের ধর্মই কি উদ্ভূত হয়? যেমন, মানস ধর্মগুলো কি স্নায়ুতান্ত্রিক বা জৈবিক ধর্মগুলোর সাপেক্ষে উদ্ভূত? অথবা জৈবিক ধর্মগুলো কি জড় রাসায়নিক (physio-chemical) ধর্মগুলোর সাপেক্ষে উদ্ভূত ধর্ম বলে গণ্য হবে? অথবা আরো মৌলিক প্রশ্ন হতে পারে যে, উদ্ভূত ধর্ম বলে কি আদৌ কোনো কিছু থাকতে পারে?

ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্বের সমর্থকরা সকলেই জড়বাদী। এই জগতের উৎপত্তি যে জড় বস্তু থেকেই হয়েছে, তাতে তাঁরা কখনোই সংসয় প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ, তাঁরা স্বীকার করেন যে, এই জগতের মৌলিক স্তরটি সবসময়ই জড় হবে, এবং যা উদ্ভূত

হবে, তাও এই জড় স্তরের উপাদান দিয়েই গঠিত হবে। ফলে, অতিজাগতিক কোনো বিষয় এখানে স্বীকৃত নয়। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা দাবী করেন যে, বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ লক্ষ করলে দেখা যায়, কালের গতিতে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে, যা স্তরভেদের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক বিশেষ বিজ্ঞানের শাখা এই বিভিন্ন স্তরের ধর্ম নিয়েই গবেষণা করে (Broad 1925, 77)। প্রত্যেক উদ্ভবতাত্ত্বিক নিজের পছন্দমতো স্তরভেদের কথা বলেছেন। যেমন, ব্রডের মতে, প্রথমেই থাকবে পদার্থবিদ্যা, তারপর রসায়ন, তারপর জীববিদ্যা এবং সবশেষে মনোবিজ্ঞান। আলেকজান্ডার দেশ-কাল দিয়ে শুরু করেন, তারপর জড়, জীব, তারপর চেতনা এবং সবশেষে তিনি 'the quality of deity'র কথা বলেন (Alexander 1920)। ব্রিটিশ উদ্ভবতাত্ত্বিকদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা সবাই একটা বিষয়ে একমত ছিলেন যে, চেতনা নিঃসন্দেহে উদ্ভূত ধর্ম; ফলে, যদি সত্যিই স্তরের বিভিন্নতা স্বীকার করতেই হয়, তাহলে জগতে অন্ততঃ দুটি স্তর স্বীকার করতে হবে — জড় ধর্মের স্তর আর চেতন ধর্মের স্তর। উদ্ভবতাত্ত্বিকরা সবসময়ই মনে করেন যে, জগতের মূল উপাদান হল জড় পদার্থ। তাই, এই জগতে যা কিছুরই উদ্ভব হোক না কেন, তা ঐ মূলগত জড়ধর্মের স্তর থেকেই উদ্ভূত হবে। উদ্ভবের এই বৈশিষ্ট্যটিকে কিম (J. Kim) উদ্ভবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন—"Systems with a higher-level of complexity emerge from the coming together of lower-level entities in new structural configuration (the new "relatedness" of these entities)." (Kim 2008, 140)।

ব্রিটিশ উদ্ভবতত্ত্ব সবসময়ই মনে করত যে, এই জগতে যে কোনো ধর্মেরই সৃষ্টি হয় মূলগতভাবে জড় আণবিক গঠনের ভিত্তিতে। নতুন উৎপন্ন হওয়া ধর্মগুলোকে তাঁরা দুভাগে ভাগ করেছেন – পরিণামমূলক ধর্ম আর উদ্ভূত ধর্ম। এখন, প্রশ্ন হল, এদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে কীভাবে? কিম, পূর্বাভাসযোগ্যতা (predictability) ও ব্যাখ্যাযোগ্যতার (explainability) মানদণ্ডের নিরিখে এই দুই ধরনের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, যে ধর্মগুলি তাদের উৎপত্তির পূর্বেই পূর্বাভাসযোগ্য এবং যে মূলগত (জড়) স্তর থেকে তারা উৎপত্তি লাভ করেছে, তাদের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য সেইসব ধর্মকে তিনি পরিণামমূলক ধর্ম (resultant property) বলে গণ্য করেছেন। আর অন্যদিকে, উদ্ভূত ধর্ম (emergent property) বলতে তিনি সেইসব ধর্মকে বুঝেছেন যেগুলো অভিনব, নতুন (novel) এবং কোনোভাবেই উৎপত্তির পূর্বে পূর্বাভাসযোগ্য নয় এবং মূলগত স্তরের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্যও নয় (Kim 2008, 141)।

উদ্ভবের এই ধারণার মূল নিহিত আছে মিলের কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্যে, যেখানে মিল 'homopathic causal law' আর 'heteropathic causal law'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন (Mill 1843)। মিল মনে করেন, যান্ত্রিক ঘটনার ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ গতির ক্ষেত্রে) একাধিক কারণ থেকে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাকে তার কারণের সম্মিলিত যোগফলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তা করা যায় না। প্রথমটি মিলের মতে, 'homopathic causal law' আর দ্বিতীয়টি 'heteropathic causal law'। এগুলিই পরবর্তীকালে 'resultant property' এবং 'emergent property' নামে পরিচিত হয়েছে।

উদ্ভূত ধর্মগুলো যেসব মূলগত নিম্নস্তরীয় উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়, সেইসব উপাদানে ঐ উদ্ভূত ধর্মগুলোকে পর্যবসিত করা যায় না, বা এইসব উপাদানের ভিত্তিতে

উদ্ভূত ধর্ম বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব হয় না। পরিণামমূলক ধর্ম ঠিক এর বিপরীত। মূলগত উপাদান, যার থেকে ঐ ধর্মটির সৃষ্টি হয়েছে, সেই উপাদানগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা বিস্তৃত জ্ঞান থাকলেই পরিণামমূলক ধর্ম (resultant property) সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। পরিণামমূলক ধর্মগুলো তাদের মূলগত উপাদানে পর্যবসিত হয়; কিন্তু উদ্ভূত ধর্মগুলো (emergent property) তাদের নিম্নস্তরীয় উপাদানের নিরিখে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এখন, পরিণামমূলক ধর্ম ও উদ্ভূত ধর্মের পার্থক্য থেকে উদ্ভূত ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফূট হয়। উদ্ভূত ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তার অভিনবত্ব (genuine novelty) অর্থাৎ যে ধর্মটি আবির্ভূত হয়েছে, তা উপাদানের ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ নতুন হবে। উদ্ভবতত্ত্বে নতুন বা 'novel' শব্দটি দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবহৃত হয়,– জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) ও আধিবিদ্যক (metaphysical); জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে কোনো ধর্ম নতুন বা অভিনব হওয়ার অর্থ হল, তা পূর্বাভাসযোগ্য নয় (unpredictable)। অর্থাৎ, ব্যক্তির জ্ঞানের সীমায় তা ধরা পড়ে না। নতুন ধর্মটির উদ্ভবের আগে ধর্মটি সম্বন্ধে জ্ঞাতার পক্ষে কোনো ধারণা করাই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় অর্থে, অর্থাৎ আধিবিদ্যক দিক থেকে কোনো ধর্মের নতুনত্বের অর্থ হল আবির্ভাবের সময়, উদ্ভূত ধর্মটি নতুন কোনো কারণতা নিয়ে আসে। অর্থাৎ তার মধ্যে এমন কোনো কার্যক্ষমতা থাকে, যা তার মূলগত স্তরের ধর্মে উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় অর্থে উদ্ভূত ধর্মটি এমন কিছু কারণিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, যা অভিনব, যে উপাদান থেকে তার সৃষ্টি, সেই উপাদানে তেমন কোনো ক্ষমতা কখনোই ছিল না; নতুন ধর্মটি এমন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা জগতে নতুন সৃজনশীলতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় অর্থটি যে অনেক বেশী জোরালো চিন্তার সূচনা করে, তাতে কোনো সংশয় নেই।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মনে করেন, উদ্ভূত ধর্ম সবসময়ই তার মূলগত ধর্ম নির্ভর। ব্রিটিশ উদ্ভবতাত্ত্বিকরা না বললেও সমকালীন উদ্ভবতাত্ত্বিকরা সে কারণেই উদ্ভবের ধারণার সঙ্গে প্রনির্ভরতার ধারণার যে অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, তা স্বীকার করেন, এবং কোনো না কোনো ধরনের প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ মেনে চলেন। উদ্ভূত ধর্ম ও পরিণামমূলক ধর্মের মধ্যে প্রনির্ভরতার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশী পার্থক্য আছে বলে কিম মনে করেন না। কারণ তাঁর মতে, মূলগত আণবিক স্তর থেকেই উভয় ধর্মের উৎপত্তি হয় এবং সেই অর্থে উদ্ভূত ধর্ম ও পরিণামমূলক ধর্ম — উভয়ই তাদের মূলগত আণবিক স্তর প্রনির্ভর (Kim 2008, 141)।

উদ্ভূত ধর্ম তার মূলগত ধর্ম প্রনির্ভর হলেও, সব প্রনির্ভরতার স্থলই কিন্তু উদ্ভবের স্থল নয়। উদ্ভূত ধর্মের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল তার পূর্বাভাসহীনতা। অর্থাৎ মূলগত যে ধর্ম সমাহার থেকে তার উৎপত্তি সেই ধর্মসমাহারের ভিত্তিতে তার উৎপত্তির পূর্বে, তার সম্বন্ধে কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সব প্রনির্ভর ধর্মই যে এমন হবে, তা বলা যায় না। পরিণামমূলক ধর্মও তার মূলগত ধর্মসমাহার প্রনির্ভর কিন্তু তা পূর্বাভাসযোগ্য। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্ভবের ধারণা প্রনির্ভরতার ধারণাকে সূচীত করলেও, প্রনির্ভরতার দৃষ্টান্ত মাত্রেই উদ্ভবের দৃষ্টান্ত নয়।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। রবার্ট ভ্যান গুলিক (Robert Van Gullick) তাঁর 'Reduction, Emergence and Other Recent Options on the Mind/Body Problem : A Philosophic Overview' প্রবন্ধে উদ্ভবের ধারণাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন – Specific value emergence, Modest kind of emergence, ও Radical kind of emergence (VanGullick 2001)।

নির্দিষ্ট মূল্যগত উদ্ভব (Specific value emergence) : সমগ্র এবং তার অংশ সবসময়ই বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একই ধরনের হয় যদিও হয়তো তাদের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও থাকে। যেমন, একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি বা স্থাপত্যের একটি সুনির্দিষ্ট ভর বা ওজন থাকে। তেমনই যেসব অণু-পরমাণু দিয়ে ঐ মূর্তিটি নির্মিত বা গঠিত হয়েছে তাদেরও ভর বা ওজন থাকে। কিন্তু সমগ্র স্থাপত্যটির ওজন আর তার অংশের ওজন কখনোই সমান হয় না। অর্থাৎ সমগ্রের বৈশিষ্ট্য আর অংশের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। দার্শনিক কিম তাঁর 'Being Realistic about Emergence' (2006) প্রবন্ধে ভ্যানগুলিককৃত এই বিভাজনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সমগ্র এবং অংশ— উভয়ই নির্দিষ্ট ব্যবর্তক ধর্মের (determinable property) অধিকারী। সমগ্র এবং অংশ উভয়েরই ভর বা ওজন আছে, একই ধরনের ব্যবর্তক ধর্ম থাকলেও, সমগ্রের একটি সুনির্দিষ্ট ভর আছে যা তার কোনো অংশের ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকে না। কিম মনে করেছেন, এই ধরনের উদ্ভবের সম্বন্ধে কেউই আগ্রহী হবেন না।

পরিমিত উদ্ভব (Modest kind of emergence) : সমগ্রের ধর্ম তার অংশের ধর্মের থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। যেমন, একটি কাপড় বেগুনি রঙের হলেও যে সব অণু-পরমাণু দিয়ে ঐ কাপড়টির উপরের অংশটি গঠিত, সেগুলি বেগুনি নাও হতে পারে। অথবা বলা যায় যে, একটি ইঁদুর জীবিত হলেও তার কোনো দেহাংশই জীবিত নয়। এই দৃষ্টান্তগুলি প্রথাগতভাবে উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত। কিম অভিযোগ করেছেন যে, কীভাবে একটি কাপড়ে বেগুনি রঙটি উদ্ভূত হল, তা ভ্যানগুলিক ব্যাখ্যা করেননি। কিম আরও মনে করেছেন যে, উদ্ভূত ধর্মকে যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে অনেক ধর্মকেই উদ্ভূত ধর্ম হিসেবে গণ্য করতে হবে। যেমন, আমার টেবিলের উপর যে

কলমটি আছে, তাতে কলমত্ব ধর্ম বর্তমান, যদিও তার কোনো অংশেই ঐ ধর্মটি নেই। কিমের যুক্তি থেকে মনে হয় যে, তিনি এইধরনের দৃষ্টান্তকে উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করতে চাননি। তাঁর সম্ভবত মনে হয়েছে যে, এভাবে উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করলে, যে কোনো যৌগিক পদার্থের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যকেই উদ্ভূত ধর্ম হিসেবে গণ্য করতে হবে।

চরম উদ্ভব (Radical kind of emergence) : এই ধরনের উদ্ভবের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে ভ্যানগুলিক মনে করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ১) সমগ্রের ধর্ম তার অংশের ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে; ২) সমগ্রের ধর্মের প্রকৃতি বা অস্তিত্ব কোনোভাবেই তার অংশের ধর্মের থেকে কখনোই অনিবার্যভাবে নিঃসৃত (necessitated) হয় না, এবং সমগ্রের প্রকৃতি বা অস্তিত্ব তার অংশের সংগঠনের দ্বারা কোনোভাবে নিয়ন্ত্রিত (govern) হয় না, অর্থাৎ সেখানে কোনো বিধিসম্মত পৌর্বাপর্য (law like regularities) কাজ করে না। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির জন্যই এই চরম উদ্ভব বাকি দুধরনের উদ্ভবের প্রকারের থেকে স্বতন্ত্র। সমগ্রের ধর্ম যেহেতু তার সাংগঠনিক ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না বা যেহেতু সেখানে কোনো নিয়ম নির্ভরতা (law like regularities) থাকবে না, তাই কিম মনে করেছেন যে, "... an emergent property of this kind does not 'supervene' on the micro structure of an object." (Kim 2006, 192)। কিম আশঙ্কা করেছেন যে, এই তত্ত্ব মেনে নিলে, এমন হতেই পারে যে, এক জাতীয় উপাদানের সংমিশ্রণে দুটি সমগ্র গঠন করা হল, যারা গঠনগত দিক থেকেও অভিন্ন, কিন্তু সেই সমগ্র দুটির ধর্ম ভিন্ন হল। অর্থাৎ, নিম্নস্তরীয় ধর্ম এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চস্তরীয় ধর্মের মধ্যে ভেদ দেখা দিল। কিম মনে করেছেন যে, এই তত্ত্ব মেনে নিলে বলতে হবে যে, অণু-পরমাণু এবং তাদের গঠন এক হওয়া সত্ত্বেও সেই গঠনের

ভিত্তিতে গঠিত একটি ইঁদুর জীবিত এবং অন্যটি জড় হতে পারে। এই ধরনের দৃষ্টান্তকে আদৌ উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে কিম সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এই তত্ত্ব যে শুধুমাত্র আণবিক ভৌতবাদের (atomistic physicalism) নীতিকে অস্বীকার করে, তাই নয়, এই চিন্তার মূল সমস্যা হল, এটি উদ্ভবতত্ত্বের মূল নীতিকেই বিঘ্নিত করে। উদ্ভবতত্ত্ব মনে করে যে, উদ্ভূত ধর্ম সবসময়ই অবনির্ভর ধর্মের উপর প্রনির্ভর। কিন্তু ভ্যানগুলিকের চরম উদ্ভব প্রনির্ভরতার নীতিকেই অগ্রাহ্য করে। কিম এ প্রসঙ্গে সি. ডি. ব্রডের (C. D. Braod) একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন, — "No doubt the properties of silver chloride are completely determined by those of silver and of chlorine." (Broad 1925, 65)। মানস দশার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে বলে কিম মনে করেন, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা অভিন্ন হলে মানস দশা ভিন্ন হতে পারবে না। স্নায়ুতান্ত্রিক দশার পরিবর্তন না হলে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা অভিন্ন থাকলে, মানস দশার পার্থক্য ঘটার কোনো কারণই থাকতে পারে না বলে কিম মনে করেছেন। যদি এমন দেখা যায় যে, ব্যথার (মানস দশা) সঙ্গে বিশেষ স্নায়ুতান্ত্রিক দশার সম্বন্ধ আকস্মিক, নিয়ত সংযুক্ত নয়, তাহলে ঐ স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে ব্যথার উদ্ভব হয়, একথা বলার কোনো অর্থই হয় না। এক্ষেত্রে কিমের মতে, বরং বলতে হবে যে, বিজ্ঞান এখনো ব্যথার কারণ অনুসন্ধাণ করতে পারেনি। ফলে, ভ্যানগুলিকের চরম উদ্ভবকে আদৌ উদ্ভবের প্রকার হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে কিম সন্দিহান।

ভৌতবাদীরা 'specific value emergence' এবং 'modest kind of emergence'-কে বিনা প্রশ্নে মেনে নিলেও এগুলোর থেকেও চরমপন্থী কোনো উদ্ভব সম্ভব হতে পারে

বলে তাঁরা মানতে চাইবেন না। কারণ, তা মেনে নিলে অর্থাৎ radical kind emergence-এর মতো কোনো চরমপন্থী উদ্ভবকে মেনে নিলে, ভৌতবাদীদের স্বীকার করতে হবে যে, এই জগতে এমন ধর্ম আছে যা কোনো জটিল তন্ত্র বা স্তরের সঙ্গে সম্বদ্ধ, অথচ তা তার নিম্নস্তরীয় উপাদান অংশের দ্বারা অথবা, তাদের ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মূলধারার ভৌতবাদ আণবিক গঠনের ধারণাকে সমর্থন করে। এই ধারণা অনুসারে, কোনো তন্ত্রের নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠন এবং তাদের আন্তর্বিন্যাস (distribution) যদি সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তার উচ্চস্তরীয় ধর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার নিম্নস্তরীয় আণবিক গঠন পর্যাপ্ত বলেই বিবেচিত হয়। এর জন্য কোনো অতিরিক্ত নিয়ম বা নিয়মসদৃশ পৌর্বাপর্যের (law like regularities) আবশ্যকতা নেই। অর্থাৎ এই তত্ত্বে সব সময়ই মনে করা হয় যে, নিম্নস্তরীয় সংগঠন উচ্চস্তরের গঠনকে আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা bottom-up determination নামে পরিচিত। তবে, ভৌত জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যাকে আরো সুনিপুণ করার উদ্দেশ্যে আণবিক তত্ত্ব বা আণবিক গঠনের দ্বারা সমগ্র তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বকে বর্জন করা সম্ভব কিনা, সেই প্রশ্ন করা যেতেই পারে। মূলধারার ভৌতবাদী তত্ত্বের সঙ্গে এই চিন্তার বহু পার্থক্য থাকলেও, এই চিন্তা সামগ্রিকভাবে জগতের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উপযোগী হবে বলেই মনে হয়।

ডেভিড চামার্স (David J. Chalmers) আবার উদ্ভবকে দুভাগে ভাগ করেছেন – দুর্বল উদ্ভব (weak emergence) ও সবল উদ্ভব (strong emergence)। চামার্স তাঁর 'Strong and Weak Emergence' প্রবন্ধে (Chalmers 2006) বলেছেন যে, উদ্ভব বলতে অনেক সময়ই কোনো তন্ত্রের এমন একধরনের ধর্মের কথা বলা হয় যাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে

যা তাঁর নিম্নস্তরে (বা যে অংশ দিয়ে ঐ তন্ত্রটি গঠিত, তাতে) উপস্থিত নেই। এখন, চামার্সের মতে, এভাবে উদ্ভবকে বুঝলে তাসের বান্ডিলকেও (pack of cards) উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করতে হয়। কারণ, যে তাসগুলি দিয়ে ঐ বান্ডিলটি তৈরি, তাদের কারোর মধ্যেই বান্ডিলের ধর্মটি নেই। ঠিক যে কারণে কিম কলমত্বকে উদ্ভূত ধর্মরূপে গণ্য করতে চাননি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এগুলিকে উদ্ভবের স্থল হিসেবেই দেখতে হয়, কিন্তু চামার্স মনে করেন যে, দার্শনিক আলোচনায় এই ধরনের উদ্ভব প্রাসঙ্গিক নয়। চামার্সের মতে, একটি উচ্চস্তরীয় দশা, তার নিম্নস্তরীয় দশার নিরিখে দুর্বলভাবে উদ্ভূত হিসেবে তখনই গণ্য হবে, যখন নিম্নস্তরীয় দশা থেকে উচ্চস্তরীয় দশাটি উৎপন্ন হবে, কিন্তু ঐ নতুন উৎপন্ন হওয়া দশা সংক্রান্ত কোনো তথ্য নিম্নস্তরীয় ঘটনা বা দশার ভিত্তিতে পূর্বাভাসযোগ্য হবে না, বা আরও ভালোভাবে বলা যায়, নিম্নস্তরীয় ঘটনা যে নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তার সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকলেও তার ভিত্তিতে উচ্চস্তর সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সম্ভব হয় না। যেমন, তিনি জীবজগতের বিবর্তনের উদাহরণ দিয়েছেন। মানুষের বুদ্ধি তাঁর জিনগত বিবর্তন, অর্থাৎ জিনের গঠন বা মিউটেশনেরই পরিণাম। কিন্তু মানুষের জিনগত বিবর্তন বা জিনের গঠনের থেকে যে, বুদ্ধিবৃত্তি, যৌক্তিকতা বা এইধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে, তা কখনোই পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না।

অন্যদিকে, সবল উদ্ভব (strong emergent) বলতে চামার্স এমন ঘটনার কথা বুঝেছেন যা তার নিম্নস্তরীয় ঘটনার থেকে কোনোভাবেই নিঃসৃত হয় না, নিম্নস্তরের অণু-পরমাণুর সমগ্র বিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থেকেও দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে তাকে অনুমান করা সম্ভব হয় না, পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নীতি থেকেই তা নিঃসৃত হয় না।

তাই তিনি মনে করেছেন যে, যদি সত্যিই এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায়, যা পদার্থবিজ্ঞানের জগতের নিরিখে সবলভাবে উদ্ভূত, অর্থাৎ যেখানে উচ্চস্তরীয় ঘটনা নিম্নস্তর থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উচ্চস্তরীয় ঘটনা নীতিগতভাবে তার নিম্নস্তরের নীতির ভিত্তিতে অনুমানযোগ্য (deducible) নয়, তাহলে সেই ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য জগত বিষয়ক ধারণাকে আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, জীবতন্ত্র যদিও জটিল একটি উদ্ভব, কিন্তু তা পদার্থবিজ্ঞানের নীতিকে বিঘ্নিত করে না। পদার্থবিজ্ঞানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি জীবতন্ত্রের দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রূপে স্বীকৃতি দেয়। চামার্স মনে করেন, যদি এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় যা পদার্থবিজ্ঞানের নীতির ভিত্তিতে অনুমানযোগ্য নয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞান প্রদত্ত নীতির অতিরিক্ত নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য (Chalmers 2006)।

চামার্স মনে করেছেন, জগতে কেবলমাত্র একটি ঘটনাই সবলভাবে উদ্ভূত ধর্ম রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য, তা হল—চেতনা। তাঁর মতে, চেতনা যে পদার্থবিজ্ঞানের নীতির ভিত্তিতে অনুমানযোগ্য নয়, তা মানার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি এ বিষয়ে দুটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, এমন একজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করা যায় যিনি আলোকতরঙ্গ বিষয়ক বিজ্ঞানী এবং মানব মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও তিনি সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ। আলোকতরঙ্গ মানব মস্তিষ্কে কীভাবে প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে তিনি জ্ঞানবান হলেও লাল রঙের চেতন অভিজ্ঞতার অধিকারী তিনি কখনোই হতে পারেন না। জন্মান্ধ হবার কারণে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাল রঙ কোনোদিনই দেখতে পাননি, তাই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকলেও চেতন অনুভব নেই। দ্বিতীয়তঃ, যৌক্তিকভাবে আমরা এমন কল্পনা করতেই পারি যে, আমাদের

জগতের মতো অবিকল অন্য একটি জগত আছে, অর্থাৎ ভৌত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুটি জগতই সম্পূর্ণ অভিন্ন হলেও মানস জগতের নিরিখে তারা ভিন্ন। অর্থাৎ, ঐ দ্বিতীয় জগতটি ভৌত বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আমাদের জগতের সঙ্গে অভিন্ন হলেও, দ্বিতীয় জগতটি হয়তো চেতনাহীন।

চামার্স চেতনাকে সবল উদ্ভবের দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করলেও চেতনার মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা প্রনির্ভরতা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে, চেতনা মস্তিষ্ক (ভৌত জগত) প্রনির্ভর হলেও, মনে রাখতে হবে যে, এই প্রনির্ভরতা প্রাকৃতিক নিয়ম নির্ভর। আমাদের জগতের ক্ষেত্রে যদি মনে করা হয় যে মানস বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে ভৌত বৈশিষ্ট্য নির্ভর, অর্থাৎ ভৌতগঠন অভিন্ন হলে মানস গঠন ভিন্ন হতে পারবে না, তাহলেও এই দাবী যে সব সম্ভাব্য জগতের (possible world) ক্ষেত্রেই সত্যি হবে, এমন কথা বলা যায় না। এর থেকে মনে হয় যে, ভৌত জগত ও চেতন জগতের সম্বন্ধ পদার্থবিজ্ঞানের নীতির দ্বারা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং অতিরিক্ত কিছুর দাবী এখানে ন্যায্য বলেই মনে হয়। ভৌত প্রক্রিয়া ও চেতন জগতের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যার জন্য চেতন-ভৌত নীতির (psycho-physical law) প্রয়োজন (Chalmers 2006, 247)।

চামার্সের সবল উদ্ভবের এই তত্ত্ব যে ভৌতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাতে কোনো সংশয় নেই। চেতনা যদি সত্যিই চরম বা সবল উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হয়, যা পদার্থবিজ্ঞানের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়, বা তার থেকে অনুমানযোগ্য নয় তাহলে ভৌতবাদের ভিত্তি অবশ্যই নড়ে যায়। জড়জগতের সম্পূর্ণতার নীতিটিই এর দ্বারা বিঘ্নিত হয়ে যায়। তবে, এক্ষেত্রে কেউ বলতেই পারেন যে, চেতনাকে ভৌত জগতের অতিরিক্ত একটি বিষয় হিসেবে তখনই গণ্য করা যাবে যদি দেখানো যায় যে, চেতনা ভৌত জগত থেকে

স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকার অধিকারী। কোনো ধর্ম, তা সে যে স্তরেরই হোক না কেন, তার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য কার্যোৎপাদন সামর্থ্যের প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ কোনো একটি ধর্মের বর্ণনার ক্ষেত্রে ধর্মটি এই জগতে কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে কিনা, তা উল্লেখ করা আবশ্যিক। এই প্রশ্নটিকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। উদ্ভূত ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই তাই এই প্রশ্নটি আসে—উন্মেষের পর নতুন উদ্ভূত ধর্মগুলি কী কারণিক ভূমিকা পালন করে? যদি বলা হয় যে, তাদের কোনো কারণিক ভূমিকা থাকে না, তাহলে তারা উপবস্তুতে পর্যবসিত হয়। উদ্ভবতত্ত্বের সমর্থকরা উদ্ভূত ধর্মের কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, উদ্ভূত ধর্মগুলি স্বতন্ত্র কারণিক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁরা দাবী করেন যে, উদ্ভূত ধর্মগুলি তাদের মূলগত নিম্নস্তরীয় ভৌত ধর্মের থেকে স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। উদ্ভূত ধর্মের কার্যক্ষমতা কোনোভাবেই তার মূলগত উপাদান কারণের কার্যক্ষমতায় পর্যবসিত হয় না।

কিম তাঁর 'Making Sense of Emergence' প্রবন্ধে উদ্ভূত ধর্মের কারণিক ভূমিকার (the causal efficacy of emergence) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "Emergent properties have causal powers of their own – novel causal powers irreducible to the causal powers of their basal constituents." (Kim 2008, 142)। উদ্ভূততত্ত্বের মতো কার্যকারণ তত্ত্বেও স্তরভেদ স্বীকৃত। এই স্তরভেদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্বন্ধকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১) সমস্তরীয় কারণতা (same level causation), ২) নিম্নমুখী কারণতা (downward causation), ৩)ঊর্ধ্বমুখী কারণতা (upward causation)। সমস্তরীয় কারণতা হল যেখানে একই স্তরে অবস্থিত দুটি ধর্মের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হয়।

এক্ষেত্রে দুটি সমস্তরে অবস্থিত ধর্মের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হয়, যেমন, একটা উদ্ভূত ধর্ম যখন অন্য একটি উদ্ভূত ধর্মের কারণ হয়, তখন তাকে সমস্তরীয় কারণতা বা 'same level causation' বলেই গণ্য করা হয়। আবার, কোনো একটি ভৌত ঘটনা যদি অন্য একটি ভৌত ঘটনার কারণ হয়, তাহলেও ঐ দুটি ঘটনার পারস্পরিক কারণিক সম্বন্ধ সমস্তরীয় কারণতার সম্বন্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিম্নমুখী কারণতা বা 'downward causation' বলতে সেইসব ক্ষেত্রকে বোঝানো হয়, যখন কোনো উচ্চস্তরীয় ধর্ম (যা উদ্ভূত ধর্মও হতে পারে) নিম্নস্তরীয় ধর্মের কারণ হয়। যেমন, কোনো মানস ঘটনা যদি কোনো ভৌত ঘটনার কারণ হয় অর্থাৎ মানস ঘটনা থেকে যদি ভৌত ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহলে তা নিম্নমুখী কারণতার স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে। একইভাবে, ঊর্ধমুখী কারণতা বা 'upward causation'-এর ক্ষেত্রে নিম্নস্তরীয় ধর্ম, উচ্চস্তরীয় ধর্মকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে। ভৌত ঘটনার কারণে যদি মানস জগতে কোনো পরিবর্তন ঘটে, তাহলে তা ঊর্ধ্বমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হবে। উদ্ভূততত্ত্বের সমর্থকরা এই তিনপ্রকার কার্যকারণের মধ্যে নিম্নমুখী কারণতাকেই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন (Kim 2008, 142)।

উদ্ভবতত্ত্ব অনুসারে উদ্ভূত ধর্মের আবির্ভাব এই জগতে এক অভিনব পরিবর্তন ঘটায়। পৃথিবীর ইতিহাসে, তার বিবর্তনের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের সূচনা হয়। এখন, এই নতুন উদ্ভূত ধর্মের নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কার্যশক্তি (causal power) থাকবে। এই নতুন উদ্ভূত ধর্মগুলি সত্তার জগতে নতুন সংযোজন হিসেবে তখনই গণ্য হবে কেবলমাত্র যদি তাদের প্রকৃত নতুন কার্যশক্তি থাকে, অর্থাৎ তাদের যদি এমন কোনো নতুন কার্যশক্তি থাকে যা তার উপাদান (নিম্নস্তরীয় মূলগত উপাদান) কারণ — যার

থেকে তার উদ্ভব হয়েছে, তার কার্যশক্তির থেকেও ভিন্ন বা অতিরিক্ত হয়। ফলে, উচ্চস্তরীয় উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করার অর্থ হল, তার কারণিক ভূমিকা স্বীকার করা। উচ্চস্তরীয় ধর্ম দুভাবে তার কারণিক ভূমিকা পালন করতে পারে — তার সমান স্তরে, অথবা তার নিম্নস্তরে। অর্থাৎ, উচ্চস্তরীয় একটি ঘটনা তার সমান স্তরের কোনো একটি ঘটনার কারণ হতে পারে, অথবা তার নিম্নস্তরের কোনো একটি ঘটনার কারণ হতে পারে। এখন, চামার্সের কথা মতো, চেতনাই যদি একমাত্র উদ্ভূত ধর্ম হয়, তাহলে চেতনার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে বলা যায় যে, চেতনা বা কোনো মানস দশা থেকে অন্য একটি মানস দশা উৎপন্ন হতে পারে যা সমস্তরীয় কারণতার স্থল হিসেবে গণ্য হবে। আবার, মানস দশা থেকে ভৌত দশা উৎপন্ন হতে পারে, যা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হবে। এখন, আমরা যদি উদ্ভূত ধর্ম ও তার নিম্নস্তরীয় ভৌত ধর্মের মধ্যে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করি, তাহলে মানতে হবে যে, মানস দশা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা প্রনির্ভর। অর্থাৎ ভৌত জগতে কোনো পরিবর্তন না হলে মানস জগতে পরিবর্তন হতে পারে না। ফলে, মানস দশা থেকে যখন অন্য একটি মানস দশা উৎপন্ন হয় (সমস্তরীয় কারণতা) তখন তার জন্য দ্বিতীয় মানস দশাটি (যা অবশ্যই প্রনির্ভরতার নিয়ম অনুসারে কোনো একটি ভৌত দশা প্রনির্ভর) যে ভৌত দশার উপর প্রনির্ভর, সেই ভৌত দশাটির পরিবর্তন ঘটা আবশ্যিক। প্রনির্ভরতার নিয়ম অনুসারে যেহেতু মানস জগতে তখনই পরিবর্তন ঘটে, যখন ভৌত জগতে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং, মানস দশা থেকে অন্য একটি মানস দশা তখনই উৎপন্ন হতে পারে, যদি প্রথম মানস দশাটি ভৌত জগতে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে। অর্থাৎ নিম্নস্তরে (ভৌত

স্তরে) পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানস দশার পক্ষে সমস্তরে পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। তাই উদ্ভবতাত্ত্বিকরা উদ্ভূত ধর্মের নিম্নমুখী কারণতা প্রতিষ্ঠা করতেই বেশি আগ্রহী।

নিম্নমুখী কারণতার বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায় ডোনাল্ড ক্যাম্পবেলের 'Downward Causation in Hierarchically Organized Biological System' প্রবন্ধে (Campbell 2013)। ক্যাম্পবেল জীববিজ্ঞানের জগত থেকে সরাসরি দৃষ্টান্ত নিয়ে নিম্নমুখী কারণতার ধারণাটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন জীব, জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। তার মধ্যে যে পদ্ধতিটি সফল হয় (আকস্মিকভাবেই হয়), সেই পদ্ধতি অনুযায়ী জৈবিক গঠনকে ধরে রাখার জন্য নিম্নস্তরীয় গঠনগত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে ওই প্রক্রিয়াটি পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে না যায় (Campbell 2013, 145)। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার উপযোগী জৈবিক গঠনকে অপরিবর্তিত রাখার লক্ষ্যে উচ্চস্তরীয় চাহিদা নিম্নস্তরীয় আণবিক (DNA) গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উইপোকা বা পিঁপড়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি বুঝিয়েছেন। উইপোকা বা পিঁপড়ের চোয়ালের জোর সাংঘাতিক, যার সাহায্যে উইপোকা কাঠ বা দেয়ালে ছিদ্র করতে সক্ষম হয়। চোয়ালের ক্রিয়াশীলতার পিছনে যে যান্ত্রিক গতি কাজ করে তা মূলতঃ নির্ভর করে চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত মাংসপেশী এবং কব্জা জাতীয় যান্ত্রিকতার মাধ্যমে। তাদের চোয়ালের গঠন এমনভাবেই তৈরি যাতে তারা সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগে সমর্থ হয়। ক্যাম্পবেলের মতে, সমস্ত রকম উপযোগী উপকরণের সাহায্যেও আধুনিক কোনো প্রযুক্তিবিদই এর থেকে উন্নততর কোনো চোয়ালের গঠনের নকশা (design) বানাতে পারবেন না। চোয়ালের কার্যকারিতা অবশ্যই আর্কিমিডিসের 'law of liver'-কে মেনে চলে। চোয়ালের গঠনের

ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের (অণু-পরমাণুর মিশ্রণের) নিয়ন্ত্রণের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই চোয়ালের নিম্নস্তরীয় প্রোটিন গঠিত হয়, যে প্রোটিন চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত মাংসপেশী গঠনে সহায়তা করে। বিবর্তনের তত্ত্বে মনে করা হয় যে, জীবন সংগ্রামে সঠিক নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবর্তনের একটি স্তরে জৈবতন্ত্রের নির্বাচনও চোয়ালের ক্রিয়াশীলতাকে ব্যাপকতর করে। এই নির্বাচন তাদের জীবন সংগ্রামকে সহজ করে, বেঁচে থাকার যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে। উইপোকার জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য তাদের চোয়াল শক্ত হওয়া প্রয়োজন, আর চোয়াল শক্ত হয় তার পেশির শক্তির দ্বারা। পেশি গঠনের ক্ষেত্রে প্রোটিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখন, প্রোটিনের বিন্যাসের উপর পেশির গঠন নির্ভর করে, আর প্রোটিনের বিন্যাস কেমন হবে তা নির্ভর করে DNA-র ওপর। ক্যাম্পবেল এক্ষেত্রে মনে করেছেন যে, DNA-র দ্বারা প্রোটিনের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং প্রোটিনের কার্যকারিতার দ্বারাই DNA-র কোন অংশটি (DNA template) সেখানে কার্যকরী হবে তা নির্ধারিত হয়। ফলে, এটি অবশ্যই ক্যাম্পবেলের মতে একটি নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত।

ক্যাম্পবেল এ প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উইপোকাদের মধ্যে কিছু উইপোকা থাকে যারা সৈনিকের কাজ করে, তাদের চোয়াল কেবলমাত্র শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য বা শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্যই গঠিত হয়। ঐ চোয়ালের সাহায্যে তারা নিজেদের খাবারও খেতে পারে না। অন্য উইপোকারা তখন তাদের খাইয়ে দেয়। ক্যাম্পবেল মনে করেছেন, তাদের সামাজিক গঠন, তাদের সামাজিক স্তরভেদ এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাখ্যার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। শ্রম বিভাজনের সামাজিক বিধি

বিবর্তনের ধারায় নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, যা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

এই দুটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, উচ্চস্তরীয় ধর্ম নিম্নস্তরীয় ধর্মকে বা উচ্চস্তরীয় ঘটনা নিম্নস্তরীয় ঘটনাকে প্রভাবিত করছে। প্রথম দৃষ্টান্তে আমরা দেখলাম ক্যাম্পবেল দাবি করছেন, DNA-র দ্বারা প্রোটিনের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং প্রোটিনের বিন্যাসই DNA-র কোন 'template'-টি কার্যকরী হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেহ DNA-র দ্বারা গঠিত। জিন বা DNA-ই আমাদের দেহের মূল উপাদান। সেই মূল উপাদান আবার তার উচ্চস্তরীয় (তার দ্বারাই গঠিত) প্রোটিন বিন্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে, এটিকে অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করতে হয়। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও আমরা দেখলাম যে, উইপোকাদের শ্রমবিভাজনের সামাজিক বিধি যা অবশ্যই একটি উচ্চস্তরীয় ঘটনা, তা বিবর্তনের ধারায় নিম্নস্তরীয় নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

এখন, এই নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধ বিষয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করতেই পারেন। ডারউইনের তত্ত্বে এমন কোনো নিম্নমুখী কারণতার ধারণা নেই। বিবর্তনের গতিধারায় কোনো কোনো প্রাণী জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করেছে, আর বাকিরা বিবর্তনের পথে হারিয়ে গেছে। জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অভ্যাস যে প্রাণী আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে-ই পৃথিবীতে থেকে গেছে, অন্যরা হারিয়ে গেছে। এই আয়ত্ত করার পদ্ধতি নিয়েই মতভেদ তৈরি হয়। এই পদ্ধতি কি নিছকই

যান্ত্রিক? আকস্মিক? নাকি এই নির্বাচনের মধ্যে জীবের নিজস্ব কোনো ভূমিকা আছে? এই বিষয়ে আমরা পরে বিশদে আলোচনা করব।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মনে করেন, চেতনা বা প্রাণকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যিক। মর্গান (L. Morgan) বা স্পেরীর (R. Sperry) মতো (Kim 2008, 151) উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মনে করেন, প্রাণ বা চেতনার মতো উদ্ভূত ধর্মগুলো যথাক্রমে জড়-রাসায়নিক এবং স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্মাবলি থেকে উদ্ভূত হলেও তাদের নিজস্ব কার্যশক্তি আছে এবং শুধু তাই নয়, তাদের কার্যশক্তি অর্থাৎ যে স্তর থেকে তারা উদ্ভূত হয়েছে, সেই নিম্নস্তরকেও প্রভাবিত করে। উচ্চস্তরের কার্যশক্তি নিম্নস্তরের ঘটনা প্রবাহকে কিছু অর্থে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ এর থেকে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, উচ্চস্তরেরও এমন কার্যক্ষমতা আছে, যা নিম্নস্তরের কার্যক্ষমতাকে পরিবর্তিত করতে পারে; অর্থাৎ জড় নিয়মানুসারে, নিম্নস্তরের ভৌতজগৎ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হবার কথা, উচ্চস্তরের প্রভাবে তার পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভৌতবাদীরা এক্ষেত্রে খুব বেশি আপত্তি করবেন না, যদি উচ্চস্তরের কার্যক্ষমতা নিম্নস্তরের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু না হয়। উচ্চস্তরের কার্যক্ষমতা যদি নিম্নস্তরে পর্যাবসানযোগ্য হয়, তাহলে দুটি স্তরের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করতে ভৌতবাদীরা আপত্তি করবেন না। সার্ল যে কারণে উচ্চস্তরীয় ধর্মের কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করেছিলেন। বিজ্ঞানসম্মত ভৌতবাদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তিনি উচ্চস্তরীয় ধর্মের ক্ষেত্রে নিম্নস্তরীয় ধর্মের অতিরিক্ত কোনো কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু মানস কারণতা ব্যাখ্যা করতে হলে মানস জগতের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। এই কারণেই মানস কারণতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মনোদর্শনের জগতে

ভৌতবাদীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। মানস দশাকে যাঁরা ভৌত দশার অতিরিক্ত দশা হিসেবে গণ্য করেন না, অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন, মানস দশা প্রকৃতপক্ষে ভৌত দশারই একটি অনুগত শ্রেণী; বর্ণনার স্তরে বা ব্যাখ্যার স্তরে মানস দশা ও ভৌত দশার মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু সত্তার স্তরে তাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাঁরা পর্যাবসানবাদী (reductionist) নামে পরিচিত। অন্যদিকে, মানস দশার স্বতন্ত্র সত্তা যাঁরা স্বীকার করেন, সত্তাগত দিক থেকে মানস দশার, ভৌত দশা অতিরিক্ত সত্তা আছে বলে মনে করেন, মানস দশা ভৌত দশার ওপর প্রনির্ভর হলেও, কখনোই ভৌত দশায় পর্যাবসানযোগ্য নয় — একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা মনোদর্শনের জগতে অপর্যাবসানবাদী বা 'non-reductive physicalist' নামে খ্যাত। উদ্ভূত ধর্ম মূলগতভাবে নিম্নস্তরীয় ধর্মের উপর প্রনির্ভর হলেও অর্থাৎ, যার থেকে নতুন ধর্মটির উদ্ভব হয়েছে, সেই নিম্নস্তরীয় ধর্মের সঙ্গে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করলেও, উদ্ভূত ধর্ম, যেহেতু তাঁদের মতে, নিম্নস্তরীয় অবনির্ভর ধর্মে পর্যাবসানযোগ্য নয়, তাই এঁরা দর্শনের জগতে অপর্যাবসানবাদী রূপেই চিহ্নিত হন। এখন, মানস কারণতা অর্থাৎ মনের কোনো কার্যক্ষমতা আছে কিনা, তা প্রমাণ করতে অপর্যাবসানবাদী দার্শনিকদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু পর্যাবসানবাদী দার্শনিকদের কোনো সমস্যাই হয় না, কারণ পর্যাবসানবাদীরা মনে করেন যে, মূলগত নিম্নস্তরীয় ভৌত জগতের কারণতার অতিরিক্ত কোনো কারণতা মানস জগতে থাকতে পারে না। কিন্তু উদ্ভবতাত্ত্বিকরা যেহেতু বিশ্বাস করেন যে, মানস জগতের (উদ্ভূত ধর্মের) স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা আছে অর্থাৎ, ভৌত জগত নিরপেক্ষভাবে তারা কার্যক্ষম, তাই মানস কারণতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভবতাত্ত্বিকদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

মানস দশাকে দৈহিক দশায় পর্যবসিত না করে মানস কারণতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা কিম তাঁর 'Being Realistic about Emergence' (Kim, 2006) প্রবন্ধে বিশদে আলোচনা করেছেন। যখন একটি ভৌত ধর্ম (ভ$_{১}$) থেকে একটি মানস ধর্ম (ম$_{১}$) উদ্ভূত হয়, তখন এদের মধ্যে প্রনির্ভরতার সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়। এখন, যদি মনে করা হয় যে, এই মানস ধর্মটি (ম$_{১}$) দ্বিতীয় একটি মানস ধর্মের (ম$_{২}$) কারণ, তাহলে মানতে হবে যে, ঐ দ্বিতীয় মানস ধর্মটিও আবার কোনো না কোনো ভৌত ধর্ম প্রনির্ভর। অর্থাৎ দ্বিতীয় একটি ভৌত ধর্মও (অবনির্ভর) 'ভ$_{২}$' স্বীকার করতে হবে। যেহেতু আমরা প্রনির্ভরতার সূত্র অনুযায়ী জানি যে, ভৌত জগতে পরিবর্তন না হলে মানস জগতে পরিবর্তন হতে পারে না, তাই মানস ধর্ম স্বীকার করলে তার পিছনে অবনির্ভর ধর্ম হিসেবে একটি ভৌত ধর্মের উপস্থিতি অবশ্যস্বীকার্য। উদ্ভবতাত্ত্বিকরা এক্ষেত্রে বলবেন যে, প্রথম মানস ধর্মটির (ম$_{১}$) প্রভাবে ভৌত স্তরে একটি পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ভ$_{২}$ নামক একটি নতুন ভৌত ধর্ম সৃষ্টি হয়, যা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার স্থল হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। এই 'ভ$_{২}$' নামক ভৌত ধর্ম থেকে 'ম$_{২}$' নামক মানস ধর্ম উৎপন্ন হয়। উদ্ভবতাত্ত্বিকরা এভাবে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও কিম দাবী করেন যে, এভাবে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাঁর মতে, যদি একথা মেনেই নেওয়া হয় যে, দ্বিতীয় মানস ধর্মটির উৎপত্তির জন্য একটি ভৌত ধর্মের প্রয়োজন, তাহলে বলা যায় যে, প্রথম ভৌত ধর্ম (ভ$_{১}$) থেকেই দ্বিতীয় ভৌত ধর্ম (ভ$_{২}$) উৎপন্ন হয়েছে। মানস ধর্মকে, ভৌত ধর্মের কারণ রূপে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই ধরনের চিন্তার পিছনে যে চিন্তা কাঠামো কাজ করে, তা হল, পদার্থবিজ্ঞানের কারণিক আবদ্ধায়ণের নীতির (principle of causal closure) ধারণা। কিম

কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “If a physical event has a cause, it has a physical cause. And if a physical event has an explanation, it has a physical explanation.” (Kim 2006, 199)। ভৌতবাদীরা এই নীতিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন, সব ভৌত ঘটনারই ভৌত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। যদি কোনো ভৌত ঘটনার ভৌত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া নাও যায়, তাহলেও তাঁরা কোনোভাবেই কোনো অভৌত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে চাইবেন না। কারণ সেক্ষেত্রে মানতে হবে, পদার্থবিজ্ঞান প্রদত্ত তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ নয়, তা ভৌত জগতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। এতে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তাছাড়া, পদার্থবিজ্ঞানের অধিকাংশ নিয়মই এই কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করে এবং তার থেকেই নিঃসৃত হয়। যেমন, শক্তির নিত্যতা সূত্র (law of conservation of energy) (Papineau 2001)।

কিম মনে করেছেন যে, উদ্ভবতাত্ত্বিকদের যদি মানস কারণতা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে তাদের কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে (principle of causal closure) খণ্ডন করতে হবে, এবং তার সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি দিতে হবে অথবা দেখাতে হবে যে, পর্যাবসানহীন উদ্ভূত ধর্মের নিম্নমুখী কার্যক্ষমতা (downward causal efficacy) আছে, যা কারণিক আবদ্ধায়নের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ, উদ্ভবতাত্ত্বিকদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে— উপবস্তুবাদকে এড়ানোর জন্য মানস ঘটনার কারণিক কার্যক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করা, অথবা ভৌত দশার অতিরিক্ত মানস দশার কোনো কার্যক্ষমতা যে থাকতে পারে না, তা স্বীকার করে নেওয়া। আর তা যদি তাঁরা না করতে চান, তাহলে কারণিক

আবদ্ধায়নের নীতিকে পর্যাপ্ত যুক্তিসহ খণ্ডন করতে হবে, অথবা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কারণিক ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মানস ধর্মকে পর্যাবসানহীন বলে মনে করেন। মানস ধর্ম ও ভৌত ধর্মকে অভিন্ন রূপে স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মানস ধর্ম ও ভৌত ধর্মকে তাঁরা দুটি স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবেই দেখতে চান। কিন্তু একথা বললে একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। ভ$_{১}$ এবং ম$_{১}$ যদি দুটি ভিন্ন ধর্ম হয়, তাহলে ভ$_{২}$-এর দুটি স্বতন্ত্র পর্যাপ্ত কারণ স্বীকার করতে হবে, যা কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণ বা 'causal overdetermination' নামে পরিচিত।

কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণ কার্যকারণ সম্বন্ধের জগতে ত্রুটি হিসেবেই বিবেচিত হয়। মনে করা যাক, একজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে দুজন ব্যক্তি একই সঙ্গে বন্দুক ছুঁড়ল। দুটি বন্দুকের গুলিই একই সময়ে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কে আঘাত করল। এই দুটি আঘাতই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। ঐ দুটি গুলির যে কোনো একটির দ্বারাই তাঁর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু যেহেতু দুটি গুলি একইসঙ্গে ব্যক্তিকে আঘাত করে, ফলে, এক্ষেত্রে ঐ দুটি গুলিকেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর্যাপ্ত কারণ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হিসেবে অতিনিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিতে হবে। এই ধরনের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া কারণের অতিনিয়ন্ত্রণ অনুমোদনযোগ্য নয়। মানস কারণতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণকে মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মানস □ ভৌত (mental to physical) কারণতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল। অর্থাৎ মানতে হবে যে, যখনই কোনো মানস কারণতার ক্ষেত্র হয়, তখনই

আসলে উপরোক্ত ঘটনার মতো কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে। এটি খুব একটা গ্রহণযোগ্য দাবি বলে বিবেচিত হয় না। আর তাছাড়া কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণ মেনে নিলে মানস কারণতার ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায় বলেও ভৌতবাদীরা মনে করেন। কেননা, কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি এবং পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার নীতি মেনে নিলে বলতে হয় যে, একটি ঘটনার মানস এবং ভৌত দুটি কারণ স্বীকার করা অর্থহীন, যেহেতু একটি ঘটনার জন্য একটি ভৌত কারণই পর্যাপ্ত, তাই মানস কারণ উপস্থিত না থাকলেও, শুধুমাত্র ভৌত কারণের দ্বারাই কার্যটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে যা পরিবর্জনের নীতি বা exclusion principle নামে পরিচিত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনো একটা ঘটনার দুই বা ততোধিক পর্যাপ্ত কারণ থাকতে পারে না, যারা একই সময়ে সংঘটিত হয়, যদি না সেটি প্রকৃতই অতিনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র হয়।

এখন উদ্ভূত তত্ত্বের সর্মথকরা যদি কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি এবং পরিবর্জনের নীতিকে মেনে নিয়ে মানস কারণতা ব্যাখ্যা করতে চান, তাহলে তাদের সামনে দুটি পথই খোলা থাকে বলে মনে হয় – (১) মানস ধর্ম ও ভৌত ধর্মের অভিন্নতা স্বীকার করে নেওয়া এবং মানস কারণতা অস্বীকার করা অথবা (২) মানস ধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা। কিন্তু মানস ঘটনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেও যদি মানস কারণতাকে ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহলে তা উপবস্তুবাদে পর্যবসিত হবে। ফলে, উদ্ভবতাত্ত্বিকদের কাছে, উভয় বিকল্পই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে।

উদ্ভবতাত্ত্বিকরা এত সমস্যা সত্ত্বেও মানস কারণতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। দৈহিক ধর্ম ও মানস ধর্মের ভিন্নতা স্বীকার করে, কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণকে এড়িয়ে, কারণিক আবদ্ধায়নের এবং পরিবর্জনের নীতিকে অনুসরণ করেও তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, কারণতার জগতে কেবলমাত্র ভৌত কারণতাই নয়, মানস কারণতারও অস্তিত্ব আছে এবং মানস-ভৌত কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভব। অর্থাৎ ভৌতবাদীদের সব দাবি মেনেই উদ্ভবতাত্ত্বিকরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, নিম্নমুখী মানস-ভৌত কার্যকারণ সম্বন্ধ (mental to physical downward causation) সম্ভব।

এখন, আমরা যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই আলোচনায় ফিরে যাই। সার্ল মানস ধর্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, দ্বৈতবাদী ও ভৌতবাদী চিন্তা বর্জন করে উদ্ভবতত্ত্ব অনুসরণ করে একটি মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন বলেই মনে হয়। সার্ল উদ্ভূত ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, মনে করা যাক, ‘S’ নামক কোনো একটি তন্ত্র a, b, c ... নামক উপাদান দ্বারা গঠিত। এখন, এই ‘S’ যদি কোনো পাথর হয় তাহলে তার ওজন ১০ কেজি হতে পারে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি ‘S’-এর প্রত্যেকটি উপাদানে উপস্থিত থাকে না। সার্ল এই ধর্মটিকে 'system feature' নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে, a, b, c...-এর পৃথকভাবে ১০ কেজি ওজন না থাকলেও, a, b, c... সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা থাকলেই আমরা ধারণা করতে পারি যে, 'S' -এর ওজন ১০ কেজি হবে, অর্থাৎ মূলগত ধর্ম সমাহার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকলে, তার থেকে উৎপন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু সার্ল মনে করেছেন যে, এমন অনেক ধর্ম আছে যাদের সম্বন্ধে কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ, কেবলমাত্র মূলগত উপাদানগুলির সংযোগ ও পরিবেশগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে তাদের সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া

সম্ভব নয়। সার্লের মতে, এই নতুন ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ জানাও আবশ্যিক। তিনি এই প্রকার ধর্মের নাম দিয়েছেন 'causally emergent system features' (Searle 2002, 111-112)। কাঠিন্য, তরলতা, বা স্বচ্ছতার মতো ধর্মগুলি, সার্লের মতে, causally emergent system features-এর আদর্শ উদাহরণ। ঠিক একইভাবে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, চেতনাও একটি causally emergent system feature। কাঠিন্য বা তরলতা মূলগত স্তরের অণু-পরমাণুর থেকে উদ্ভূত হয়; যেমন, জলের তরলতার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলেও, দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেনের পরমাণুর মিলনে যে বস্তুটি উৎপন্ন হবে, তা যে তরল হবে, — সে কথা বলা যায় না। চেতনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। স্নায়ুতন্ত্রের ভৌত গঠন সম্বন্ধে জানা থাকলেই যে চেতনার জ্ঞান নিষ্কাশন করা যাবে — এমন নয়। স্নায়ুতন্ত্রের ভৌত গঠনের জ্ঞান থেকে চেতনা সমন্বিত জ্ঞান কখনোই নিষ্কাশনযোগ্য নয়। অর্থাৎ স্নায়ুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (interaction) সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে চেতনা কখনোই নিষ্কাশনযোগ্য নয় (Searle 2002, 112)।

সার্ল উক্ত উদ্ভূত ধর্মের আলোচনা লক্ষ করলে দেখা যাবে, সার্ল দুধরনের উদ্ভবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন– 'emergent 1' এবং 'emergent 2'। তাঁর মতে, যেসব উদ্ভূত ধর্মের কার্যকারিতা তাদের নিম্নস্তরীয় উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, তাদের 'emergent 1' বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন, উপরে উল্লিখিত প্রতিটি দৃষ্টান্তই সার্লের মতে 'emergent 1' । জলের তরলতা বা স্নায়ুতান্ত্রিক গঠন থেকে চেতনার উদ্ভবকে কখনোই কেবলমাত্র তাদের মূলগত উপাদানের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের

নিরিখে অনুমান করা সম্ভব নয়। ফলে, এগুলিকে সার্ল উদ্ভূত ধর্ম বলেই গণ্য করবেন, যদিও কার্যক্ষমতার নিরিখে মূলগত উপাদানের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো কার্যক্ষমতা এদের থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। অন্যদিকে 'emergent 2' বলতে তিনি সেই সব ধর্মকে বুঝিয়েছেন যারা অবশ্যই 'emergent 1'-এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিন্তু তাদের এমন কার্যক্ষমতা আছে যা তার উপাদানের কার্যক্ষমতার (causal power) অতিরিক্ত। 'Emergent 1' ধর্মগুলির ক্ষেত্রে যেমন তাদের উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (causal interaction) ভিত্তিতে তাদের কার্যক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করা যায়, 'emergent 2'-তে তা করা যায় না (Searle 2002, 112)। 'Emergent 2' ধর্মগুলি তাদের উপাদান কারণ থেকে স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতার অধিকারী, উপাদান কারণের কার্যক্ষমতার নিরিখে কোনোভাবেই 'emergent 2' ধর্মগুলির কার্যক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ সহজ কথায় বললে, 'emergent 1' ধর্মগুলি তাদের উপাদান কারণে কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য (causally reducible) হলেও, 'emergent 2' কখনোই কারণিক দিক থেকে পর্যাবসানযোগ্য নয়।

সার্ল মনে করেন, কোনো ধর্মই 'emergent 2' হতে পারে না, চেতনাও তাঁর মতে 'emergent 1'। যদি চেতনা 'emergent 2' হত, তাহলে চেতনার এমন কিছু কার্যক্ষমতা থাকত, যা তার নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক আচরণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হত না। কিন্তু সার্লের মতে এমন কখনো হয় না। সার্ল দাবি করেছেন যে, এমন কোনো ধর্মের কথা চিন্তাই করা যায় না, যা 'emergent 2' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ তাঁর মতে, যদি এমন কোনো ধর্ম থাকত, তাহলে তা কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধের নীতিকে (principle of transitivity of causation) খণ্ডন করত (Searle 2002, 112)।

এখন, কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধ বলতে কী বোঝায়, তা একটু বুঝে নেওয়া যাক। সাধারণভাবে প্রথাগত কার্যকারণ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, যদি ‘ক’, ‘খ’-এর কারণ হয় এবং ‘খ’, ‘গ’-এর কারণ হয়, তাহলে অবশ্যই বলা যায় যে, ‘ক’, ‘গ’-এর কারণ। মূর্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। নিরক্ষীয় মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাধারণভাবে পূর্বমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়। তবে, প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন নিরক্ষীয় অঞ্চলে যখন হঠাৎ প্রবল বেগে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হয়, তখন নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব অংশের ঠান্ডা জলকে সরিয়ে উষ্ণ জলপ্রবাহ সেই জায়গা দখল করে। এই প্রাকৃতিক ঘটনা এল নিনিও (el nino) নামে পরিচিত। এল নিনিও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে হয়, যা মূলত শুষ্ক জলবায়ুর কারণে খরাপ্রবণ। কিন্তু এল নিনোর প্রভাবে সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং খরাপ্রবণ জমি শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে।

এই প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কারণিক শৃঙ্খলাটি খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। নানা প্রাকৃতিক কারণে এল নিনিও সৃষ্টি হয়। তার জন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়, অর্থাৎ এল নিনিও হল বৃষ্টিপাতের কারণ এবং বৃষ্টিপাতের ফল হল শস্য-শ্যামল তৃণভূমি। সুতরাং, কার্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধ (transitivity of causation) মেনে বলা যায় যে, এল নিনিও হল শস্যশ্যামল তৃণভূমির কারণ।

সার্ল মনে করেছেন যে, উদ্ভূত ধর্মগুলি (অবশ্যই emergent 1, যেমন কাঠিন্য বা তরলতা) যে উপাদান কারণের থেকে উৎপন্ন হয় তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধের দ্বারা অবশ্যই ব্যাখ্যাযোগ্য হবে। দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও একটি অক্সিজেনের

পরমাণুর মিলনে যে যৌগটি উৎপন্ন হবে, সেটি যে তরল হবে, তা উৎপন্ন হবার আগে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তরলতা নামক বৈশিষ্ট্যটি সার্লের মতে উদ্ভূত। কিন্তু এই তরলতার কার্যক্ষমতা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিরিখে ব্যাখ্যাত হতে পারে বলে সার্ল মনে করেন। অর্থাৎ, জলের তরলতা যদি গড়িয়ে যাওয়ার কারণ হয়, তাহলে কারণিক পরম্পরা সম্বন্ধে বলাই যায় যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন হল জলের গড়িয়ে যাওয়ার কারণ। এখন, কোনো ধর্ম যদি এমন কার্যক্ষমতার অধিকারী হয়, যা তার উপাদান কারণের দ্বারা কোনোভাবেই ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, সম্পূর্ণভাবে উপাদান কারণের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ওই ধর্মটির কার্যক্ষমতা তার উপাদান কারণের উপর নির্ভর করে না বলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধ সেখানে বিঘ্নিত হবে বলেই সার্ল মনে করেছেন।

কিন্তু কার্য-কারণের পরম্পরা সম্বন্ধ আবশ্যিক কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মনে করা যাক, কোনো একটি স্থানে প্রখর সূর্যতাপের ফলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হল। নিম্নচাপ গভীর হয়ে ঘূর্ণাবর্তের রূপ ধারণ করল। ঘূর্ণাবর্ত বা সাইক্লোনের ফলে সেই অঞ্চলে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হল, বহু ক্ষয়ক্ষতি হল। অনেক মানুষ আহত ও নিহত হলেন। প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীর জল দু-কূল ছাপিয়ে যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের জমি প্লাবিত হল। প্লাবিত জমিতে পলিস্তর জমা হওয়ায় তা উর্বর হয়ে উঠল। পরের বছর সেখানে ভালো ফসল হল। এখন, সাইক্লোনের ফলে যেমন বহু মানুষ গৃহহীন হলেন তেমনি কিছু চাষী সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পেলেন। সাইক্লোন হয়েছিল প্রখর সূর্যতাপের কারণে। এখন, কারণিক পরম্পরা স্বীকার করলে বলতে হবে, সূর্যতাপই কিছু মানুষের সৌভাগ্যের এবং কিছু মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ।

এই উদাহরণটি থেকে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয় যে, কার্যকারণের পরম্পরা নীতিটি সব কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং বলা যায় যে, সার্ল যে যুক্তি দেখিয়ে ‘emergent 2’ ধর্মটির অবাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যাই হোক, সার্ল 'emergent 2' না মানলেও ‘emergent 1’ অবশ্যই মেনেছেন। সার্ল উক্ত ‘causally emergent system feature’-এর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, উদ্ভূত ধর্ম সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যই সেখানে উপস্থিত। সুতরাং, একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, সার্ল একজন উদ্ভব তত্ত্বের সমর্থক। চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপে স্বীকার করে সার্ল দেখাতে চেয়েছেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত একটি বিষয়। কারণ চেতনাতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত। এখন, এই কথা থেকে মনে হয় যে, সার্ল বোধহয় দ্বৈতবাদী, যেহেতু তিনি ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত একটি স্তর বা সত্তা স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উদ্ভবতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে প্রায়শই এমন আপত্তি ওঠে যে, উদ্ভবতত্ত্ব কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হবে। যাই হোক, এই সমালোচনা থেকে মুক্ত হবার জন্য এবং কারণিক আবদ্ধায়নকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সার্ল একইসঙ্গে এ কথাও বললেন যে "consciousness is just a brain process" (Searle 2004, 127)। অর্থাৎ চেতনাকে মস্তিষ্ক দশার সঙ্গে অভিন্ন বলেও দাবি করলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই সার্লের বিরুদ্ধে পর্যাবসানের আপত্তি ওঠে। সার্ল এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের পর্যাবসানের কথা বলেছেন, — ১) কারণিক পর্যাবসান ও ২) সত্তাগত পর্যাবসান। সার্লের মতে, চেতনা কারণিক দিক

থেকে তার মূলগত ধর্ম অর্থাৎ মস্তিষ্ক দশা বা স্নায়ুতান্ত্রিক দশার কার্যকারিতার অতিরিক্ত নয়। চেতনার কার্যকারিতা তার স্নায়ুতান্ত্রিক দশা বা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কার্যকারিতা ভিন্ন নয়। ফলে, কারণিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চেতনা মস্তিষ্ক দশার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু সার্ল কারণিক দিক থেকে চেতনার মস্তিষ্ক দশায় পর্যাবসানকে স্বীকার করে নিলেও তিনি সত্তাগত দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান। সার্ল মনে করেন, ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতা, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ (first person perspective) থেকে অনুভূত হবার মতো এমন কিছু বৈশিষ্ট্য চেতনায় বিদ্যমান যা চেতনাকে অনন্য করে তুলেছে। তাই সত্তাগত দিক থেকে চেতনার পর্যাবসান সম্ভব নয়। বিষয়মুখিনতার বা ব্যক্তিনিষ্ঠতার মতো এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উচ্চস্তরীয় মানস ধর্মে স্বীকার করেছেন যা তার নিম্নস্তরীয় স্নায়ুতান্ত্রিক দশায় অনুপস্থিত। এই কারণেই তিনি চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপে গণ্য করেছেন। তবে, সার্ল উদ্ভবতত্ত্বের সমর্থক হলেও সার্বিক অর্থে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি উদ্ভূত ধর্মের প্রকৃত কারণিক ক্ষমতা স্বীকার করেননি। তাই চেতনাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি সীমিত অর্থে উদ্ভবতত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। চেতনাকে সরাসরি উদ্ভূত ধর্ম বলার পরিবর্তে তিনি 'causally emergent system feature' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সার্লের 'causally emergent system feature'-এর লক্ষণে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে দেখব, সার্ল বলেছেন "... Some ... system features cannot be figured out just from the composition of the elements and environmental relations; they have to be explained in terms of the causal interactions among the elements. Let's call these 'causally emergent system features." (Searle 2002, 111)। অর্থাৎ সার্লের মতে, উদ্ভূত ধর্মগুলিকে কেবলমাত্র তার মূলগত ধর্ম সন্নিবেশ এবং পরিবেশগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে জানা সম্ভব না হলেও ঐ ধর্ম সন্নিবেশের

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তা জানা সম্ভব (Searle 2002, 112)। এই লক্ষণ থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট যে, মূলগত ধর্মগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধের ভিত্তিতে উদ্ভূত ধর্মকে ব্যাখ্যা করা বা সে বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ causally emergent system feature সর্বাত্মক অর্থে অভিনব বা পূর্বাভাস অযোগ্য (irreducible) নয়। কারণিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত ধর্ম সবসময়ই তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। ফলে কারণিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত ধর্মের পর্যাবসান স্বীকার করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। চেতনাকে causally emergent system feature হিসেবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও তিনি বলেছেন যে, "...consciousness cannot itself be deduced or calculated from the sheer physical structure of the neurons without some additional account of the causal relations between them." (Searle 2002, 112)।

এখন, সার্লের এই তত্ত্ব বিষয়ে আপত্তি উঠতেই পারে যে, সার্ল উদ্ভূত ধর্মকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যাই করতে পারেননি। যে ধর্মে কারণিক অভিনবত্ব নেই, তাকে কি আদৌ উদ্ভূত ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া যায়? কোনো একটি বিষয়ের স্বকীয় কার্যকারিতাই তার সত্তার পরিচায়ক। স্বতন্ত্র কার্যকারিতা যার নেই, তার স্বতন্ত্র সত্তা কি স্বীকার করা যায়? স্নায়ুতান্ত্রিক দশার কার্যকারিতার অতিরিক্ত চেতনার যদি কোনো স্বতন্ত্র কার্যকারিতা না থাকে, তাহলে চেতনা কি কেবলমাত্র স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থার নামান্তর হয়ে যায় না? সার্ল বিজ্ঞানভিত্তিক ভৌতবাদের নীতিগুলিকে সামনে রেখে চেতনার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই অনুসারে দেহ-মনের সম্বন্ধকেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উদ্ভূত ধর্মের যদি স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা না থাকে, তাহলে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উদ্ভূত ধর্মের

স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকার করা আবশ্যিক। সুতরাং, আমাদের এমন কোনো উদ্ভবতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে হবে যেখানে উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকৃত হবে।

তথ্যপঞ্জী

1. Alexander, Samuel. 1920. *Space, Time and Deity.* New York : Dover Publication.
2. Broad, C. D. 1925. *The Mind and Its Place in Nature.* London : Routledge and Kegan Paul.
3. Campbell, D. T. 2013. Downward Causation in Hierarchically Organised Biological Sysem. *ECO Issue.* 15(3) : 139-151.
4. Caston, Victor. 1997. Epiphenomenalism, Ancient and Modern. *The Philosophical Review.* 106(3) : 309-363.
5. Chalmers, David J. 2006. Strong and Weak Emergence. in *The Re-Emergence of Emergence.* eds. P. Clayton and P. Davis. 244-254. Oxford : Oxford University Press.
6. Kim, J. 2006. Being Realistic about Emergence. in *The Re-Emergence of Emergence.* eds. P. Clayton and P. Davis. 189-202. Oxford : Oxford University Press.
7. Kim, J. 2008. Making Sense of Emergence. in *Emergence : Contemporary Readings in Philosophy and Sciences.* eds. M. Bedau and P. Humphreys. 127-153. London : MIT Press.
8. McLaughlin, Brian P. 2008. The Rise and Fall of British Emergentism. in *Emergence : Contemporary Readings in Philosophy and Science.* eds. M. Bedau and P. Humphrey. 19-59. London : MIT Press.
9. Mill, J. S. 1843. *A System of Logic.* 8th Edition. London : Longmans, Green, Trench, Turbner and Co.

10. Morgan, L. 1923. *Emergent Evolution*. London : Williams and Norgate.

11. Papineau, David. 2001. The Rise of Physicalism. in *Physicalism and Its Discontents*. eds. C. Gillett and B. Loewer. Cambridge : Cambridge University Press.

12. Searle, J. R. 2002. *The Rediscovery of the Mind.* London : MIT Press.

13. Searle, J. R. 2004. *Mind : A Brief Introduction*. Oxford : Oxford University Press.

14. Van Gullick, Robert. 2001. Reduction, Emergence and Other Recent Options on the Mind-Body Problem : A Philosophic Overwiew. *Journal of Consciousness Studies.* 8(9-10) : 1-34.

পঞ্চম অধ্যায়

বিকল্প উদ্ভবতত্ত্বের অনুসন্ধান

সার্ল তাঁর তত্ত্বে চেতনাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভবের ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। উদ্ভবের ধারণাকে ব্যবহার করলেও, আমরা দেখলাম সার্ল সীমিত অর্থেই উদ্ভবের ধারণাকে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যেহেতু বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল থেকে তিনি চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাই তিনি কোনোভাবেই কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে বিঘ্নিত করতে চাননি। সে কারণেই সার্ল উদ্ভূত বস্তুর স্বতন্ত্র কারণিক ক্ষমতা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। পদার্থবিজ্ঞান উদ্ভবের ধারণাকে মানতে রাজী নয়, কারণ তা পদার্থবিজ্ঞানে স্বীকৃত কার্যকারণ তত্ত্বের বিরোধী। পদার্থবিজ্ঞানে উদ্ভবের ধারণাকে স্বীকার করা না হলেও, জীববিজ্ঞানে কিন্তু উদ্ভবের ধারণাকে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্ল পপার (Karl Popper) জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের তত্ত্বকে সামনে রেখে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

পপার, ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জগতের বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভব বা উন্মেষের ধারণাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেছেন। উদ্ভব বলতে মূলতঃ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিবর্তনের ধারায় এমন অনেক নতুন নতুন বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব হয়েছে, যা আকস্মিক এবং অবশ্যই পূর্বাভাস অযোগ্য। এক্ষেত্রে কোনো এক ঘটনাকে তিনি নতুন বা অভিনব বলতে

বুঝেছেন যে, কোনো একটি নতুন শিল্প সৃষ্টিতে যে অভিনবত্ব থাকে, উন্মেষমূলক ঘটনা বা বস্তুতেও সেই একইরকম অভিনবত্ব থাকে (Popper & Eccles 1985, 22)।

উন্মেষমূলক বিবর্তন বা উন্মেষের ধারণাকে পপার স্বীকার করলেও সব দার্শনিক বা বিজ্ঞানীরা যে এই চিন্তা সমর্থন করেন, এমন নয়। তাই উন্মেষতত্ত্বের বিরোধী বক্তব্যও তিনি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী বা দার্শনিক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, এই জগতে এমন কিছুই নেই যা পূর্বাভাস অযোগ্য (unpredictable)। ফলে, তাঁরা উন্মেষমূলক বিবর্তনের (emergent evolution) তত্ত্বকে সমর্থন করেন না। কোনো কিছু উন্মেষমূলক হতে পারে বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সেই ধরনের চিন্তাবিদদের পপার নিয়ন্ত্রণবাদী (determinist) নামে অভিহিত করেছেন (Popper & Eccles 1985, 22)।

পপার মনে করেছেন যে, নিয়ন্ত্রণবাদীরা বলেন, প্রতিটি উদ্ভবই তার উপাদান কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ফলে কোনো কিছুই সম্পূর্ণভাবে নতুন নয়, বা নীতিগতভাবে পূর্বাভাস অযোগ্য নয়। এখন, এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে জলের উৎপত্তির আগে কি কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল যে, জল তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম? নিয়ন্ত্রণবাদীরা বলবেন যে, যদি ঐ বিষয়ক সম্ভাব্য সব জ্ঞান কোনো একজন ব্যক্তির থাকত, তাহলে তার পক্ষে অবশ্যই বলে দেওয়া সম্ভব হত। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, উদ্ভবতাত্ত্বিকরা যে পূর্বাভাসহীনতার কথা বলেন, তা নিছকই জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে সীমিত, ব্যক্তিগত অজ্ঞানতার প্রকাশ; কিন্তু সত্তাগত স্তরে প্রকৃতপক্ষে কোনো নিয়ন্ত্রণহীনতা নেই।

পপার উদ্ভবতত্ত্বের বিরোধী হিসেবে পরমাণুবাদীদের (atomist) কথাও বলেছেন। পরমাণুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সব জড়বস্তু এবং সব জৈবতন্ত্রই আসলে পরমাণুর সমাহার। পরমাণু সংযোগ অতিরিক্ত জড় এবং জীব জগতে কিছুই নেই। যা কিছু নতুনত্ব এই জগতে দেখতে পাওয়া যায়, তা আসলে পরমাণুর বিন্যাসজনিত। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন বিন্যাসের কারণে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর উদ্ভব ঘটে। এখন, পরমাণুর বিভিন্ন বিন্যাসের সম্ভাবনা সম্বলিত সম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষের সীমিত ক্ষমতায় অর্জন করা মুশকিল। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন, এই বিন্যাস পূর্বাভাস অযোগ্য। কিন্তু আসলে তা নয়। পরমাণুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জ্ঞান আরো উন্নত হতে পারবে। ফলে, নীতিগতভাবে বলা যায় যে, নতুন নতুন বিন্যাস এবং তাদের প্রকাশ পূর্বাভাসযোগ্য, -- "... the novel arrangements and its results are predictable in principle." (Popper & Eccles 1985, 23)।

আবার উদ্ভবতত্ত্ব বিরোধী অনেকে মনে করেন যে, যে সব বিষয়কে আমরা অভিনব বলে মনে করি, বিবর্তনের ধারায় যে সব বস্তু বা ধর্ম বা ঘটনার উদ্ভব হয়েছে বলেই উদ্ভবতাত্ত্বিকরা মনে করেন, সেগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নতুন ঘটনা নয়, সবকিছুই তার উপাদান কারণে সম্ভাবনারূপে সুপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল, যা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে বিকশিত হয়েছে মাত্র। ফলে, যে সব বস্তুকে বা তাদের আণবিক বিন্যাসকে পূর্বাভাস অযোগ্য, অভিনব বলে মনে হচ্ছে, তা ঘটনাটির আবির্ভাবের আগেই তার উপাদান কারণে সম্ভাবনারূপে অনুস্যূত ছিল। উপাদান কারণ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেই তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় সম্ভাবনা প্রকাশিত হত; তখন আর কোনো উৎপত্তিকেই

অভিনব বলে মনে হত না; পূর্বাভাস দিতেও কোনো সমস্যা হত না। সুতরাং এই যুক্তিগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যেতেই পারে যে, বিবর্তন কখনোই উন্মেষমূলক নয়।

পপার এই উদ্ভবতত্ত্ব বিরোধী মতগুলির ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, যদিও প্রথাগত পদার্থবিজ্ঞান দৃঢ় নিয়ন্ত্রণবাদকেই সমর্থন করে, কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের জগতে নতুন চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। প্রথাগত পদার্থবিজ্ঞানে মহৎ পরিমাণ বস্তুর (macroscopic) কারণতা নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই মনে করা হত, কিন্তু কোয়ান্টামতত্ত্বে সম্ভাবনামূলক বাক্যের সাহায্যে তা নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে,— "Causal explanation has been at least partly replaced by probabilistic explanation." (Popper & Eccles 1985, 25)। পপার স্বীকার করেন যে, এ জগতে অনেক ব্যতিক্রমহীন নিয়ম আছে। একইসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, এমন কিছু সম্ভাব্য ঝোঁক বা প্রবণতা (probabilistic propensity) থাকে যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুসারে অনেকসময়ই সমরূপে ক্রিয়া করে না। ফলে, পপারের মত হল, "There can be invarient laws and emergence; for the system of invarient laws is not sufficiently complete and restrictive to prevent the emergence of new law like properties." (Popper & Eccles 1985, 25)।

প্রথাগত পদার্থবিজ্ঞান অনেক ঘটনার ক্ষেত্রেই দাবী করে যে, এমন ঘটনা ঘটলে, তারপর তেমন ঘটনাও ঘটবে। পপারের মতে, এক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্য (premise) এবং সিদ্ধান্ত উভয়ই সম্ভাবনামূলক, প্রত্যেক ঘটনাই কোনো না কোনো পরিস্থিতিতে ঘটে। পরিস্থিতির প্রভাবকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। পরিস্থিতি অনুকূল হলে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় আবার তার

সম্ভাবনা কমে এবং অনেকক্ষেত্রে তা কমে শূন্যের কাছে চলে আসে। এই জগতে অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। প্রতিটি ঘটনা ঘটার আগে অসংখ্য সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, যার মধ্যে একটিমাত্র সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হয়। ঐ অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে কোন সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হবে, বাস্তবে কোন বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব ঘটবে, তা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। তাই পপার মনে করেন যে, পরিস্থিতির উপর সম্ভাব্যতার এই নির্ভরতা উন্মেষের বা উদ্ভবের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

পপার বিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী। বিবর্তনের ধারায় এ জগতে মৌলিক কণা থেকে যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটেছে। তারপর একদিন তার মধ্যে প্রাণের সূচনা হয়েছে। জীব জগতের বিবর্তনের পথে কোনো একদিন চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। পপারের মতে, বিবর্তনের এই গতিধারায় এমন অনেক বস্তু আবির্ভূত হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী স্তরে পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। যেমন, প্রাণের সূচনাকে তিনি উদ্ভবের দৃষ্টান্ত হিসেবেই গণ্য করবেন।

পপার এ প্রসঙ্গে জৈব-রসায়নবিদ জাক মনোডের (Jacques Monod) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, “Life appeared on earth: What, before the event, were the chances that this would occur?” (Popper & Eccles 1985, 28)। পপার মনে করেছেন, মোনোড এই সম্ভাবনার মাত্রাকে ‘virtually zero’ বলেই মনে করতেন। কারণ পপারের মতে, কোনো একটি জিন আকস্মিকভাবে যদি সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে, তাহলে তার বিকাশের জন্য কতগুলি উৎসেচক (enzyme) জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই উ৯সেচকগুলি ঐ জিনকে মূলতঃ দুটি কাজে সহায়তা করে, — আরো নতুন নতুন

উৎসেচক সৃষ্টিতে এবং নিজের অনুরূপ আরো পদার্থ সৃষ্টি করতে (reproduction)। এখন, এই কাজের জন্য তো যে কোনো উৎসেচক হলেই হবে না, উপযুক্ত প্রয়োজনীয় উৎসেচকের উপস্থিতি আবশ্যিক। কিন্তু সবসময়ই যে, সেই উৎসেচকগুলি জিনের চারপাশে থাকবে, এমন নাও হতে পারে। ফলে, সেখানে কিন্তু অবশ্যই সম্ভাবনার প্রশ্ন থেকেই যায়। পপার আরো মনে করেন যে, বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞানের কোনো না কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান এখনও সক্ষম হয়নি। যদিও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা যেতেই পারে। আর সম্ভাবনার পথ যেহেতু খোলাই থাকে, তাই বিজ্ঞান সেই চেষ্টা করেও। বিজ্ঞানের চিন্তা সত্য হবার সম্ভাবনাই বেশী বলে পপার বিশ্বাসও করেন। একইসঙ্গে তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভাবনা যেহেতু সব ক্ষেত্রে থাকে অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই বিকল্পের সম্ভাবনাকে যেহেতু অস্বীকার করা যায় না, তাই একথা ভাবাই যেতে পারে যে, ফলাফল তার কারণের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত নাও হতে পারে (Popper and Eccles 1985, 29)।

পপার মনে করেন যে, এই জগতে বিবর্তনের ধারায় এমন অনেক বস্তুর আবির্ভাব ঘটে যাদের সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি কার্যত ফলপ্রসূ হবে, তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। ফলে পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব নয়। এখন, পপারের এই কথা থেকে, মনে হতে পারে যে, বাস্তবে কোনো বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়তো সত্যিই অসম্ভব হলেও, নীতিগতভাবে পূর্বাভাসযোগ্যতা কি অসংখ্য সম্ভাবনার দ্বারা প্রতিহত হতে পারে? অর্থাৎ পপার যখন বলছেন যে, অসংখ্য সম্ভাবনার উপস্থিতি কোনো বস্তুর উৎপত্তির পূর্বাভাসকে অসম্ভব করে তুলেছে, তখন তিনি কি বাস্তব পূর্বাভাসযোগ্যতার

অসম্ভাব্যতাকেই (impossibility of actual unpredictability) বোঝাতে চেয়েছেন, নাকি নীতিগত অসম্ভাব্যতাকেই বুঝিয়েছেন? কোনো সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহলে নীতিগত অসম্ভাব্যতার প্রশ্নই উঠতে পারে না, আর জড়বাদী তাত্ত্বিকরা তো কখনোই বাস্তব পূর্বাভাসযোগ্যতার কথা বলেন না, নীতিগত পূর্বাভাসযোগ্যতার কথাই বলেন। এক্ষেত্রে পপারের মতের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, পপার যখন উন্মেষের কথা বলছেন তখন তিনি একথা অবশ্যই মেনে নেন যে, এ জগতের মূল উপাদান হল বিশুদ্ধ জড়বস্তু। এই জড়বস্তু থেকেই এমন কিছু বস্তুর উৎপত্তি হল, যারা হয়তো নীতিগতভাবে তার উপাদান কারণের দ্বারা পূর্বাভাসযোগ্য। পপার মনে করেছেন, এই নতুন বস্তুগুলির আবির্ভাবের ফলে জগতে এমন কিছু সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হল যা আরো নতুন বস্তুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। এই যে, নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হল, সেগুলি কিন্তু কোনোভাবেই মূল জড় উপাদানের দ্বারা পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। ফলতঃ মানতেই হবে যে, এমন কোনো কোনো বস্তুর উৎপত্তি এই জগতে ঘটে, যাদের মধ্যে এমন কিছু সম্ভাবনা সৃষ্টির যোগ্যতা বা সক্ষমতা থাকে যা অভিনব এবং এই নতুন সম্ভাবনাগুলি আরো নতুন নতুন বস্তু ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সক্ষম। তাই, এই উৎপত্তিকে পপার উন্মেষ বলেই গণ্য করেন। যেমন, আদিকালে এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র জড় উপাদানই ছিল। সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলি একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করল। ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর বস্তুর উৎপত্তি হতে থাকল। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটতে থাকল এবং তার মাধ্যমে এই পৃথিবী বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে যেতে থাকল। এই প্রত্যেকটি পরিবর্তন, সূক্ষ্ম থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর হবার এই প্রক্রিয়া কিন্তু অবশ্যই পূর্বাভাসযোগ্য, কিন্তু ঐসব পূর্বাভাসযোগ্য রাসায়নিক ক্রিয়া-

বিক্রিয়ার ফলে যে একদিন পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটবে বা চেতনার আবির্ভাব ঘটবে এবং সেই প্রাণের বা চেতনার আগমন যে পৃথিবীতে আরো নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে,— তা কিন্তু পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না (Popper & Eccles 1985, 29-31)। পপারের এই চিন্তা থেকে মনে হয় যে, পপার কিন্তু সার্লকৃত 'Emergent 2'-র সম্ভাবনা স্বীকার করবেন। অর্থাৎ তিনি শুধু এটুকুই বলছেন না যে, কেবলমাত্র নতুন নতুন বস্তু বা ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে বা ঘটবে যেগুলি পূর্বাভাস অযোগ্য, তিনি একইসঙ্গে সেইসব পূর্বাভাস অযোগ্য বস্তু বা ধর্মের সৃষ্টিশীলতা বা কারণিক ক্ষমতাও স্বীকার করা যায় বলে দাবী করেছেন, যা তার উপাদান কারণে অনুপস্থিত। উপাদান কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত বস্তুগুলির কারণিক ক্ষমতা কোনোভাবেই ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। সুতরাং পপারের মতে, এগুলি অবশ্যই সম্পূর্ণ অর্থে উদ্ভব বা উন্মেষের স্থল।

চেতনার উদ্ভবকে যে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়, তা পপার স্বীকার করেছেন (Popper & Eccles 1985, 29)। চেতনা বা মন সম্পর্কে অনেক মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে চরম আচরণবাদ (radical behaviorism) ও সর্বমনবাদ (panpsychism) বহুচর্চিত পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ। চরম আচরণবাদ মানব জগতেও কোনোরকম চেতন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা স্বীকার করে না। সর্বমনবাদ অন্যদিকে এই জগতের প্রতিটি বস্তুতে চেতনার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে। এখন, পপার মনে করেছেন যে, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও তারা উভয়েই চেতনার উদ্ভবজনিত সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারে। কারণ আচরণবাদ যেহেতু মন বা চেতনার অস্তিত্বই স্বীকার করে না, তাই তার ক্ষেত্রে চেতনার উদ্ভব স্বীকার করার প্রসঙ্গই আসে না। সর্বমনবাদ যদিও চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু চেতনা সেখানে উদ্ভূত পদার্থ

বলে বিবেচিত হয় না। সর্বমনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই জগতে চেতনার অস্তিত্ব শুরু থেকেই ছিল। পরমাণুর মধ্যেও ছিল, পরমাণু যা দিয়ে গঠিত সেই সূক্ষ্মতম কণার মধ্যেও চেতনা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। ফলে, চেতনার উদ্ভবকে তাঁরা কখনোই স্বীকার করেন না। পপার যদিও এই দুটি তত্ত্বের কোনোটিকেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন না। পপারের মতে, চরম আচরণবাদ চেতন অভিজ্ঞতাকে না মেনে জগতের যাবতীয় সৃষ্টিশীলতার উৎসকেই অস্বীকার করেছে (Popper & Eccles 1985, 61)। আবার সর্বমনবাদীরা যখন বলেন যে, জগতের আদি উপাদানেই চেতনা উপস্থিত ছিল, তাও পপার মেনে নিতে পারেন না। তাঁর মতে, জগতের আদি উপাদান ছিল বিশুদ্ধভাবে জড়। পরবর্তীকালে চেতনার উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই জগতে, এমন ধর্মের উৎপত্তি সম্ভব, যা তার উপাদান কারণে অনুপস্থিত। তাঁর মতে, তরল পদার্থের স্ফটিকায়ণের আগেও কঠিন স্ফটিকের ধর্মগুলি তরল পদার্থে উপস্থিত থাকে না। ফলে, এ জগতে যা কিছুরই উৎপত্তি হয়, সেগুলির সবই যে তাদের উপাদান কারণে উপস্থিত থাকে, এমন নয়। অনেকসময়ই এমন হয় যে, কোনো বিষয়ের উৎপত্তি ধীরে ধীরে না হয়ে হঠাৎ হয়ে যায় এবং এমন বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটে, যা তার উপাদান কারণে উপস্থিত ছিল না। ঠিক যেমন সার্ল মনে করেছেন যে, আণবিক স্তর থেকে যখন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয় তখন সেই যৌগিক পদার্থে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় যা তার উপাদান কারণে ছিল না। যেমন, কাঠিন্য বৈশিষ্ট্যটির কতগুলি ধর্ম আছে, যেমন, অভেদ্যতা, প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি। কঠিন যৌগিকবস্তুতে এই ধর্মগুলি থাকে কিন্তু যে উপাদান দিয়ে ঐ যৌগটি গঠিত, তাতে ঐ ধর্মগুলি থাকে না। সুতরাং, মানতেই হয় যে, ঐ ধর্মগুলি উদ্ভূত। তবে, এ প্রসঙ্গে, সার্ল

ও পপারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। সার্ল কাঠিন্যকে উদ্ভূত বলে মনে করলেও নিম্নস্তরের অতিরিক্ত তার স্বতন্ত্র কোনো কারণিক ক্ষমতা আছে বলে মানবেন না, যদিও পপার ভিন্ন মতই পোষণ করবেন।

পপার চেতনার উৎপত্তি বিষয়ে উদ্ভব বা উন্মেষের ধারণারই সমর্থক। চেতনাকে তিনি উন্মেষের দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখতে চান। যে কোনো বিষয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দুটি সম্ভাবনাই স্বীকার করা হয়— হয় সেটি পরিণতিমূলক (resultant) হবে অথবা উন্মেষমূলক (emergent) হবে। জগতের আদি উপাদান যেহেতু পপারের মতে জড়, তাই চেতনাকে তিনি কোনো মতেই পরিণতিমূলক বলে গণ্য করতে রাজী নন। আর চেতনা যদি পরিণতিমূলক না হয়, তাহলে তা অবশ্যই উন্মেষমূলক হবে। তাই চেতনার উন্মেষ বিষয়ে পপারের কোনো সংশয়ই নেই।

পপার মনে করেছেন, চেতনার উৎপত্তি একটি উন্মেষের দৃষ্টান্ত। কিন্তু চেতনার উন্মেষ কীভাবে হল, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পপার ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যদিও তিনি ডারউইনের তত্ত্বের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনের মধ্য দিয়ে নিজের তত্ত্ব রচনা করেছেন। ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'natural selection' বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। ডারউইনের মতে, জীব জগতে বেঁচে থাকার লড়াই চিরন্তন। খাদ্যের জন্য, পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য জীব জগতকে চিরদিনই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। জীব জগতের এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করার জন্য যদি কোনো জীব বা প্রজাতি তার মধ্যে এমন কোনো পরিবর্তন ঘটাতে বা 'variation' আনতে সক্ষম হয়, যা তার জীবন

সংগ্রামকে সহজতর করবে, জীবন সংগ্রামের সহায়ক হবে, তাহলে ঐ প্রাণী ডারউইনের ভাষায় 'natural selection' পায় অর্থাৎ প্রকৃতি তাকেই নির্বাচন করে, তার অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয়।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে সামনে রেখে পরবর্তীকালে ডারউইনপন্থী জীববিজ্ঞানীরা তাঁর তত্ত্বকে আরো পরিণত করেছেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হলেন লয়েড মর্গান (Morgan 1923)। মর্গান মনে করেছেন, মূলতঃ উচ্চস্তরের জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আচরণগত পারদর্শিতা (varied reportoire of behavior) উপস্থিত থাকে, যা তাদের পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে। একটি গাছ মাটির রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাথরের ফাঁক দিয়ে বা পাথর ফাটিয়ে তার শিকড়কে মাটির গভীরে পৌঁছে দেয় এবং তার ফলে সে এমন রাসায়নিক সমৃদ্ধ মাটির সন্ধান পায়, যা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপস্থিত ছিল না। একইভাবে, একটি প্রাণী যখন নতুন খাদ্যাভ্যাস তৈরি করে, তখন তার পরিবেশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো প্রজাতির পছন্দ-অপছন্দ বা পারদর্শিতার ভিত্তিতে ঐ জীব বা প্রজাতির সঙ্গে তার পরিবেশের নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, কারণ, নতুন অভ্যাস বা পারদর্শিতার দ্বারা চালিত হয়ে জীব তার পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবেই আদান-প্রদান করে যে, পরিবেশও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। পরিবেশে তার ফলে একটি নতুন জায়গা তৈরি হয় (ecological niche) যেখানে ঐ নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবকে পরিবেশ স্থান দিতে পারে। অর্থাৎ একটি জীবের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে পরিবেশ যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি তার ঐ পরিবর্তন বা পারদর্শিতা তার উপর এবং তা উত্তরাধিকারীদের উপরও একটি নির্বাচনী প্রভাব (selection pressure) তৈরি করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি প্রাণী

পরোক্ষভাবে নির্বাচনী প্রভাবকে (selection pressure) পরিবর্তিত বা প্রভাবিত করতে পারে।

ডারউইন তাঁর তত্ত্বে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বললেও তা নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি একথা মেনে নিয়েছেন যে, অনেকসময়ই অভ্যাসের পরিবর্তন প্রাণীদেহের পরিবর্তন ঘটায় আবার, কখনো কখনো বিপরীত ঘটনাও ঘটে। কিন্তু কোনটি আগে ঘটছে আর কোনটি পরে ঘটছে, সেই বিষয়টি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু পপার মনে করেন, বহুক্ষেত্রেই অভ্যাস আগে পরিবর্তিত হয়, পরে দৈহিক গঠনে পরিবর্তন আসে। এইসব ক্ষেত্রগুলি মর্গান প্রমুখদের গবেষণার বিষয়। ডারউইনের কাছে কোন ঘটনাটি কোন ঘটনাকে প্রভাবিত করছে, কোনটি আগে ঘটছে, কোনটি পরে ঘটছে, তা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পপার মনে করেছেন, বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে প্রাণীর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রভৃতিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা উচিত। পপার দাবী করেন যে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বকে বুঝলে এমন অনেক প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, যা হয়তো এতদিন অব্যাখ্যাত ছিল। একইসঙ্গে তাঁর দাবী, একটি প্রাণীর আচরণের মধ্যে যদি সেই স্বাধীনতাকে স্বীকার করা যায়। অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া যায় যে, সে তার সহজাত প্রবণতার বাইরে গিয়ে, তার জিনগত আচরণের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সে নিজের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে নতুন অভিযোজন (adaptation) লাভ করে, তাহলে মনের উদ্ভব স্বীকার করা বা ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ হয়ে যায়। জীবের অচেতন চাহিদা বা নিছক জৈবিক পছন্দ-অপছন্দই তার মধ্যে লক্ষ্যাভিমুখিনতা (goal directedness), বিষয়মুখিনতার

(intentionality) মতো ধর্মগুলির বীজবপন করে যা পপারের মতে চেতনার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরায়িত করে (Popper 1978)।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে যখন পপার চেতনার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, তখন তিনি বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণবাদকে অস্বীকার করলেন। বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে প্রাণীজগত কম্পিউটারের মতো পূর্বনির্ধারিত (programmed)। তাদের DNA-র গঠন, তাদের মৌলিক জিনগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই তারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের এই পূর্বনির্ধারিত আচরণের (programme) পরিবর্তন হতেই পারে, তা আরো উন্নততর হতে পারে, কিন্তু যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই তাদের জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই হবে। কোন বৈশিষ্ট্যটি তারা নতুনভাবে অধিগ্রহণ করতে পারে, কোন বৈশিষ্ট্যটি ছেড়ে দিতে পারে, তার সম্ভাবনা জিনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, পপার এ প্রসঙ্গে দুধরনের পূর্বনির্ধারিত আচরণের মধ্যে (behavioral programme) পার্থক্য করেছেন—'open behavioral programme' আর 'close behavioral programme'। 'Closed behavioral programme'-এ একটি প্রাণীর আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, 'open behavioral programme'-এ বিশ্বাস করা হয় যে, একজন প্রাণীর সব আচরণ আগে থেকে নির্ধারণ করা বা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের কিছু কিছু আচরণ তাদের সামনে উপস্থিত বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেবার মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পায়। কোন্ প্রাণী কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ বিকল্প বাছবে, তা সম্পূর্ণভাবে পূর্বাভাসযোগ্য নয়। পপার মনে করেছেন যে, এই 'open behavioral programme'-এর মাধ্যমেই হয়তো চেতনার উদ্ভব হয়েছে। জীবের পছন্দ-অপছন্দ, বেছে নেবার ক্ষমতা

প্রভৃতি ‘open behavioral programme’-র দ্বারাই সমর্থিত হয়। এগুলি চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ সে কারণেই পপার মনে করেছেন যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি চেতনার আগমনের প্রাক্‌শর্ত হিসেবে কাজ করেছে এবং চেতনার বিবর্তনকে (উন্মেষকে) ত্বরান্বিত করেছে।

চেতনাহীন অবস্থা থেকে চেতনার উন্মেষের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পপার উপযোগিতার কথা বলেছেন। পপারের মতে, অস্তিত্বরক্ষার মূল্য দিয়েই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। অর্থাৎ, এই জগতের বিবর্তনের মূল লক্ষ্যই হল অস্তিত্বরক্ষা। প্রতিটি জীব এবং প্রজাতি প্রতিমুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি জীবই চেষ্টা করছে নতুন নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। যে নিজেকে এই পৃথিবীর উপযোগী করে তুলতে পারে, সে থেকে যায়, অন্যান্যরা বিবর্তনের গতিতে হারিয়ে যায়। সঠিক নির্বাচন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খুবই জরুরী। প্রত্যেকস্তরেই এই উপযোগিতার মাত্রা বিচার করেই নির্বাচন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। কোনো একটি বিকল্পকে বেছে নেবার আগেই সেই বিকল্পটি সম্বন্ধে কিছু পূর্ববিবেচনার বা কিছু প্রত্যাশার জন্ম হয়। যেমন, জিরাফ লক্ষ করল যে, মাটির কাছাকাছি গাছপালা কমে যাচ্ছে, অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীদের সঙ্গে অনেক বেশী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদের খাদ্যসংগ্রহ করতে হচ্ছে। অথচ, বড়ো বড়ো গাছের উপরের দিকের ডালপালাতে যথেষ্ট পাতা আছে, যা কেউই খেতে পারছে না। কোনোভাবে যদি নিজেকে একটু লম্বা করা সম্ভব হয়, তাহলেই ঐ উপরের ডালপালা থেকে পাতা সংগ্রহ সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতা এড়িয়ে তাহলে সহজেই জীবনধারণ সম্ভব হতে পারে। এই পূর্ববিবেচনা ও প্রত্যাশা জিরাফকে তার গলা লম্বা করার বিকল্প বেছে নিতে সাহায্য করল, অর্থাৎ

নিছক জৈবিক চাহিদার দ্বারা চালিত হয়েই একটি প্রজাতি একাধিক বিকল্পের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ বিকল্পকে বেছে নিল। এই বিকল্পটি বেছে নেওয়াও কিন্তু একটি প্রকল্প। কোনো প্রকল্পেরই যেমন কোনো নিশ্চয়তা থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই। বেছে নেবার পর বিকল্পটি প্রত্যাশাপূরণ নাও করতে পারে। কিন্তু প্রকল্পটি পরীক্ষা করার আগে, খুব প্রাথমিক স্তরের হলেও, একটু বিচার-বিবেচনা কাজ করে বলে পপার মনে করেছেন। এখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, এই বিচার-বিবেচনা কি চেতন? পপার যদিও এর সুস্পষ্ট কোনো উত্তর দেননি। কিন্তু, মনে হয় তিনি খুবই প্রাথমিক স্তরের চেতনক্রিয়ার অস্তিত্ব এর মাধ্যমে স্বীকার করতে চেয়েছেন। তবে, এ প্রসঙ্গে কেউ বলতেই পারেন যে, পপার ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিয়েছেন, কারণ তিনি চেতনার বিবর্তন প্রমাণ করতে গিয়ে বিচার-বিবেচনাকে চেতনার আগে দেখাতে চাইছেন। চেতনা থাকলেই বিচার-বিবেচনার প্রসঙ্গ আসে, বিচার-বিবেচনা থেকে চেতনা আসে না। তবে, এই আপত্তির উত্তরে পপারের সপক্ষে বলা যায় যে, বিচার-বিবেচনা, প্রত্যাশা প্রভৃতি মানস অনুভূতিগুলি চেতন জগতেরই অংশ। পপার এদের চেতনক্রিয়া হিসেবেই গণ্য করেছেন। পপার মনে করেছেন বিবর্তনের কোনো একটি পর্যায়ে এসে প্রাণী জগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা সমাধানের আবশ্যিকতা অনুভব করেছে। পপারের কথায়,

> "… broadly speaking, that mind emerges owing to the needs of the organism to centralise previously automatic, let us say, decisions. The automatic decisions were taken so to speak, for chemical reasons. The chemical reaction was the solution to the problem. But if the problem becomes too complicated, the organism needs something beyond that.

For this it invented consciousness. There was probably a kind of unconscious mind before that.” (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 172-73)।

পপার অনুমান করেছেন যে, প্রাণের বিকাশের পর বিবর্তনের গতিতে জীব আর শুধুমাত্র ‘passive receptor of information’ (Popper & Eccles 1985, 30) থাকল না, বরং সে সক্রিয়ভাবে ঐ তথ্যগুলি গ্রহণ করল এবং নানা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, নতুন নতুন বিষয়কে বোঝার জন্য তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করার চিন্তা তার মধ্যেই জাগতে শুরু করল,— “...there is a centre of activity, of curiosity, of exploration, of planning; there is an explorer, the animal’s mind.” (Popper & Eccles 1985, 30)।

ডারউইন নিজে তাঁর বিবর্তনের তত্ত্বকে যান্ত্রিক বিবর্তন হিসেবেই দেখেছেন। যদিও পপার মনে করেন, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব আমাদের সমস্ত সৃজনশীলতা, শিল্পসৃষ্টি, বিজ্ঞান— এইধরনের নানা সৃষ্টির ইচ্ছা, স্বাধীনতার বিবর্তন— সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করতে পারে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে, প্রাণ, মন এবং মানব মনের সব সৃষ্টিকেই ডারউইনের এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। এই তত্ত্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলে তা নিম্নমুখী কারণতার ধারণাকেও (downward causation) সামনে এনে দেয়। কোনো প্রাণীর একটি নির্বাচন, একটি পছন্দ তার জীবনধারণকে সুরক্ষিত করে। একাধিক বিকল্পের মধ্যে একটি বিষয় বা বিকল্পকে বেছে নেবার সুযোগ যেহেতু তার থাকে, তাই সে তার ভবিষ্যতকে তার সিদ্ধান্তের দ্বারা সুরক্ষিত করতে পারে। ফলে, প্রাণীর নিজস্ব ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। একটি প্রাণী যখন তার মধ্যে কোনো ‘variation’ নিয়ে আসে, তার কোনো অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটায়,

কোনো নতুন পারদর্শিতা আয়ত্ব করে, তখন প্রাণীর ঐ পরিবর্তন বাহ্যিক জগতে, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। পপার, একে নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করেছেন। তাই পপার ডারউইনের তত্ত্বকে নিছক যান্ত্রিক বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা হিসেবে মানতে রাজী নন (Popper 1978)।

পপার মনে করেন, যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্বাচন বা পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার আচরণ এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারণভাবে আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারাই আমাদের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। কিন্তু পপার মনে করেন সব আচরণের ক্ষেত্রে তা হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা নির্ধারণ প্রভৃতি অনেক সময়ই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের বর্তমান আচরণ ও পরবর্তী আচরণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। একটি আচরণের থেকে পরবর্তী আচরণের গতিপথ নির্ধারিত হয়। কোনো উন্নততর জীব (মানুষ তো বটেই) তার পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ করে। কোন মুহূর্তে সে কী ধরণের আচরণ করলে তা তার জীবনরক্ষার পক্ষে সবচেয়ে বেশী লাভজনক হবে, তার ভিত্তিতে সে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করে। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমেই উন্নততর প্রাণীদের আচরণ নির্ধারিত হয় এবং সে কারণেই তার ভিত্তিতেই তাদের মনোযোগও নিয়ন্ত্রিত হয়— কোন বস্তুটি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বস্তুটি নয়, কোনটি মনোযোগের উপযোগী আর কোনটি নয়, তাও এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। পপার মনে করেছেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরবর্তী প্রকল্প নির্ধারণ প্রভৃতি অবশ্যই চেতনার অনুষঙ্গ। উন্নততর প্রতিটি প্রাণীই "... problem solving agent : the animal is always actively attempting to control its environment" (Popper & Eccles

1985, 128)। এই কাজে প্রাণী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অগ্রসর হয়। প্রত্যেক মুহূর্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং তার নিজস্ব বোধ অনুসারে প্রাণী কোনো একটি বিকল্পকে বেছে নেয় এবং তার আচরণের মধ্যে দিয়ে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। চেতনা ভিন্ন এই প্রক্রিয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না। চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে এইসব আচরণকে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হয় না।

সি. ডি. ব্রড (Broad 1925) চেতনার আবির্ভাব প্রসঙ্গে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে মানতে চাননি। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন বিশুদ্ধভাবে একটি নঞর্থক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সেইসব প্রজাতি বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, যারা নিজেদের মধ্যে জীবন সংগ্রামের সহায়ক বা উপযোগী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় না। এখন, মন যদি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যদি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তাহলে আলাদাভাবে মন বা চেতনার বিবর্তনকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু তা স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের অবশ্যম্ভব পরিণতি। সেক্ষেত্রে মন বা চেতনার জীবন সংগ্রামে কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ব্রড আরো মনে করেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো বস্তুর উৎপত্তি বা তার জটিলতর অবস্থার বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে, ব্রডের মতে, একথা বলার কোনো অর্থই হয় না যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মনের উৎপত্তি ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব,— "The plain fact is that natural selection does not account for anything whatever; and therefore it is no objection to any particular theory of the relations of

mind and body that, if it were true, natural selection would not explain the origin and development of mind." (Broad 1925, 119-20)।

ব্রডের এই বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ব্রড বিবর্তনের ক্ষেত্রে চেতনার গুরুত্বকে স্বীকার করার পক্ষপাতী নন। চেতনার কোনোরকম কোনো ভূমিকাই এক্ষেত্রে তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে, স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের ফলে চেতনা উৎপত্তি লাভ করেছে, কিন্তু তার কোনো স্বতন্ত্র কার্যকারিতা নেই। সুতরাং, চেতনা ব্রডের কাছে নিছকই একটি উপবস্তুমাত্র। কিন্তু, পপার চেতনাকে উপবস্তু হিসেবে গণ্য করতে রাজী নন। মন বা চেতনা আছে কিন্তু তার কোনো কার্যকারিতা নেই, উপবস্তুবাদীদের এই চিন্তা, পপারের মতে, ডারউইনের বিবর্তনের ব্যাখ্যার বিরোধী। কারণ, উপবস্তুবাদ বিবর্তনের ধারাকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না, মনের ক্রিয়াশীলতা বা সৃষ্টিশীলতার ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। এই জগতে যা কিছুর উৎপত্তি ঘটেছে, তার কোনো না কোনো প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা অবশ্যই রয়েছে। অন্যভাবে বললে, বিবর্তনের ধারায় এই জগতে সেইসব বিষয় বা বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করেছে বা অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, যারা নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করতে পেরেছে। মন যদি উপযোগী না হয়, তার যদি কোনো কার্যকারিতা না থাকে, তাহলে তার উৎপত্তি বা বিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না। কালের গতিতে, বিবর্তনের ধারায় তার বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। পপার মনে করেন, মানস জগত যেমন বস্তু জগতকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে, তেমনি তার নিজস্ব সৃজনশীলতা দিয়ে সে আরো নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আদিম অস্ত্র থেকে আধুনিক কম্পিউটার সবই মানব সৃজনশীলতার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কারণেই পপার তিনটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন (Popper & Eccles 1985, 36-50)।

পপারের এই ত্রিজগত তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাবে যে, পপার এই তিনটি জগত এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকারের মাধ্যমে মনের কার্যকারিতা, বিশেষতঃ নিম্নমুখী কারণতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নমুখী কারণতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, তা কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে এড়াতে পারে না। পপারের বিরুদ্ধে কিন্তু কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের আপত্তি ওঠে না। কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণ, কারণিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব নির্ভর। কারণিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বে বলা হয় যে, কার্য সম্পূর্ণরূপে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই একটি কার্যের একটি পর্যাপ্ত কারণ স্বীকার করাই যথেষ্ট। একটি কার্যের একাধিক পর্যাপ্ত কারণ থাকলে বিরুদ্ধ প্রাকল্পিক পরিস্থিতিতে (counter factual situation) কার্য থেকে কারণের অনুমান সম্ভব হবে না। তাই একটি কার্যের একাধিক পর্যাপ্ত কারণ স্বীকার করলে বলা যায় যে, কার্যটি কারণের দ্বারা অতিনিয়ন্ত্রিত, কার্যকারণ সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল, কার্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না, যা কারণে অনুপস্থিত। অর্থাৎ কারণে যা আছে, কার্যে তার অতিরিক্ত কিছু কোনোভাবেই থাকতে পারে না। নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের এই দাবী পপার কোনোমতেই মানতে চাইবেন না। কারণ তিনি উদ্ভবতত্ত্বে বিশ্বাসী, উন্মেষের ধারণা তো নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধ কথাই বলে। পপার মনে করেন যে, বিবর্তনের কোনো কোনো স্তরে এমন কিছু বিষয়ের আবির্ভাব ঘটেছে যা তার পূর্বাবস্থায় পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। কারণ থেকে সেখানে কার্যের অনুমান কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ কারণ থেকে এমন কিছু কার্য উৎপন্ন হয়, যা কারণের অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী। কারণের দ্বারা তা সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রিত নয়। সুতরাং, পপার যেহেতু কারণিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বকেই স্বীকার করেন না, তাই অতিনিয়ন্ত্রণের আপত্তি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যই নয়।

জড় জগতের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো দার্শনিকই সংশয় প্রকাশ করেন না। কিন্তু জড় অতিরিক্ত মনোজগতের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়েই যত বিবাদ। পপার জড় জগতের পাশাপাশি মানস জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করারই পক্ষপাতী। শুধু তাই নয়, জড় ও মানস জগত ছাড়াও তিনি তৃতীয় একটি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পপারের ভাষায় প্রথম বা ১নং জগত (world 1) হল জড়বস্তুর জগত। দ্বিতীয় বা ২নং জগত (world 2) হল মানস দশার জগত বা চেতন দশার জগত। এই মানস দশা বা চেতন দশার মধ্যে তিনি মানস প্রবণতা (psychological disposition) এবং অচেতন মানস দশাকেও (unconscious mental states) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় বা ৩নং জগতের সদস্য হল সেইসব বিষয়বস্তু যা মানবমনের সৃষ্টি।

প্রথম জগত হল জড় বস্তুর জগত, যার মধ্যে কেবলমাত্র প্রচলিত জড় বস্তুই নয়, শক্তি বা শক্তিক্ষেত্রও তার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় জগত হল মানস দশার জগত যার মধ্যে চেতন, অচেতন বিভিন্ন দশাগুলি বর্তমান, এমনকি মানস প্রবণতাও তার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় জগতের দ্বারা পপার মানব মনের সৃষ্ট সব বিষয়কেই বুঝিয়েছেন, যেমন, গল্প, কবিতা, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সমস্যা, সামাজিক রীতিনীতি বা যে কোনো শিল্পসৃষ্টিকেই তিনি তৃতীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, যা কিছু মানব মনের উদ্ভাবন, এবং যা কিছু মানুষের চিন্তার বিষয়, সে সবকিছুই এই জগতের অন্তর্ভুক্ত, তা পরিকল্পনাপূর্বকই হোক বা অনিচ্ছাকৃত।

এখন, একথা সত্য যে, পপার যেসব বিষয়কে তৃতীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম জগতেও অস্তিত্ববান। যেমন, কোনো বই বা ভাস্কর্য বা কোনো ছবি। এগুলির অবশ্যই একটি ভৌত বা জড় অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এদের বিষয়বস্তুগুলি, যা একান্তই মানবমনের উদ্ভাবন (যেমন, একটি বইয়ের (জড়) সবকটি প্রকাশনাতেই বইটির বিষয়বস্তু অভিন্নভাবে অবস্থান করে) ঐ বিষয়বস্তুগুলিই পপারের মতে, তৃতীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত।

পপার যখন তৃতীয় জগতের কথা বললেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে তৃতীয় জগত স্বীকারের কারণ দর্শাতে হল। প্রথম জগত তাঁর মতে, জড়বস্তুর জগত, দ্বিতীয় জগত তাঁর মতে, মানস দশার জগত (world of mental states)। এই দুটি জগতের কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। তৃতীয় একটি জগতের আবার কী প্রয়োজন? পপার মনে করেন, যা কিছু মানব মনের সৃষ্টি, সেইসব বিষয়গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। জ্ঞান বলতে আমরা জ্ঞাতার মনে থাকা ব্যক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানকেই বুঝি কিন্তু, পপার জ্ঞানের মনোনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে, জ্ঞান মানব মনের সৃষ্টি। ব্যক্তিনিষ্ঠ যে জ্ঞান তা মানব মনের বিভিন্ন মানস দশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, ফলে তাকে দ্বিতীয় জগতের অংশই বলা যায়, কিন্তু যখন তা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে যায়, তখন তার একটি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় (Popper 1996, 13)। তাঁর মতে, যদি জ্ঞানের বস্তুগত সত্যতা স্বীকার করা না হয়, তাহলে আমরা যেভাবে একটি জ্ঞানকে ব্যবহার করি, বিচার-বিবেচনা করি, গবেষণা করি, তা সম্ভব হতে পারত না; অন্যের মানস দশা হিসেবেই তা থেকে যেত। কিন্তু একটি জ্ঞান বা তত্ত্ব শুধুমাত্র উৎপত্তি মুহূর্তেই মানব মনের সৃষ্টি, তার পরবর্তীকালে তা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী

হয়ে যায়। তিনি ভাষার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ভাষার দ্বারা যখন মনের ভাব প্রকাশিত হয় তখন তা অবশ্যই দ্বিতীয় জগতের বিষয়, কিন্তু ভাষামাত্রই কিছু তথ্য সমন্বিত হয়। তার কিছু অর্থ থাকে, যার থেকে হয়তো তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বার্তা পাওয়া যায়, যা অন্যের কাছে বিচার-বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তাই পপারের মতে, এই ভাষা তৃতীয় জগতের বিষয়। পপারের কথায়, "...if we speak of Platonism or of quantum theory, then we speak of some objective import, of some objective logical content; that is, we speak of the third-world significance of the information or the message conveyed in what has been said, or written." (Popper 1979, 157)। পপারের মতে, তৃতীয় জগতের এই বস্তুগুলি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আরো তৃতীয় জগতের অন্যান্য বস্তু উদ্ভাবনে। ফলে, তৃতীয় জগত, প্রথম জগতকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে, পরোক্ষভাবে হলেও, অর্থক্রিয়াকারী রূপে তৃতীয় জগতের বস্তুর সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। একজন চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর যখন নতুন একটি শিল্পসৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হয়তো অন্যান্য শিল্পী বা ভাস্করেরা নতুন সৃষ্টিতে উৎসাহিত হন। এটা যে শুধুমাত্র জড় জগতের বিষয় দিয়েই হয়, তা নয়, তার শিল্পভাবনাই এক্ষেত্রে মূল উদ্দীপকের কাজ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তৃতীয় জগতের বস্তু দ্বিতীয় জগতের মাধ্যমে কাজ করে, কারণ শিল্পীর শিল্পভাবনা অন্যান্য শিল্পীদের মানস জগতকে প্রভাবিত করে এবং পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় জগতের মাধ্যমে তৃতীয় জগত, প্রথম জগতকে প্রভাবিত করে, যখন অন্যান্য শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টিতে রত হন। তাই পপারের মতে, "...world 3 objects... induce men to produce other world 3 objects and, thereby, to act on world 1; and interaction with world 1 ..." (Popper & Eccles 1985, 39) অর্থাৎ,

প্রথম শিল্পীর সৃষ্টি, যা তৃতীয় জগতের বস্তু, অন্যান্য শিল্পীদের মানস জগতকে প্রভাবিত করে, উদ্দীপিত করে নতুন শিল্প সৃষ্টিতে। নতুন শিল্পীরা যখন কোনো শিল্পসৃষ্টি করেন, তখন প্রথম জগত অর্থাৎ জড় জগতের পরিবর্তন ঘটে।

পপারের মতে, বিজ্ঞানে যেভাবে এই জগতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে এই জগতের নির্মাণ যে ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা স্পষ্ট। যেমন, প্রথমে এই জগতে শুধুই জড় পদার্থ ছিল। জড়কণাগুলি জুড়ে জুড়ে বিভিন্ন মহৎ পরিমাণ স্থূল বস্তুর উৎপত্তি হল। আবার, কোনো এক সময় ঐ কণাগুলির মধ্যে কোনো এক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি কোষের আবির্ভাব হল— সেটি এমন একটি কোষ যেটি আবার বিভাজনে সক্ষম, অর্থাৎ নিজেই নিজের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। সেই কোষগুলি জুড়ে জুড়ে একটি জৈবতন্ত্র গড়ে উঠল। এইভাবেই বিবর্তনের ধারাতে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে আরো অগ্রগতি হতে থাকল। পপার যেহেতু উদ্ভবতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাই তিনি মনে করেন যে, বিবর্তনের ধারাতে অনেকসময় কোনো কোনো স্তরে এমন ঘটনা ঘটেছে, যা তার নিম্নস্তরে পর্যাবসানযোগ্য নয়, আবার নিম্নস্তরের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্যও নয়। বিবর্তনের নিয়মই হল তা ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর অংশের দিকেই অগ্রসর হয়। পপারের দাবী অনুযায়ী, অনেক সময়ই অপেক্ষাকৃত জটিল বস্তুটিতে এমন কোনো ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, যা সম্পূর্ণ নতুন বা অভিনব (novel), যা তার উপাদান অর্থাৎ যে স্তর থেকে তার উৎপত্তি, সেখানে ছিল না। আবার, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই নতুন গুণযুক্ত বস্তুটির কিছু স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতাও (autonomy) আছে, যা তার নিম্নস্তরের কার্যক্ষমতার অতিরিক্ত। জড় জগত থেকে প্রাণের উৎপত্তি বা প্রাণী জগতের মধ্যে মন বা চেতনার আবির্ভাব উদ্ভবের অন্যতম দৃষ্টান্ত। পপার মনে করেছেন, এই জগতের বিভিন্ন বিবর্তিত

বিষয়কে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা সম্ভব, কিন্তু পপারের মতে, অন্ততঃ তিনটি স্তর অবশ্য স্বীকার্য, আমরা দেখেছি, সেই কারণেই পপার তিনটি জগত স্বীকার করেছেন। জড় জগত ও মানস জগত দেকার্তও স্বীকার করেছিলেন। আরো অনেকেই তা স্বীকার করেন। কিন্তু পপার এ প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে, বহুত্ববাদকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, তৃতীয় জগত অবশ্যস্বীকার্য। কারণ, মানবসৃষ্ট বাহ্যজগতের স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, ক্রিয়াশীলতাও আছে এবং তাকে কোনোভাবেই মানস জগতে পর্যবসিত করা সম্ভব নয়। তৃতীয় জগত, দ্বিতীয় জগতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং তার মাধ্যমে উভয় জগতেই পরিবর্তন ঘটে, এবং এর মাধ্যমে পরোক্ষে প্রথম জগতও পরিবর্তিত হয়। এই তৃতীয় জগত হল পপারের মতে, 'world of culture'। প্রাথমিকভাবে জীবজগতে জৈবিক বিবর্তন হলেও পরবর্তীকালে জৈবিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারগত বিবর্তনও ঘটতে শুরু করে। তৃতীয় জগত হল সেই সংস্কারগত বিবর্তনের নিদর্শন।

তৃতীয় জগতের বস্তুগুলি দ্বিতীয় জগতের উপর ক্রিয়া করে, অর্থাৎ, মন বা মানস ঘটনাকে প্রভাবিত করে এবং তার মাধ্যমে প্রথম জগতে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। এখন, প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, সত্যিই কি এর জন্য তৃতীয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যিক? পপার বলছেন, "...if we do not admit problems and theories as the objects of study and of criticism, then we shall never understand the behaviour of scientists." (Popper & Eccles 1985, 40)। কারণ বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেন, তার থেকে নানা দোষত্রুটি খুঁজে বের করেন, বা ঐ তত্ত্বের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণা করেন। কোনো সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজে বের

করেন। এগুলি করাই সম্ভব হবে না, যদি না, মানব মনের বাইরে ঐ তত্ত্বগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়। ব্যক্তিমননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলে কোনো তত্ত্ব সবার কাছে সমানভাবে পর্যালোচনার বিষয় হতেই পারে না। পপার একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। পরমাণু বিজ্ঞান (জড় জগত) সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান সংগ্রহ করার পর কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানীর মনে পরমাণু বোমার সম্ভাবনার চিন্তা জেগে উঠেছিল। এই দ্বিতীয় জগতের চিন্তা তার বাস্তবায়নের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। পরমাণু বোমা আবিষ্কারের এই বর্ণনাতে কোনো স্তরে কোনো অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পপারের মতে, এই আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের আরো কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, যা ঐ বর্ণনাতে অনুল্লেখিতই থেকে গেছে। যখন বলা হচ্ছে যে, বিজ্ঞানীদের 'জড় জগত সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল' (Popper & Eccles 1985, 47), — তখন এই কথার মধ্যেই নিহিত আছে যে, পরমাণু বিষয়ক নানা তত্ত্ব বিষয়ে তাদের জ্ঞান, সেইসব তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা, সেগুলির যৌক্তিক এবং বাস্তব সম্ভাব্যতা প্রভৃতিও তার অন্তর্ভুক্ত। পপারের মতে, এগুলি সবই তো তৃতীয় জগতের বিষয়, কখনোই এগুলি দ্বিতীয় জগতের নয়, কারণ দ্বিতীয় জগত মানস ক্রিয়ার জগত (world of mental process) — এটি একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া আর দ্বিতীয় জগতের সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তুগুলি তৃতীয় জগতের বিষয়। যদিও দ্বিতীয় জগত (মানস) দিয়েই এদের ধরা যায় বা বোঝা যায় এবং এদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয়। আবার, বিজ্ঞানীরা যখন পরমাণুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, সম্ভাব্য তত্ত্ব বা প্রকল্প গঠন করেন — পপারের মতে, সেগুলিও তো তৃতীয় জগতেরই বিষয় হয় "...the search cannot be understood without understanding the objective existence (or

perhaps non-existence) of as yet undiscovered and unembodied methods and solutions.” (Popper & Eccles 1985, 42)।

পপারের এই কথায় বিরুদ্ধ পক্ষ বলতেই পারেন যে, তৃতীয় জগতের বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে শিল্পীর একটি সৃষ্টি যা বিশুদ্ধভাবে জড় জগতের অংশ, তা অন্যান্য শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে ঐ শিল্প অনুকরণে। ফলে, এক্ষেত্রে সবই প্রথম জগতের অংশ, প্রথম জগতের জড় বস্তুর অতিরিক্ত এখানে আর কিছুই নেই।

এই সমালোচনা বা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টান্তই ব্যবহার করেছেন। একজন বৈজ্ঞানিক যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তখন অবশ্যই তিনি কোনো একটি সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করেন, যা একটি মানসিক ক্রিয়া। দ্বিতীয় জগতের সাহায্যে তৃতীয় জগতকে বোঝার চেষ্টা। এর জন্য তাঁর নিশ্চয়ই বিভিন্ন বই বা গবেষণার উপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, যা জড় জগতের বিষয়রূপে উপস্থিত থাকে। এখন, এমন হতে পারে যে, ঐ বইগুলি থেকে তাঁর সমস্যার সমাধান হল না। প্রদত্ত তত্ত্বের মধ্যে তিনি এমন একটি সমস্যার সন্ধান পেলেন, যা তত্ত্বে ব্যক্তই নয়। ফলে, সেই অব্যক্ত সমস্যাকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁকে তাঁর সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে। আবার সমস্যার সমাধানের জন্যও তাঁর সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে। সমাধান খুঁজে পেলে হয়তো একটি নতুন তত্ত্ব হবে। সেই নতুন তত্ত্বকে প্রকাশ করার জন্য একটি ভাষার সাহায্য নিতে হবে। তত্ত্বটি প্রকাশিত হলে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা তা নিয়ে আলোচনা করবেন, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বটির

বৈধতা নির্ণীত হবে। এই মানসিক ক্রিয়া এবং জড় জগতের সঙ্গে তার নানারকম আদানপ্রদানের পর অনেক দূরবর্তী কোনো প্রয়োগে হয়তো এর ফলাফল নজরে পড়বে। জড় জগতে এই তত্ত্বের কারণে হয়তো একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে।

পপার মানস জগত বা চেতন জগতকে দ্বিতীয় জগত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই দ্বিতীয় জগত তাঁর মতে চিন্তনক্রিয়ার জগত। চিন্তনক্রিয়ার অতিরিক্ত চিন্তার বিষয়ের একটি স্থান নির্দিষ্ট করা তাই তাঁর পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। চিন্তন বিষয়ের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। চিন্তন ক্রিয়া বা মানস জগত তাঁর মতে সম্পূর্ণই ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) কিন্তু চিন্তার যে ফসল, চিন্তনক্রিয়াজাত যেসব নতুন নতুন বিষয়ের উৎপত্তি ঘটে, যেমন কোনো তত্ত্ব বা কোনো শিল্প, সেগুলি ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়, তাদের বস্তুনিষ্ঠ (objective) অস্তিত্ব আছে। চিন্তার বিষয় যদি মানস জগতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তার জন্য স্বতন্ত্র জগত স্বীকার করতেই হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, স্রষ্টা যখন কোনো বিষয় সৃষ্টি করেন, তখন সেই বিষয়টি কি স্রষ্টার মনে থাকে না? যদি থাকে, তাহলে তা দ্বিতীয় জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয় জগত অতিরিক্ত তৃতীয় জগতেও তার অস্তিত্ব থাকবে কি? পপার মনে করেন, একটি সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণভাবে তার স্রষ্টার মনে থাকতে পারে না। শেক্সপিয়রের বিখ্যাত রচনা হ্যামলেটের উদাহরণ দিয়ে পপার বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। হ্যামলেট রচনার পূর্বেই সম্পূর্ণ নাটকটি শেক্সপিয়রের মনে উপস্থিত ছিল কিনা সে বিষয়ে পপার সন্দিহান। পপার মনে করেন, রচনার পূর্বে নাটকটির অংশবিশেষ অবশ্যই

শেক্সপিয়রের মনে উপস্থিত ছিল কিন্তু, সম্পূর্ণ নাটকটি রচনার আগেই নাট্যকারের মনে তার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। একজন চিত্রশিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন ফাঁকা ক্যানভাসে প্রথমে একটি রঙের ছোপ ফেলেন, তারপর পিছিয়ে এসে তার প্রভাবটি দেখার চেষ্টা করেন, তারপর সিদ্ধান্ত করেন যে, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে-- তিনি কি দাগটা মুছে ফেলবেন, নাকি ঐ দাগটা থেকে নতুন করে ছবি আঁকার চেষ্টা করবেন। হতেই পারে যে, দাগটার প্রভাবটা দেখার পর তাঁর মাথায় হয়তো নতুন কোনো চিন্তা এসে গেল, যা আগে ছিল না। যেকোনো শিল্পসৃষ্টিই এইভাবেই হয়ে থাকে বলে পপার মনে করেন। তাঁর মতে, দ্বিতীয় জগত ও তৃতীয় জগতের মধ্যে সবসময়ই একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে। শেক্সপিয়রও হ্যামলেট রচনার আগে, পপারের মতে, সম্ভবতঃ নাটকের পূর্ণ রূপটি ভাবতে পারেননি। নাটক রচনার অগ্রগতি নাটকের পরবর্তী গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নাটক রচনাকালে শেক্সপিয়র নিজের সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হয়তো নতুনভাবে নাটকটি সাজিয়েছিলেন। লেখার আগে নিশ্চয়ই কিছু ভেবেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু যেভাবে লিখবেন ভেবেছিলেন, তা হয়তো লেখার সময় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। লেখার আগে পর্যন্ত নাটকটি আদৌ নাট্যকারের মনে ছিল কিনা, তা পপার নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে প্রভাবিত করে স্রষ্টার পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কারণ পপার এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন,— "...it is possible, but we can hardly be sure — that Hamlet was ever in the mind of Shakespere before it was created... there is such an entity as Hamlet, and that it is neither the book nor the hand writing..." (Popper 1996, 22)।

পপার তৃতীয় জগতের সাহায্যে দেহ-মনের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন:

১. তৃতীয় জগতের বস্তুগুলি বিমূর্ত (জড় জগতে যে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তার থেকেও বেশী বিমূর্ত)। কিন্তু সেগুলি সত্তাবান, কারণ প্রথম জগতের পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথম জগত পরিবর্তনে তারা সাধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. তৃতীয় জগতের বস্তুগুলি প্রথম জগতে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হতে পারে, একমাত্র মানব হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই। মানুষের সাহায্য ছাড়া তৃতীয় জগতও কোনোভাবেই প্রথম জগতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তৃতীয় জগতের বস্তুগুলি তাদের সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে বা আরো ভালোভাবে বললে সৃষ্টিকর্তার মননের (mental process) মাধ্যমে প্রথম জগতে ক্রিয়া করতে পারে। ফলে, এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় জগত ও তৃতীয় জগতের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয়।

সুতরাং, মানতে হয় যে, তৃতীয় জগতের বস্তু এবং দ্বিতীয় জগতের প্রক্রিয়া (মানস প্রক্রিয়া) উভয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

পপারের মতে, তৃতীয় জগতের বস্তু যে, প্রথম জগত পরিবর্তনে সাধন (tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়,— সেকথা কেউই অস্বীকার করবেন না। আবার, এই তিনটি জগতের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধও অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জগতের মধ্যে যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান তা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি। পপার মনে করেছেন, দ্বিতীয় জগত ও তৃতীয় জগতের সম্বন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় জগতের সম্বন্ধকে বুঝতে সহায়তা করবে। তাছাড়া এটা স্বীকার করতেই হয় যে, দ্বিতীয় জগত ও তৃতীয় জগতের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমেই তৃতীয় জগতের বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় জগত, তৃতীয় জগতের কোন্ বস্তুকে বেছে নেবে, তাও নির্ধারিত হয়। যেমন, আমরা যখন বাইরের জগতের

দিকে তাকাই, তখন সেখানে অসংখ্য বস্তু উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমরা কোনো একটি বা কয়েকটি বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানসিক জগতে একটি বাছাইকরণ প্রক্রিয়া কাজ করে। আমাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে যে বিষয়টি সংযুক্ত বা যে ঘটনাটি সঙ্গতিপূর্ণ, আমরা কেবলমাত্র সেই বিষয় বা ঘটনার প্রতিই উৎসাহিত থাকি। ঠিক তেমনভাবেই, তৃতীয় জগতের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যেটি আমাদের তৎকালীন মানসিক অবস্থার অনুসারী, কেবলমাত্র সেই বস্তুর সঙ্গেই মানসিক প্রক্রিয়ার অর্থাৎ দ্বিতীয় জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এখন, এর ভিত্তিতে পপার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দ্বিতীয় জগত ক্রিয়াশীল অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী (productive) এবং একইসঙ্গে বিচারশীল (critical)।

পপার বলছেন, এই সৃজনশীলতা ও বিচারশীলতার জন্যই মানব মন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে এবং জটিলতর চিন্তা প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে, যা তার বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। পপার ভাষাকে মানুষের সৃজনশীলতার অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। ভাষাশিক্ষার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে তিনি মানব মনের বিবর্তনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন; যা তাঁর মতে জিনগত বিবর্তন থেকে স্বতন্ত্র এক প্রক্রিয়া রূপেই চিহ্নিত হওয়া উচিত। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের বংশগতির বা জিনগত প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা বিভিন্ন ভাষা শিখতে সমর্থ হই। অন্যদিকে, যখন আমরা বিভিন্ন ভাষা শিখতে চাই, তখন হয়তো তার পিছনে আমাদের কিছু স্বাভাবিক চাহিদা বা উদ্দেশ্য কাজ করে। যেগুলো কোনোভাবেই সচেতন চাহিদা নয়। স্বাভাবিক চাহিদা, হয়তো বা মানবিক চাহিদা, কিন্তু তা কখনোই জিনের গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

নয়। ফলে, পপারের মতে, ভাষা শিক্ষাকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা কখনোই উচিত নয়। এটি একটি সংস্কারগত প্রক্রিয়া (cultural process), ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে পপার মনে করেছেন, আমাদের শেখার প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলে বিবর্তিত জিনগত প্রবণতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। আমাদের চেতন মনের সংস্কারগত প্রক্রিয়াও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা, আমাদের শেখার সচেতন ইচ্ছা বা আগ্রহের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের জিনগত প্রক্রিয়ায় যেমন প্রাকৃতিক বিবর্তন ঘটে এবং তার ভিত্তিতে আমাদের কিছু স্বাভাবিক প্রবণতার সৃষ্টি হয় তেমনি কিছু সংস্কারগত বিবর্তনের কারণে আমাদের মনোজগতও বিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেমন জিনের বিবর্তন হয়, তেমনি বিবর্তনের গতিধারায় তার মনোজগত বা চিন্তার জগতেও পরিবর্তন ঘটে। মানব মন সৃষ্ট চিন্তাই মানব মনকে আরো বেশী চিন্তাশীল করে তোলে। তার ফলে মানব মনের বিবর্তন ঘটে। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একইভাবে, পপার দাবী করেছেন যে, মানব জগতের বিবর্তনের ইতিহাস নিছক মানুষের জিনগত বিবর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। বিজ্ঞান যদিও মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপকেই জিনগত যান্ত্রিক বিবর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতেই আগ্রহী কিন্তু, পপার মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই বর্তমান কম্পিউটারের যুগ পর্যন্ত মানব প্রজাতির বিবর্তন কেবলমাত্র তার জিনের বিবর্তনের পরিণাম হতে পারে না, বরং পপার মনে করেন, মানব মন এবং তার সৃষ্টি, তার বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে

তাকে সাহায্য করেছে, আরো বেশী সৃষ্টিশীল হতে; এবং সেই ইচ্ছা বা কামনাই তার অনুসারী দৈহিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

বিবর্তনের ধারায় মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায় আদিকাল থেকেই মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নানাধরনের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শুরু করেছে। বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেমন বদলেছে, তেমনি তার বানানো যন্ত্রপাতির আকার প্রকারও বদলেছে। পপার মনে করেছেন যে, আজ পর্যন্ত মানুষ যত যন্ত্রপাতি বা সাধন (tool) আবিষ্কার করেছে তার কোনোটিই মানুষের জৈবিক বা জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের চিন্তাতেও পপারের এই কথা সমর্থিত হয়। বিবর্তনের ধারায় মানুষ যত বেশী অগ্রসর হয়েছে, তার মনোজগত তত পরিপক্ক হয়েছে এবং তার সঙ্গে তার ব্যবহার্য জিনিস, যন্ত্রপাতিও তত সূক্ষ্ম ও জটিল হয়েছে। বাহ্যিক প্রয়োজন অনুসারে মানুষ তার সমস্যাকে উপলব্ধি করে সচেতনভাবে তার সমাধানের উপযোগী যন্ত্র বানাতে উদ্যোগী হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিগত দিক থেকে অর্থাৎ জৈবিক দিক থেকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার লক্ষ্যে খাদ্য সংগ্রহে আগ্রহী এবং আত্মরক্ষাপ্রবণ। এগুলি মানুষের সহজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার ভিত্তিতে মানুষ প্রথম তার আত্মরক্ষার সাধন হিসেবে হাতিয়ার বানানোর চিন্তা করেছিল। আদিম মানুষ বড় বড় পাথর ছুঁড়ে পশুদের তাড়ানোর চেষ্টা করত বা তাদের আহত করে খাদ্য সংগ্রহ করতে চাইত। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা অনুভব করল যে, পাথরটা যদি তীক্ষ্ণ হয়, তাহলে আঘাতটা তীব্রতর হয়। তাই তারা তীক্ষ্ণ পাথর সংগ্রহ করতে শুরু করল এবং ভোঁতা পাথরকে তীক্ষ্ণ বা ধারালো করার পদ্ধতি আয়ত্ত করল। এখন, এই যে উত্তরণ, হাতিয়ারের এই আধুনিকীকরণ অবশ্যই মানব মনের বিবর্তনের ফল বলে পপার মনে

করেছেন। এক্ষেত্রে, জৈবিক কোনো প্রভাব নেই। মানুষের আঙুলের ক্রিয়াশীলতা বা সক্রিয়তার বৃদ্ধি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই সৃষ্টিশীলতা মানব মনের ফসল। দ্বিতীয় জগত ও তৃতীয় জগতের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। মানব মনের ফসল তার মনের উপর ক্রিয়া করে, তার চিন্তাকে আরো উন্নত হতে সাহায্য করেছে। সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ বা ধারালো অস্ত্র বানানোর তাগিদ তার জৈবিক অভিযোজন ঘটাতে সাহায্য করেছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরোক্ষে প্রথম জগতেও পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। এই যে জৈবিক পরিবর্তন ঘটেছে, তাকে নিম্নমুখী কারণতার (downward cousation) দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। আবার, নতুন নতুন অস্ত্রের আবির্ভাবও জড় জগতে পরিবর্তন এনেছে। এখন, প্রশ্ন হল, দ্বিতীয় জগত ও প্রথম জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কি কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব? অর্থাৎ জড় জগত ও মানস জগতের মধ্যে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ হতে পারে? যদি হয়, তাহলে সেটা কীভাবে সম্ভব?

কার্তেসীয় তত্ত্বে দেহ-মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধই স্বীকার করা হয়েছিল। দেকার্তের কাছে জড় জগত বিস্তৃতিযুক্ত ও অভেদ্য (impenetrable) এবং সমগ্র জড় জগতকে তিনি একইধরনের জড় বস্তুর প্রবাহ হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, গতির তারতম্যের জন্যই একটি জড় বস্তু, অন্য জড় বস্তুর থেকে পৃথক হয়ে যায়। পপার চিন্তা করেছেন, দেকার্ত যেহেতু সারধর্মে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর মতে দেহের সারধর্ম হল বিস্তৃতি, তাই দেহ সম্পর্কিত কার্যকারণ ধারণাকে তিনি জড় জগতের যান্ত্রিক কার্যকারণের ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দেকার্তের মতে

জড় জগতের সব কারণিক সম্বন্ধই আবশ্যিকভাবে যান্ত্রিক চালিকাশক্তির (mechanical push) উপর নির্ভর করে (Popper & Eccles 1985, 176)। পপারের মতে, দেকার্তের এই ধারণাই কার্তেসীয় তত্ত্বে দেহ-মনের সম্বন্ধকে জটিলতর করে তুলেছিল। দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও দেকার্ত দাবী করেছিলেন যে, ঘড়ি যে যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে, অজড় মনও দেহের উপর ঠিক সেভাবেই কাজ করে। পপার মনে করেছেন, দেকার্ত এভাবে এক অবাঞ্ছিত সমস্যাকে ডেকে এনেছেন,— "... in trying to combine the doctrine of incorporeality of the soul, and of interaction, with a mechanistic and monastic principle of physical causation, Descartes created an entirely new and unnecessary difficulty." (Popper & Eccles 1985, 176-177)।

পপার বলেছেন যে, দেকার্ত যেহেতু সারধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর মতে, দেহের সারধর্ম হল বিস্তৃতি, তাই তিনি দেহ সম্পর্কিত কার্যকারণের ধারণাকে অন্যান্য জড় জগতের যান্ত্রিক কার্যকারণ ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন,— যা তাঁর মতে ভৌত ক্রিয়াকর্ম মাত্র, যা যান্ত্রিক চালিকা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (mechanical push), পপারের কথায়, "The great difficulty of the Cartesian theory of mind-body interaction lies in the Cartesian theory of physical causality according to which all physical action must be by mechanical push." (Poper & Eccles 1985, 180)।

দেকার্ত মনে করতেন, জড় জগতে পরিবর্তনের কারণ হল বস্তুগত সংযোগ, চৌম্বকার্ষণও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক ভৌত পরিবর্তন বা গতির কারণ হল সেই বল (force) যা জগত সৃষ্টির সময় ঈশ্বর নির্দিষ্ট পরিমানে প্রদান করেছিলেন। দেকার্ত প্রদত্ত এই বলের (force) ধারণা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছিল। কেপলার প্রমুখ

বিজ্ঞানীরা এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে, এমন দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হচ্ছে যারা কোনোভাবেই দৈহিক দিক থেকে সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ একটি বস্তু দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে অন্য একটি বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করছে, কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধকে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অথচ কার্তেসীয় যান্ত্রিক কার্যকারণতার তত্ত্ব দিয়েও তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে কারণ ও কার্য কোনোভাবেই দৈহিক দিক থেকে সংযুক্ত নয়। এর অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত হল, গাছ থেকে আপেলের মাটিতে পড়া। মাটির সঙ্গে আপেলের দৃশ্যতঃ কোনো যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু অবশ্যই কোনো একটি অদৃশ্য কারণবশতঃই যে আপেল সবসময় মাটিতেই (পৃথিবীর দিকে) পড়ে, তা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবী কোনোভাবে আপেলকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কীভাবে? বলের ধারণা এক অর্থে ছিলই, কিন্তু দূরবর্তী স্থান থেকে তা কীভাবে সম্ভব, তা বিজ্ঞান বুঝতে পারেনি, এই চিন্তাই বলের ক্ষেত্র (field of force) আবিষ্কারে সহায়তা করল। বিজ্ঞান ভাবতে শুরু করল যে, দুটি বস্তু দূরবর্তী স্থানে থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যবর্তী একটি বলক্ষেত্র (field of force) তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, যার মাধ্যমে একটি বস্তু অন্য বস্তুকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু একটি জড় (বিস্তৃতিযুক্ত) বস্তু, অন্য একটি জড়বস্তুকে সরাসরি প্রভাবিত করে না। দুজনের মধ্যে থাকা বলক্ষেত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। প্রথম জড়বস্তুটি বলক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে, বলক্ষেত্র তার অন্যপ্রান্তে থাকা অন্য জড়বস্তুটিকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ দেকার্ত স্বীকৃত কার্যকারণের ধারণাটি এক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিজ্ঞান ক্রমশ এই ধরনের নতুন চিন্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করল। অর্থাৎ দেকার্ত স্বীকৃত

কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক যান্ত্রিকতা তত্ত্ব যে শুধু বাতিল হল, তাই নয়, পদার্থবিজ্ঞানে স্বীকৃত মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। আণবিক তত্ত্ব বিশ্বাস করত যে, পরমাণু সংযোগ এবং পরমাণুর গতির ভিত্তিতেই জড় জগতকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু বলক্ষেত্রের ধারণা এই তত্ত্বের পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। দুটি পরমাণুর মধ্যবর্তী স্থানটি যদি শূন্য হয়, তাহলে একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর দিকে যেভাবে ধাবিত হয়, দুটি পরমাণুর মধ্যবর্তী স্থানে যদি একটি বলক্ষেত্র থাকে তাহলে পরমাণুর গতি বা গতিমুখ পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবত, জগতে যেহেতু বলক্ষেত্রের অবস্থান রয়েছে, তাই তাকে অস্বীকার করে জড় জগতকে ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। বল ক্ষেত্রকে বিবেচনার মধ্যে রেখেই তাই পদার্থবিজ্ঞান জড় জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

পদার্থবিজ্ঞান যেমন বলক্ষেত্র বা 'field of force' মেনে নিল, পপার মনে করেছেন, মনোবিজ্ঞানের জগতেও চেতন মন বা অচেতন মনকে মেনে নেওয়া যেতেই পারে। তথাকথিত প্রচলিত বিজ্ঞান যখন প্রত্যক্ষযোগ্য কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হল না, তখন পদার্থবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডিকে আরো বড় করতে হবে। এতদিন যেভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল, নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দেখা গেল, সেগুলি পর্যাপ্ত নয়। ফলে, কিছু কিছু নতুন বিষয় (যেমন- বলক্ষেত্র) পদার্থবিজ্ঞানের জগতে স্বীকৃতি পেল। পপার, এই একই যুক্তি দেখিয়ে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, মানব সৃজনশীলতার যথাযথ ব্যাখ্যা দেবার জন্য মানব মনের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। মানুষের যা কিছু সৃষ্টি তা সে তত্ত্বই হোক, গল্পই হোক বা মূর্তিই হোক বা যন্ত্রই হোক— এগুলির কোনোটির উৎপত্তিকেই

কেবলমাত্র জড় জগত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানব মনের অস্তিত্ব এই কারণেই স্বীকার করতে হবে। এর ব্যাখ্যাগত গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানব মনের সৃষ্ট এই বিষয়গুলি মানব মনের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানব মনের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। পপার মনে করেন, মানব মনের বিবর্তন সম্ভব হত না, যদি না তা নিজের সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হত। আদিম মানুষ অস্ত্র তৈরি করল সেই অস্ত্রের সাফল্য, ক্রিয়াশীলতা তাকে অনুপ্রাণিত করল, তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করল, এবং কীভাবে ঐ যন্ত্রকে আরো উন্নত করা যায়, তা সে ভাবতে লাগল। এভাবেই মনের বিবর্তন স্তরে স্তরে এগোতে লাগল। তবে, জড়বাদী বিজ্ঞান কিন্তু কখনোই পপারের এই যুক্তি মানতে চাইবে না। জড়বাদ সবসময়ই 'closedness of the physical World 1'-এ (Popper & Eccles 1985, 51) বিশ্বাস করে; জড়বাদীরা বলবেন, জড় জগতের সব ঘটনাকেই জড় জগতের তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তার জন্য জড় অতিরিক্ত কোনো কিছু স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। জড়বাদী বিজ্ঞান বল বা বলক্ষেত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তা জড় অতিরিক্ত নয়, তাই জড় জগতে বলের অস্তিত্ব স্বীকারে কোনো বাধা নেই। এগুলি জড় জগতেরই অনাবিষ্কৃত অংশ, যা পরবর্তীকালে স্বীকৃতি পেল।

পপার এ প্রসঙ্গে মন ও বলের মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। মন বলতে তিনি বোঝেন এমন এক সত্তা যা কোনো একটি স্থানে অবস্থান করে অথচ তা বিস্তৃতিহীন (unextended), বিদেহী (incorporeal), কিন্তু দেহের উপর ক্রিয়া করতে সক্ষম (capable of acting on bodies)। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে তা দেহের উপর নির্ভরও করে (dependent upon body) এবং দেহের দ্বারা প্রভাবিতও হয় (capable of being influenced by bodies)। এর সঙ্গে পপার মনের কালীক (temporal) অবস্থানও স্বীকার করেন। এই

জগতের কোনো একটি বস্তুতে এই সবকটি ধর্মের উপস্থিতি শুধু জড়বাদী কেন, কেউই হয়তো স্বীকার করবেন না। যদিও তিনি মনে করেন, এমন বস্তু এই জগতে আছে যাতে ঐ সবকটি বৈশিষ্ট্যই থাকে। পপারের মতে, বলের (force) মধ্যে এই সবকটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। বৈদ্যুতিক বল (electrical force), চৌম্বকীয় বল (magnatic force) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়ে তিনি দাবী করেছেন যে, এদের ক্ষেত্রে এই সবকটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাঁর মতে, নিউটনের বলের ধারণায় এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত। তাই তিনি নিউটনের বল সংক্রান্ত ধারণা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নিউটন বল বলতে এমন এক পদার্থকে বুঝেছেন যা অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়া করতে সমর্থ, যা কোনো একটি স্থানে অবস্থান করে (located) কিন্তু তার কোনো বিস্তৃতি নেই। নিউটনের বলের ধারণা থেকে পপারের মনে হয়েছে যে, এই বলের শুধু দিক নির্দেশ বা অভিমুখ আছে (directon) অর্থাৎ তা ভেক্টর (vector)। ভেক্টর কখনো বিস্তৃতিযুক্ত হয় না। Vector-এর শুধু পরিমাণ (magnitude) আর অভিমুখ (direction) থাকে। অর্থাৎ নিউটন স্বীকৃত বলের প্রাবল্যও (intensity) আছে। বলের মান ও অভিমুখকে এককথায় বলের প্রাবল্য বলে। যেমন দুটি বিপরীত আধান (charge) যদি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে। এই আকর্ষণ বলের মান ও অভিমুখকে এককথায় বলের প্রাবল্য বলে। পপার নিউটনের বলের ধারণা অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, বলের ছয়টি বৈশিষ্ট্য যখন মনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তখন বলাই যায় যে, বলের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে 'intensity' বা 'প্রাবল্য' নামক যে বৈশিষ্ট্যটি নিঃসৃত হচ্ছে সেটিও অবশ্যই মনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

এই (সাদৃশ্যমূলক) যুক্তির ভিত্তিতে পপার সিদ্ধান্ত করলেন যে, মনের বিস্তৃতি না থাকলেও, বলের মতো তার প্রাবল্য বা intensity আছে। সুতরাং মনকে কাতের্সীয় নীতি মেনে আর ভৌতজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ভৌতধর্মের বিরুদ্ধ গুণযুক্ত পদার্থ বলে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। এবং, এর ফলে, ভৌতজগত ও মনোজগতের মধ্যে সেতুবন্ধন সহজতর হবে, বলে পপার আশা করেছিলেন। তাই, পপারের দাবী হল, বল বা বলের ক্ষেত্রকে যদি ভৌতবিজ্ঞানে স্বীকার করা সম্ভব হয়, তাহলে মনকেও স্বীকার করা উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সহজ কথায় বলের ধারণা হল, যা আকর্ষণ বা বিকর্ষণে সক্ষম, যে বল যত জোরে আকর্ষণ করে তার মান তত বেশী। মানব মস্তিষ্কে থাকা তড়িৎচৌম্বকীয় বলের মান অতি নগণ্য, কিন্তু তা শূন্য নয়। তার মান এবং অভিমুখ উভয়ই আছে।

পপারের মতে, দেহ-মনের সমস্যার মূল কারণ হল, জড়বস্তু এবং বল বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণার অভাব। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বল জড়বস্তুর সঙ্গে নিছক জুড়ে থাকে; কিন্তু পপার মনে করেন, বলের স্বাতন্ত্র্য আছে। জড়বস্তু বা জড়তন্ত্র (substantial process) থেকে স্বতন্ত্রভাবে বলের নিজস্ব অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। বিশেষত, জৈব-রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত বল এই ধরনের নিজস্বতা অর্জন করে বলেই পপার মনে করেন। কারণ একথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের মস্তিষ্কের একটি বড় অংশ, আমাদের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তড়িৎচৌম্বকীয় (electromagnetic) তরঙ্গের দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত। মস্তিষ্ক অনেকটা তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের চিন্তা ভাবনা, স্মৃতি, মনোযোগ অবশ্যই এই তরঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলি একধরনের চেতন ক্রিয়া, আর তার কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই

পপার মনে করেছেন (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 179)। আমাদের মনও, তাঁর মতে, এইরকমই একটি বল যার দেহ অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য আছে। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে গিলবার্ট রাইল 'Ghost in the machine'-এর কথা বলেছিলেন। মানব আত্মা যেন মানবদেহে প্রেতাত্মার মতো থাকে, কারণ তা অশরীরী, তাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না অথচ সে ক্রিয়াশীল। পপারের মতে, মানবদেহে উপস্থিত বল-ই হল ঐ প্রেতাত্মার জনক,— "The forces contribute to the ghost in the machine." (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 170) তিনি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উড়োজাহাজে স্বয়ংক্রিয় চালনার ব্যবস্থা থাকে। পাইলট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালিয়ে দিলে, ঐ যন্ত্রটিই উড়োজাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই স্বয়ংক্রিয় চালক বা 'automatic pilot' যন্ত্রটি বলের মাধ্যমেই ক্রিয়া করে। বল হল তাই যা একটি জড়বস্তুর গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে সক্ষম। নিউটনের তত্ত্বে বলকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'Automatic pilot' যন্ত্রটি উড়োজাহাজে যে কাজটি করে, পপার মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্কও মানবদেহে সে কাজটি করে। একথা বলা মাত্র প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে তো পপার স্বীকার করে নিলেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক পূর্বনির্ধারিত। কারণ, উড়োজাহাজের 'automatic pilot' যন্ত্রটি তো পূর্বনির্ধারিত (programmed)। পপার মনে করেন যে, আমরা সকলেই জন্মসূত্রে আংশিকভাবে পূর্বনির্ধারিত (programmed), কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। প্রাণী তার সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ কিছু আচরণ অবশ্যই করে। জন্মগতভাবে সে কিছু অর্থে তার জিনের গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। প্রাণীমাত্রই আত্মরক্ষাপ্রবণ, বংশবৃদ্ধি করতে, খাদ্যসংগ্রহ করতে আগ্রহী। তবে, পপারের মতে, আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়। অন্তত, মানুষের

ক্ষেত্রে তো বলাই যায় যে, মানুষ এমন কিছু কাজ করে যা পূর্বনির্ধারিত নয়। আদিম মানুষ জঙ্গলে দাবানল দেখেছে, অন্যান্য প্রাণীদের মতো তারাও আগুন দেখে ভয় পেয়েছে। তার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। তারপর হঠাৎ একদিন হয়তো পাথর নিয়ে ঘষতে ঘষতে আগুনের ফুলকি আবিষ্কার করেছে। আগুনের ফুলকি দেখে বা সেই আগুনের ফুলকি শুকনো পাতায় পড়ে যখন আগুন লেগেছে, তখন তারা হয়তো ভয়ই পেয়েছে। কিন্তু তারপরে তারা উপলিব্ধ করেছে যে, আগুন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, তাকে ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে যদি আগুনকে রাখা যায়, তাহলে তা মানুষের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এই চিন্তা যখন মানুষের মধ্যে এসেছে, তখন তার জিনগত নির্ধারণের কোনো ভূমিকা সেখানে ছিল না। আগুনের মতো বিধ্বংসী একটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার যে পারদর্শিতা তারা দেখিয়েছিলেন, তা কখনোই, কোনোভাবেই তাদের জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এই নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার অভিযোজন হয়তো তার মিউটেশনে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল অর্থাৎ জিনগত নির্ধারণ বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, বরং বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন জিনগত নির্ধারণের পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই পপার মনে করেন, অনেকসময়ই আমরা এমন অনেক কাজ করি, যা পূর্বনির্ধারিত থাকে না। আমাদের মনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, নানা সমস্যার উপস্থিতি উপলব্ধি করি। পপার মনে করেন, যদি জগত সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হত, তাহলে আমাদের মনও নিয়ন্ত্রিত হত, সেক্ষেত্রে কখনোই নতুন কোনো সমস্যা আমাদের মনে উদিত হত না, বা প্রশ্ন জাগত না। পপারের কথায়, "Lots of mechanisms take place in the world, and they are

all much too complicated to be deterministically programmed." (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 174)।

পপারের মতে, আমাদের মস্তিষ্কের যে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ (electro-magnatic wave) কাজ করে, তা অস্বীকার করা যায় না। এটি মস্তিষ্কের একটি শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ হিসেবেই উপস্থিত থাকে। পপার মনে করেছেন, এটি আমাদের মস্তিষ্কের অচেতন অংশকেই (unconscious) বোঝায়। এখন, আমাদের চেতন মন যখন কোনো সমস্যার সমাধান করতে চায় তখন আমাদের মন ঐ অচেতন ভৌত বলের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে যুক্ত হয়।

> "...that the compicated electro-magnetic wave fields, which, as we know, are part of the physiology of our brains, represent the unconisous parts of our minds, and that the conscious mind — our conscious mental intensities, our conscious experiences — are capable of interacting with these unconscious physical force fields, especially when problems need to be solved that need what we call "attention." (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 179)।

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, মন আর ভৌত বলের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, পপারের তত্ত্বে 'মন' কিন্তু কার্তেসীয় 'মনের' ধারণার দ্বারা প্রভাবিত নয়, অর্থাৎ তা ভৌত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন, অতীন্দ্রিয় কোনো সত্তা নয়। বরং, আমরা আগেই দেখেছি যে, পপার 'মন' এবং ভৌত 'বলে'র মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। প্রায় সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ

সম্বন্ধ স্বীকার করা যেতেই পারে। সে কারণেই তিনি মন ও অচেতন ভৌত বলের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে পেরেছেন।

পপারের এই চিন্তা থেকে মনে হয় তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রটি যাকে তিনি অচেতন স্তর বলেছেন তা স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও চেতন মনের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দুটি স্তরে হয়ে থাকে,-- স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরের সঙ্গে মধ্যবর্তী অচেতন স্তরের এবং অচেতন (তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র) স্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরীয় চেতন স্তরের। পপারের এই প্রকল্প অনুসারে চেতন ও জড়দেহের সম্বন্ধ তিনটি স্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পপার মনে করেছেন, 'unconscious' বা অচেতন হল মস্তিষ্কের সেই অংশ যা মস্তিষ্কের পেশীর দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু মনের কোনো নজর তার উপর থাকে না অর্থাৎ মনোযোগের সীমানার বাইরে মস্তিষ্কের এই অংশটি ক্রিয়াশীল থাকে। পপারের ভাষায়, "... there is a margent process, a process where mind and brain are no longer really distinguishable." (Popper, Lindahl and Arhem 1993, 172)।

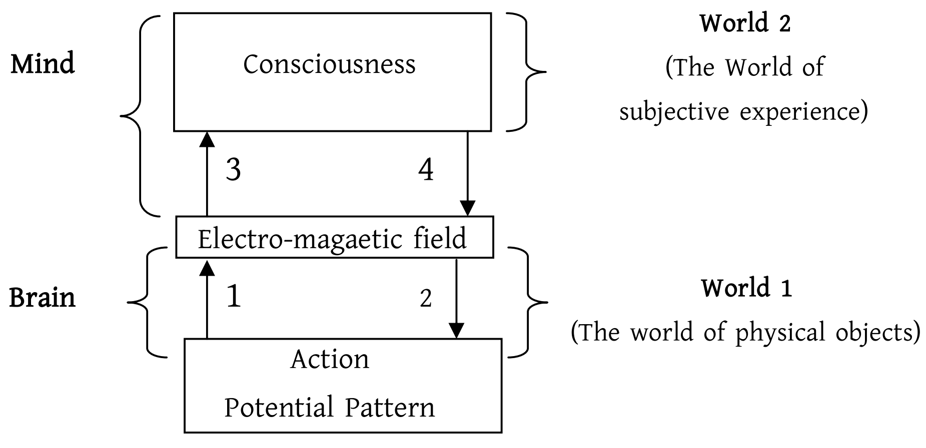

[B.I.B. Lindahl ও P. Arhem তাঁদের "Mind as a Force Field" প্রবন্ধে পপারের প্রকল্পকে (উপরের) চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।] (Lindahl and Arhem 1994, 115)

পপারের এই প্রকল্প কতটা গ্রহণযোগ্য তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ, কিন্তু পপারের এই প্রকল্পের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। দেহ-মনের সম্বন্ধ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। দেকার্তই সর্বপ্রথম এই সম্বন্ধকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি। কারণ জড়দেহ কীভাবে অজড় মনের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে, তা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। দেকার্ত দেহকে বিস্তৃতিযুক্ত জড় এবং মনকে বিস্তৃতিহীন অজড় রূপে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছিলেন যে, আর তাদের মধ্যে কোনোরকম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব হয়নি। পপার তাঁর নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। জড় জগত দৈশিক অবস্থানযুক্ত আর মন জগত দৈশিক অবস্থানহীন বলে দেকার্ত মনে করেছেন। কারণ দেকার্ত বিস্তৃতির মাপকাঠিতে এদের সম্বন্ধকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। পপার কিন্তু দেকার্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। তাঁর মতে, মন বিস্তৃতিহীন হলেও দৈশিক অবস্থানযুক্ত (located)। কালীক অবস্থান তো দেকার্তও স্বীকার করেছেন, পপারও স্বীকার করেছেন। পপার লক্ষ্য করেছেন যে, দেকার্ত দেহ-মনকে বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করার কারণেই তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই তিনি মনে করেছেন যে, মনের সঙ্গে যেহেতু বলের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য আছে তাই মনকে বলসদৃশ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বলমাত্রই বলক্ষেত্রের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। তাই তিনি বলসদৃশ মন ও স্নায়ুতান্ত্রিক জগতের মধ্যে একটি বলক্ষেত্রের উপস্থিতি অনুমান করেছেন, যাকে তিনি অচেতন মন বলে মনে করেছেন-- এটি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের মাধ্যমেই চেতন মন ও স্নায়ুতান্ত্রিক জগতের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতে

পারে বলে তিনি মনে করেছেন। স্নায়ুতান্ত্রিক জগত ও চেতন জগতের মধ্যে সরাসরি মিথষ্ক্রিয়া (interaction) হয় না। দুটি স্তরে তা সম্ভব হয়। স্নায়ুতান্ত্রিক জগত তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে এবং তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র আবার চেতন স্তরকে প্রভাবিত করে। চেতন স্তরও আবার তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমেই স্নায়ুতান্ত্রিক জগতকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি এমন এক বলক্ষেত্রের কথা বললেন যা চেতন ও নিশ্চেতনের মেলবন্ধন স্থল, যা দৈহিক ও মানস জগতের মধ্যবর্তী একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। এটি দেহ ও মনের সন্ধিস্থল যেখানে হয়তো মন ও মস্তিষ্ক এমন একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে মন ও মস্তিষ্ককে হয়তো আর স্বতন্ত্রভাবে পৃথক করা সম্ভব হবে না বলেই পপার অনুমান করেছেন। বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি একটি মূর্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। যখন একজন ব্যক্তি প্রথম পিয়ানো বাজাতে শেখেন, তখন তিনি প্রাথমিক স্তরে, পিয়ানো বাজানোর প্রতিটি পদ্ধতি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সচেতন থাকেন। ধীরে ধীরে যখন তিনি শিখে যান, তখন দ্বিতীয় স্তরে বাজানোর প্রক্রিয়ার প্রতি তিনি আর ততটা মনোযোগী থাকেন না। বরং তিনি যে সঙ্গীতটি পরিবেশন করতে চান সেই বিষয়েই বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁর আঙুলগুলো কোন রিড-এ পড়ছে, কীভাবে তিনি তার দুহাতের আঙুল একসঙ্গে চালনা করছেন, সেগুলি তাঁর দৈহিক স্তরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পিয়ানো বাজানোর পদ্ধতি চেতন স্তরে থাকলেও, সেই স্তরটি লুপ্ত হয়ে যায় যখন তিনি বাজানোর প্রক্রিয়াটি রপ্ত করে ফেলেন, বিষয়টি তখন অচেতন স্তরে চলে যায়। পপার মনে করেছেন অচেতন মন হল এমন একটি বিষয় যার মানস এবং

ভৌত উভয় বৈশিষ্ট্যই আছে। তার মাধ্যমে তিনি দেহ-মনের কার্যকারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

পপারের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন হয়তো সঙ্গতভাবেই উঠবে কিন্তু সেই সব প্রশ্ন বা আপত্তি নিয়ে আলোচনা আমার গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। সার্লের উদ্ভবের ধারণার বিকল্প হিসেবে পপারের তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে এবং সার্লের তত্ত্বের অপূর্ণতা পপারের তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে পূরণ করা সম্ভব কিনা, তা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। সার্ল এবং পপার দুজনেই বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। সার্ল পদার্থবিজ্ঞানকে আদর্শ মেনে নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের অনুষঙ্গী হয়ে চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সে কারণেই তাঁর তত্ত্বে মানস কারণতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। পপার পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণবাদকে পরিত্যাগ করে জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী ধারণার সাহায্যে উদ্ভবের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই কারণেই তাঁর পক্ষে নিম্নমুখী কারণতার সম্ভাবনাও দেখানো সম্ভব হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

1. Broad, C. D. 1925. *The Mind and Its Place in Nature.* London : Routledge and Kegan Paul.
2. Lindahl, B. I. B. and Arhem, P. 1994. Mind as a Force Field : Comments on a New Interactionist Hypothesis. *J. Theo. Biol.* 171 : 111-122.
3. Morgan, L. C. 1923. *Emergent Evolution.* Lodnon : Williams and Norgate.
4. Popper, K. R. 1978. Natural Selection and Emergence of Mind. *Dialectica.* 32(3-4):339-355.

5. Popper, K. R. 1979. *Objective Knowledge : An Evolutionary Approach*. Oxford : Clarendon Press.
6. Popper, K. R., Eccles, J. C. 1985. *The Self and its Brain*. London : Springer International.
7. Popper, K. R. Lindahl, B. I. B, Arhem, P. 1993. A Discussion of the Mind-Brain Problem. *Theoretical Medicine*. 14 : 167-180.
8. Popper, K. R. 1996. *Knowledge and the Body-Mind Problem : In Defence of Interaction*. London : Routledge.

উপসংহার

দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা : একটি প্রকৃতিবাদভিত্তিক বিকল্প প্রস্তাব

বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু, তার জন্য মনের স্বরূপ নির্ধারণ করা আবশ্যিক, যেহেতু মনের প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে যে, মন জগতের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। দার্শনিকরা সে কারণেই যুগ যুগ ধরে মন বা চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে মনোনিবেশ করেছেন।

দার্শনিক জন সার্লও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকেই চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এখন, এই বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার তাৎপর্য কী? বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল বলতে আমরা বুঝি বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা, নিয়ম-নীতির অনুষঙ্গকে। কিন্তু, সার্ল চেতনাকে বা দেহ-মনের সম্বন্ধকে যখন বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে ব্যাখ্যা করতে চান, তখন তিনি বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি মেনে যে শুধু চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তাই নয়, একইসঙ্গে তিনি আরো একটি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক জগত জড়বাদী চিন্তার জগত। জড় অতিরিক্ত কোনো বস্তুর স্বকীয় অস্তিত্ব সেখানে স্বীকৃত নয়। কার্তেসীয় দর্শনে চেতনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেভাবে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে নেই। সার্ল তাই মনে করেছেন যে, দেহ-মনের সম্বন্ধকে ততদিন সফলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না,

যতদিন কার্তেসীয় দ্বৈতবাদী চিন্তার দ্বারা মনোদার্শনিকরা প্রভাবিত হবেন। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদে জড় ও মনকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আধার রূপে গণ্য করা হয়েছিল। জড় মাত্রেই বিস্তৃতিযুক্ত আর মন হল চেতনা বিশিষ্ট। মন, কার্তেসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, কখনোই জড় হতে পারে না। জড় ও মনের মধ্যে দেকার্ত এত দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন যে, কার্তেসীয় অ-জড় মনকে কোনোভাবেই জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা যায় না। সার্ল তাই অভিযোগ করেছেন যে, দ্বৈতবাদ তো বটেই, এমনকি জড়বাদও দেকার্ত স্বীকৃত দেহ-মনের দ্বিকোটিক বিভাজনের দ্বারা পরোক্ষে প্রভাবিত। দেকার্ত মানস জগতকে জড় জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। মন দেকার্তের কাছে অতীন্দ্রিয় একটি সত্তা রূপে বিবেচিত হয়েছিল। জড়বাদও দেকার্ত স্বীকৃত মনের এই লক্ষণকেই অনুসরণ করে তাকে অতীন্দ্রিয় সত্তা রূপে গ্রহণ করেছে এবং এই জগতের অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছে।

সার্ল মনে করেছেন যে, দ্বৈতবাদ ও জড়বাদ উভয়ই চেতনা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও, কোনো বক্তব্যই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, আবার সম্পূর্ণ সঠিকও নয়। জড়বাদীরা যখন বলেন যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে উৎপন্ন হয়, তখন সার্লের মতে তাঁরা সঠিক কথা বলেন। কিন্তু জড় অতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানতে যখন তাঁরা অস্বীকার করেন, তখন কিন্তু তাঁরা সঠিক কথা বলেন না। আবার, দ্বৈতবাদীরা যখন দেহাতিরিক্ত অর্থাৎ জড় জগত অতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্বের দাবী করেন, সেই দাবীও সার্ল সমর্থন করেন না; যদিও দ্বৈতবাদীরা চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বললে, তিনি তা সঠিক বলেই বিবেচনা করেন। অর্থাৎ সার্ল দ্বৈতবাদ ও জড়বাদের

মধ্যবর্তী একটি পথ বেছে নিতে চেয়েছেন। তিনি চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান, কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মার বা চেতনার অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। সেকারণেই তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা মানতে চাননি। সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, যদিও চেতনাকে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত বলে গণ্য করেন না। স্বাভাবিকভাবেই সার্লের এই চিন্তা স্ববিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু সার্ল প্রকৃতপক্ষে দু'ধরনের পর্যাবসানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, — (১)কারণিক পর্যাবসান (causal reduction) ও (২) সত্তাগত পর্যাবসান (ontological reduction) । কারণিক ক্ষমতা বিশিষ্ট দু'ধরনের বস্তুর সম্বন্ধ যদি এমন হয় যে, একজনের কারণিক ক্ষমতা অন্যজনের কারণিক ক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রটিকে কারণিক পর্যাবসানের স্থল হিসেবে গণ্য করা যাবে। অন্যদিকে, সত্তাগত পর্যাবসানে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, এক ধরনের বস্তু প্রকৃতপক্ষে অন্য ধরনের বস্তু ভিন্ন কিছুই নয়। সার্ল চেতনার ক্ষেত্রে বিষয়মুখিনতা (intentionality) বা ব্যক্তিনিষ্ঠতার (subjectivity) মতো কিছু গুণের কথা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, এই গুণগুলি কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য নয়। অর্থাৎ জড় স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এই গুণগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সার্ল তাই মনে করেন যে, ব্যক্তিনিষ্ঠতা (subjectivity), বিষয়মুখিনতা (intentionality) গুণবিশিষ্ট চেতনার জড় জগতে সত্তাগত পর্যাবসান সম্ভব নয়, কিন্তু কারণিক দিক থেকে চেতনার পর্যাবসানকে তিনি মেনে নেবেন। অর্থাৎ, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার অতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বতন্ত্র কার্যকারিতা তিনি স্বীকার করবেন না। চেতনার দ্বারা যেসব কার্য সম্পন্ন হয়, সেগুলোর সবকটিই স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার দ্বারাই ব্যাখ্যাত হতে পারে, তাই চেতনা, সার্লের মতে,

কারণিক দিক থেকে স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে পর্যাবসানযোগ্য। সার্লের চিন্তায় কয়েকটি বিষয় অবশ্য লক্ষণীয় – প্রথমত, সার্ল বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই চেতনার দেহ-নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করেননি। দেহের বাইরে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত চেতনার যে অতীন্দ্রিয় সত্তা কার্তেসীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছিল, তা সার্লের দর্শনে অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করেননি। দৈহিক জগতের মধ্যে চেতনাকে সীমাবদ্ধ করলেও, চেতনার স্বাতন্ত্র্য তিনি স্বীকার করেছেন এবং চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বিষয়মুখিনতার মতো গুণগুলির কথা স্বীকার করেছেন। চেতনার এই গুণগুলি চেতনাকে অনন্য করে তোলে। এই জগতের অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে এই গুণগুলির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতা গুণগুলি বিষয়ে কোনো সংশয় প্রকাশের অবকাশও থাকে না, কারণ এগুলি আমাদের ব্যক্তি অনুভবে প্রতিনিয়ত উপলব্ধ হয়। উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেতনাকে জানার ক্ষেত্রে চেতনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপলব্ধি হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এমনই বৈশিষ্ট্য যা জড় জগতের অন্য কোনো বস্তুতে থাকে না। ফলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে কোনোভাবেই জড় জগতে পর্যবসিত করা সম্ভবপর নয় বলে তিনি মনে করেছেন, আর এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য চেতনারও পর্যাবসান সম্ভব নয়।

সার্ল চেতনাকে পর্যাবসানহীন রূপে গণ্য করলে সার্লের বিরুদ্ধে যে দ্বৈতবাদের আপত্তি উঠবে, সে কথা তিনি জানতেন, আর যেহেতু তিনি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে চান, তাই জড়জগত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে যদি চেতনার অস্তিত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেন, তাহলে বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত কারণিক

আবদ্ধায়নের নীতি (principle of causal closure) বিঘ্নিত হয়। কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি অনুসারে, এই জগত কারণিক দিক থেকে আবদ্ধ। এই নীতি অনুসারে, ভৌত জগতের বাইরের কোনো কিছুর দ্বারাই ভৌত জগত কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত হতে পারে না এবং ভৌত জগতের সব ঘটনার ভৌত ব্যাখ্যা (অন্তত নীতিগতভাবে) দেওয়া সম্ভব। সার্ল এই নীতি রক্ষা করতেই আগ্রহী ছিলেন। তাই চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেও তিনি চেতনাকে কারণিক দিক থেকে জড় জগতে পর্যাবসানযোগ্য বলে দাবী করলেন। ফলে, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার অতিরিক্ত চেতনার কোনো স্বতন্ত্র কার্যকারিতা থাকল না এবং স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতার ভিত্তিতেই চেতনাকে তিনি ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হলেন।

সার্ল বৈজ্ঞানিক নীতি রক্ষা করে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টায় কিছু সমস্যা রয়েছে। চেতনাকে সার্ল স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করেছেন এবং তার মাধ্যমে চেতনাকে দৈহিক গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। আবার অন্যদিকে, চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবীও করেছেন, যদিও চেতনার স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকার করেননি। আমরা জানি, কার্যোৎপাদন সামর্থ্যই সত্তার পরিচায়ক। এই জগতে সেই সব বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করেছে যাদের কোনো না কোনো প্রয়োজন আছে। বিবর্তনের ধারায় সেই সব বস্তুই উৎপত্তি লাভ করেছে যারা কোনো না কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত হতে পারে, যাদের কোনো না কোনো উপযোগিতা আছে। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিবর্তনের ধারায় সেই সব বস্তুই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে, যারা নিজেদের কার্যকরী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সার্ল

যেহেতু চেতনার স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকার করেননি, তাই চেতনার স্বাতন্ত্র্য সার্লের দর্শনে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়।

সার্ল অবশ্য চেতনার স্বাতন্ত্র্যকে তার কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। তিনি চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি কখনোই স্নায়ুতান্ত্রিক জগতে পর্যবসিত হয় না। ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে সার্ল দেখিয়েছেন যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি চেতনাতে উপস্থিত থাকলেও স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই উপস্থিত থাকে না। তাই, তিনি চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান সম্ভব নয় বলে মনে করছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সার্ল চেতনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এখন, প্রশ্ন হল যে, চেতনা যদি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে চেতনাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কোথা থেকে এলো? সাধারণভাবে কার্যে সেই সব বৈশিষ্ট্যই কেবলমাত্র থাকে যেগুলি তার উপাদান কারণে ছিল। অথচ চেতনার ক্ষেত্রে এমন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটল, যা তার উপাদান কারণে নেই। সুতরাং মানতেই হবে যে, চেতনার উৎপত্তিকে সার্ল সাধারণ উৎপত্তি হিসেবে গণ্য করেননি।

দর্শনের জগতে উৎপত্তিগত ধর্মকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণভাবে কোনো একটি ধর্ম যখন উৎপন্ন হয়, তখন তা তার উপাদান কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য হয়। উপাদানের ভিত্তিতে তা পূর্বাভাসযোগ্য (predictable) হয়। এই ধরনের ধর্মকে পরিণামমূলক ধর্ম (resultant property) বলা হয়। আবার কখনো কখনো এমন কিছু ধর্মের উৎপত্তি হয়, যাদের শুধুমাত্র উপাদান কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না,

বা উপাদান কারণের দ্বারা তা পূর্বাভাসযোগ্যও হয় না। এই ধরনের ধর্মকে উদ্ভূত বা উন্মেষমূলক ধর্ম (emergent property) বলে চিহ্নিত করা হয়। পরিণামমূলক ধর্ম তার উপাদান কারণে পর্যাবসানযোগ্য হলেও, উদ্ভূত ধর্ম তার উপাদান কারণে পর্যাবসানযোগ্য হয় না।

সার্ল উদ্ভবের ধারণাকে সমর্থন করেছেন। চেতনাকে তিনি উদ্ভূত ধর্মরূপেই গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের উদ্ভবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন-- (১) emergent-1 এবং (২) emergent-2। Emergent-1 বলতে সার্ল উদ্ভবের সেই সব দৃষ্টান্তকে বুঝেছেন যেসব ধর্মের উৎপত্তি সরাসরিভাবে তাদের উপাদান কারণ থেকে নিঃসৃত হয় না। যেমন, তরলতা বা কাঠিন্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর মিশ্রণে যে যৌগটি উৎপন্ন হয়, সেটি যে তরল হবে, তা কোনোভাবেই উপাদান কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং, জলের তরলতা যে একটি উদ্ভূত ধর্ম, তা মানতেই হয়। যদিও সার্ল মনে করেন যে, emergent-1 ধর্মগুলি নিম্নস্তরীয় উপাদান কারণের ভিত্তিতে সরাসরি ব্যাখ্যাযোগ্য না হলেও উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য। Emergent-2 বলতে কিন্তু তিনি এমন উদ্ভূত ধর্মকে বুঝেছেন, যেগুলি তার উপাদান কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাযোগ্য তো নয়ই, এমনকি উপাদানের কারণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেও ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। সার্ল মনে করেন, কোনো ধর্মই emergent-2 হতে পারে না, কারণ কোনো ধর্মকে emergent-2 রূপে গণ্য করলে, কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধের মৌলিক নীতিটিই (principle of transitivity of causation) বিঘ্নিত হয়। তাই চেতনাকেও তিনি

emergent-1 রূপেই গণ্য করেছেন। সার্ল কার্যকারণের পরম্পরা সম্বন্ধের মৌলিক নীতির বিষয়ে চিন্তিত হলেও আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞানে সবসময় এই নীতি মেনে চলা হয় না (চতুর্থ অধ্যায়) আর এই বিষয়টি সার্লের না জানার কথা নয়। তাছাড়া, চেতনা emergent-1 না emergent-2, সেটাই তো প্রশ্ন। চেতনা যদি emergent-2 নাই হয়, অর্থাৎ চেতনার যদি কোনো স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা নাই থাকে, তাহলে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই আসে না।

সার্ল চেতনার কারণিক পর্যাবসানের কথা বলেছেন। কারণিক পর্যাবসানের অর্থ হল, চেতনার কার্যকারিতা নিম্নস্তরের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য এবং স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। Emergent-1 ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি এই একই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বলেছেন যে চেতনা হল emergent-1, কারণ স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চেতনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব? সার্ল তো নিজেই বলেন যে বিষয়মুখিনতা বা ব্যক্তিনিষ্ঠতার মতো ধর্মগুলির ব্যাখ্যা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেওয়া যায় না। বিষয়মুখিনতা বা ব্যক্তিনিষ্ঠতা ধর্মগুলিকে বাদ দিয়ে চেতনাকে ব্যাখ্যা করার কোনো অর্থই হয় না। ব্যক্তিনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতা চেতনার সারধর্ম। সারধর্ম বাদ দিয়ে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করা তো অর্থহীন।

সার্ল কার্যকারণ সম্বন্ধকে যেভাবে বুঝেছেন, তাও প্রশ্নাতীত নয়। সার্লের মতে, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে চেতনা উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হল কারণ, আর চেতনা হল তার কার্য। কারণ বলতে দর্শনে বা বিজ্ঞানে কার্যের নিয়ত

পূর্ববর্তী ঘটনাকে বোঝায়। কারণের এই লক্ষণ অনুযায়ী স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকে চেতনার কারণ রূপে গণ্য করা সঙ্গত। কিন্তু দর্শন বা বিজ্ঞানে দুধরনের কারণ স্বীকার করা হয়ে থাকে — আবশ্যিক শর্ত অর্থে কারণ এবং পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে কারণ। যে শর্ত উপস্থিত না থাকলে কার্যটি ঘটতে পারে না, তাকে বলে আবশ্যিক শর্ত, আর যে শর্তটি উপস্থিত থাকলেই কার্যটি সংঘটিত হয়, তাকে পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে কারণ বলে। সার্ল দাবী করেন যে, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে চেতনার উৎপত্তি ঘটে, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতা ব্যতিরেকে চেতনার উৎপত্তি বা উপস্থিতি অসম্ভব। অর্থাৎ, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতা ছাড়া চেতনা উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতাকে আবশ্যিক শর্ত বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতা আবশ্যিক শর্ত হলেও তাকে চেতনার পর্যাপ্ত শর্ত রূপে গণ্য করা কি সমীচীন? মস্তিষ্ক আঘাতপ্রাপ্ত হলে চেতনার বিলুপ্তি ঘটে, স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত হলে চেতনাও লুপ্ত হয়। কিন্তু স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকলাপ সঠিক হলেই কি চেতনা উৎপন্ন হবে? 'কারণ' বলতে আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে কারণকেই বোঝানো হয়। সার্ল যদি স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতাকে আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বুঝে থাকেন, তাহলে তাঁর তত্ত্বে চেতনার স্বাতন্ত্র্য কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আর যদি তিনি স্নায়ুতান্ত্রিক দশার অতিরিক্ত কোনো অ-ভৌত কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহলে কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

সার্ল চেতনাকে উদ্ভূত ধর্মরূপে গণ্য করলেও চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি। এ কারণেই তিনি চেতনাকে emergent-2 হিসেবে গণ্য করতে

রাজি হননি। কারণ চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করলে কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের দোষে তিনি অভিযুক্ত হবেন — এই আশঙ্কা তাঁর ছিল। চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা বা কার্যকারিতা স্বীকার করার অর্থ হল, একথা স্বীকার করা, যে স্নায়ুতান্ত্রিক দশা থেকে চেতনার উৎপত্তি, সেই নিম্নস্তরের স্নায়ুতান্ত্রিক দশাকেই সে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই বিষয়টি দর্শনের জগতে নিম্নমুখী কারণতা (downward causation) নামে পরিচিত। কিম যদিও দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি নিম্নমুখী কারণতার স্থলই কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল।

কিম বলবেন, ভ$_{১}$ নামক ভৌত ঘটনা থেকে যদি ম$_{১}$ নামক মানস ঘটনা উদ্ভূত হয়, তাহলেও তার কোনো কারণিক ভূমিকা থাকতে পারে না। কারণ, মনে করা যাক, যদি ম$_{১}$ থেকে ম$_{২}$ নামক মানস ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহলে ম$_{২}$–এর নিম্ন স্তরে কোনো না কোনো ভৌত ঘটনা (ধরা যাক ভ$_{২}$) অবশ্যই আছে; যেহেতু মানস ঘটনা মাত্রই ভৌত ঘটনা প্রনির্ভর। এই ভৌত ঘটনাটি ব্যতিরেকে ঐ মানস ঘটনাটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়,— এ কথা তো অবশ্যই সত্য। নির্দিষ্ট স্নায়ুতান্ত্রিক অবস্থা ব্যতিরেকে মানস দশা বা চেতনার উপস্থিতি কখনোই সম্ভব নয়। স্নায়ুতান্ত্রিক দশা যে চেতনার আবশ্যিক শর্ত, তাতে কোনো সংশয় নেই। কিম বলবেন, স্নায়ুতান্ত্রিক দশা চেতনার আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত। ভ$_{১}$ থেকে যখন ম$_{১}$ উৎপন্ন হয়, সেই ম$_{১}$ আবার ম$_{২}$ -কে উৎপন্ন করছে বলে মনে হলেও, তা কিমের মতে সত্য নয়; কারণ ম$_{২}$ উৎপন্ন হবার জন্য ভ$_{২}$ নামক স্নায়ুতান্ত্রিক দশার প্রয়োজন। এখন ম$_{২}$ উৎপন্ন করার জন্য যদি ভ$_{২}$ পর্যাপ্ত হয়, তাহলে ম$_{১}$-কে ম$_{২}$-এর কারণ হিসেবে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এক্ষেত্রে বলা যায় যে,

ভ$_{১}$ থেকে ম$_{১}$ উৎপন্ন হওয়ার পর যখন ভৌত জগতে কোনো পরিবর্তন ঘটছে, তখন অবশ্যই ঐ পরিবর্তনের কোনো না কোনো কারণ আছে। কিম বলবেন, ভৌত জগতে নিশ্চয়ই কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, যে কারণে ভ$_{১}$ থেকে ভ$_{২}$ উৎপন্ন হয়েছে, আর ভৌত জগতের পরিবর্তন হয়েছে বলে তাদের সংশ্লিষ্ট মানস জগতেও পরিবর্তন ঘটেছে, সেই কারণেই ম$_{১}$-এর পরিবর্তে ম$_{২}$-হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, ভ$_{১}$ থেকে ম$_{১}$ উৎপন্ন হওয়ার পরই কিন্তু ভ$_{২}$ উৎপন্ন হল— তাহলে এক্ষেত্রে কি বলা যায় না যে ভ$_{১}$ এবং ম$_{১}$ একসঙ্গে ভ$_{২}$ উৎপন্ন করেছে? এমনকি হতে পারে না যে, ভ$_{১}$-এর প্রভাবে যেমন ম$_{১}$ উৎপন্ন হল, তেমনই ম$_{১}$-এর প্রভাবে ভ$_{১}$ পরিবর্তিত হল এবং ভ$_{২}$ উৎপন্ন হল? এটি অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে যা পদার্থবিজ্ঞান অনুসারী চিন্তায় কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধারণা কারণিক আবদ্ধায়নের নীতিকে অগ্রাহ্য করে, ফলে, কারণিক অতিনিয়ন্ত্রণের স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, ভৌত ঘটনা থেকেই কোনো একটি মানস ঘটনা উৎপন্ন হল এবং সেই মানস ঘটনাটি আবার ঐ ভৌত ঘটনাটিকেই প্রভাবিত করল, যার ফলে তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ভৌত ঘটনা ভ$_{১}$ এবং মানস ঘটনা ম$_{১}$ একসঙ্গে ভ$_{২}$-এর জনক হল। ভ$_{১}$ এবং ম$_{১}$ দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে ভ$_{২}$-এর আবশ্যিক শর্ত, কিন্তু দুজনে একসঙ্গে ভ$_{২}$-এর পর্যাপ্ত শর্ত হল।

সার্ল চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি, সে কারণেই চেতনাকে তিনি emergent-1 বলে স্বীকার করেছেন, emergent-2 হিসেবে মানতে চাননি। তাঁর এই চিন্তা আসলে কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদের একটি প্রকাশ। কারণিক

নিয়ন্ত্রণবাদ সবসময়ই মনে করে যে কার্য, তার কারণের দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত। কার্যে এমন কোনো শক্তি বা ক্ষমতা থাকতে পারে না, যা কারণের অতিরিক্ত, বা আরো ভালোভাবে বললে, কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর মিশ্রণের ফলে জল উৎপন্ন হলেও, জলে এমন আর কোনো গুণ বা ধর্ম বা ক্ষমতা থাকতে পারে না, যা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে নেই বা তাদের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এই ধরনের ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই সার্ল মনে করেছেন যে, চেতনার এমন কোনো কারণিক ক্ষমতা থাকতে পারে না, যা তার উপাদান কারণ অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই উন্মেষমূলক চিন্তার বিরোধী। উদ্ভবতত্ত্বে দাবী করা হয় যে, এই জগতে এমন অনেক বস্তুর আবির্ভাব ঘটে যা তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, আবার উপাদান কারণে পর্যাবসানযোগ্যও নয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, উৎপন্ন কার্যটিতে এমন ধর্মের আবির্ভাব হল, যা তার উপাদান কারণে উপস্থিত ছিল না, উপাদান কারণ থেকে তাকে অনুমান করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং, উদ্ভবতাত্ত্বিকরা দাবী করেন যে, এক্ষেত্রে কারণিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব কোনোভাবেই কার্যকরী নয়।

পদার্থবিজ্ঞান কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদের পৃষ্ঠপোষক। কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার করার অর্থ হল পদার্থবিজ্ঞানের নীতিকে অমান্য করা। পদার্থবিজ্ঞানের নীতির সঙ্গে যদি কোনো তত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে সেই তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক অভিধায় ভূষিত হয়। বিজ্ঞান তথা দর্শনের জগতে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে পদার্থবিজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ

জগতের যাবতীয় ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে তারা সক্ষম। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের হাত ধরে দর্শনের জগতে এই ধারণা দৃঢ়প্রোথিত হয়েছে যে, সব বিজ্ঞানসম্মত বাক্যই পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশযোগ্য অর্থাৎ, তাঁরা মনে করতেন যে, সব বিজ্ঞানকেই পদার্থবিজ্ঞানে পর্যবসিত করা সম্ভব। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ হারিয়ে গেলেও তার দার্শনিক প্রভাব আজও অব্যাহত। আজও দর্শন তথা সমগ্র বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় প্রাণপাত করছে। এখন সমস্যা হল, পদার্থবিজ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে গণ্য করা হলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, তা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। প্রশ্ন হল, পদার্থবিজ্ঞান যদি জগতের সব ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে না পারে, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা কি আর অক্ষুন্ন থাকে? এবার সময় এসেছে, পদার্থবিজ্ঞানের এই মিথ্যা সম্পূর্ণতার দাবীকে এড়িয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার।

পদার্থবিজ্ঞান যেসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ, অন্য কোনো বিজ্ঞান যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ ঘটনাটির ব্যাখ্যা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? রসায়ন বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানও তো জগতের অনেক বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। পদার্থবিজ্ঞানই যে সব সময় শেষ কথা বলবে, এমন তো নাও হতে পারে। জীবজগৎ সম্বন্ধে জীববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ব্যাখ্যা দিয়েছে। তার গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। তাই, পদার্থবিজ্ঞানের পরিবর্তে জীববিজ্ঞানের সাহায্যে দেহ-মনের সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখা যেতেই পারে।

পপারের তত্ত্ব আলোচনার সময় (পঞ্চম অধ্যায়ে) আমরা দেখেছি পপারও উদ্ভবতত্ত্বের সাহায্যে চেতনাকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। সার্লের মতো তিনি সীমিত অর্থে উদ্ভবের ধারণাকে গ্রহণ করেননি, সার্বিক উদ্ভবের ধারণাকেই তিনি সমর্থন করেছেন। উদ্ভূত ধর্মের স্বাধীন ও উপাদান কারণ অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা থাকে বলেই তিনি মনে করেন অর্থাৎ, সার্লের মতো তিনি মনে করেননি যে, প্রতিটি উদ্ভূত ধর্মের কারণিক ভূমিকা তার উপাদান কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পপারের লেখায় আমরা ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের কথা পাই। জগতে বিবর্তনের ধারায় এমন অনেক কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে যেগুলি তার উপাদান কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। জগতের মূল উপাদান যে জড়বস্তু — তা অস্বীকার করা যায় না। সেই আদি জড় জগত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি হয়েছিল। তারপর হঠাৎই কোনো একদিন কোনো একটি বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন একটি বস্তুর (কোষ) আবির্ভাব ঘটল, যা নিজের মতো অন্য আরেকটি বস্তু উৎপাদনে সক্ষম, অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটল। মূল জড় জগতে জড় উপাদান থেকে যে, কোনো দিন এই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটতে পারে, তা কোনোভাবেই প্রাণের সঞ্চারের আগে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। আবার প্রাণের বিকাশ এই পৃথিবীতে বিবর্তনের এমন এক ধারা সৃষ্টি করল, যে পৃথিবীকে জীব বৈচিত্র্যে ভরে দিল। প্রাণের সঞ্চার জগতে এমন নতুন নতুন সম্ভাবনার সূচনা করল, যা তার পূর্বে জগতে কোনোভাবেই পূর্বাভাসযোগ্য ছিল না। প্রাণীদেহ বিবর্তনের ধারায় জটিল স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের অধিকারী হয়ে উঠল। তার থেকে আরও নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল।

উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সেই স্নায়ুতান্ত্রিক গঠনের মধ্যে চেতনা নামক এক নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটল। এটিও অভিনব, কারণ চেতনার আবির্ভাবের পূর্বে চেতনা বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব ছিল না। পপার এই প্রতিটি অভিনব এবং পূর্বাভাস অযোগ্য দৃষ্টান্তগুলিকে উদ্ভবের স্থল হিসেবে গণ্য করেছেন।

বিজ্ঞান মনে করে প্রাণীর প্রতিটি আচরণ তার জিনের বা ডি এন এ-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই, প্রাণী যখন একাধিক বিকল্পের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে তার জিনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পপারের তত্ত্ব থেকে মনে হয় তিনি বিজ্ঞানের এই মত মেনে নিতে চাননি। পপারের মতে, প্রাথমিকভাবে হয়তো প্রাণী জিনের দ্বারাই চালিত হত, কিন্তু বিবর্তনের ধারায় প্রাণীর জিনের মিউটেশন অনেকাংশেই প্রাণীর আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে, আগে আচরণের পরিবর্তন হচ্ছে পরে জিনের মিউটেশন হচ্ছে, কিন্তু, এমন কি হওয়া সম্ভব? পপার যদিও দাবী করেছেন যে, জিনের মিউটেশন সব সময়ই চলছে, এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কিন্তু জিনের মিউটেশনের ক্ষেত্রে বিকল্প সম্ভাবনা উপস্থিত থাকে বলেই তিনি মনে করেছেন (Popper 1996, 123)। অর্থাৎ বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি বাস্তবায়িত হবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রাণীর আচরণের উপর। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই আচরণ নিছক জৈবিক আচরণ, কোনোভাবেই হয়তো চেতনা যুক্ত নয়, নিছক জৈবিক চাহিদার দ্বারা চালিত। যেমন, জিরাফের লম্বা গলার ক্ষেত্রে বলা যায়, নিশ্চয়ই এমন হতে পারে না যে, আগে জিরাফের জিনগত পরিবর্তন হয়ে তার গলা লম্বা হয়ে গেল, তারপর সে উঁচু ডালের

পাতা খেতে শুরু করল। বরং এক্ষেত্রে এমনটা মনে করাই সঙ্গত হবে যে, জিরাফের খাদ্য সংকট তার মধ্যে উঁচু ডালের পাতা খাবার জৈবিক চাহিদা জাগিয়েছিল। এই জৈবিক চাহিদাই তার জিনের মিউটেশনকে প্রভাবিত করেছিল। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চস্তরীয় ঘটনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নস্তরীয় ঘটনাকে প্রভাবিত করে, যা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। জিনের মিউটেশন প্রাণীর আচরণের দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র কারণিক নিয়ন্ত্রণবাদকেই যে খন্ডন করে, এমন নয়, তা একইসঙ্গে কারণতা সম্বন্ধের একমুখী দিকনির্দেশকেও খন্ডন করে। বিজ্ঞান চিরদিনই বিশ্বাস করে যে, কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয় বলে কার্য কেবলমাত্র কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ কখনোই কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কার্যকে উচ্চস্তরীয় একটি বিষয় রূপে গণ্য করে বলা হয় যে, কারণ থেকে কার্যের নিয়ন্ত্রণ ঊর্ধ্বমুখী কারণতার সম্বন্ধকেই প্রকাশ করে, কিন্তু কার্য-কারণের নিম্নমুখী কারণতা কখনোই সম্ভব নয়। পপারের যুক্তি মানলে, অর্থাৎ প্রাণীর আচরণের দ্বারা জিনের মিউটেশনের প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলে নিম্নমুখী কারণতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণীদেহের মৌলিক উপাদান হল কোষ। কোষের মধ্যে থাকে জিন বা ডি এন এ। প্রতিটি প্রাণীর মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই বিজ্ঞান প্রাণীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের কারণ রূপে জিন বা ডি এন এ-কে চিহ্নিত করে। জিনের দ্বারা আচরণ নির্ধারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু, আচরণ, যা জিনের দ্বারাই সৃষ্ট, তা যদি আবার নিম্নস্তরীয় জিনের মিউটেশনে প্রভাব বিস্তার করে, তবে তা অবশ্যই নিম্নমুখী কারণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত বলেই মনে হয়।

পদার্থবিজ্ঞানের নীতি মেনে সার্ল নিম্নমুখী কারণতাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু জীববিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পপার নির্দেশিত পথে এগোলে আমরা হয়তো সফল হতে পারি। নিম্নমুখী কারণতার সম্ভাবনা যদি স্বীকার করা না যায়, তাহলে উচ্চস্তরীয় ধর্মের কারণিক ভূমিকা কখনোই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। চেতনা যদি জড়জগত থেকে উদ্ভূত একটি ধর্ম হয়, তাহলে চেতনাকে জড় জগতের উচ্চস্তরীয় ধর্মরূপেই গণ্য করতে হবে। আর উচ্চস্তরীয় ধর্মের যদি স্বতন্ত্র কোনো কারণিক ভূমিকা না থাকে, যার দ্বারা নিম্নস্তর প্রভাবিত হয়, তাহলে মানস কারণতা প্রতিষ্ঠা করা বা দেহ-মনের সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সম্ভব হবে না।

সার্ল চেতনার উদ্ভবের কারণ হিসেবে বারবার স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক সব দার্শনিকই হয়তো এ কথাই বলবেন। স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চেতনা তার থেকে ভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়। এই কারণেই সার্ল চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার করতে চাননি। প্রশ্ন ওঠে যে, জড় জগত থেকে ভিন্ন গুণসম্পন্ন চেতনা কীভাবে জড় জগতের উপর ক্রিয়া করে? সার্ল এ প্রসঙ্গে কার্তেসীয় দ্বৈতবাদের দ্বিকোটিক বিভাজনমূলক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের ভাবতে পরামর্শ দিয়েছেন। চেতনা ও জড় জগতের মধ্যে যে দূরত্ব এবং বিরোধিতা কার্তেসীয় দর্শনের প্রভাবে আমাদের মনে দৃঢ়প্রোথিত হয়ে আছে, তাকে নির্মূল করে ফেলতে না পারলে দেহ-মনের সমস্যার সমাধান হবে না বলেই তিনি মনে করছেন। যদিও তিনি নিজে কার্তেসীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মনে করেছেন যে, চেতনা কখনোই মানসধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে জড় জগতের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, ভৌতধর্মাবচ্ছিন্ন,

অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রূপেই জগতকে প্রভাবিত করে। সার্ল যেহেতু কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষা করে চলতে চান, তাই তিনি কখনোই চেতনা ও জগতের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করবেন না।

বিজ্ঞানও অবশ্যই জড় জগত অতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্ব মানতে চায় না, কিন্তু এই অস্বীকৃতির ক্ষেত্রেও কার্তেসীয় মতবাদের প্রভাবই মূলত কাজ করেছে। কেন মন ও চেতনাকে জড় প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, তার অন্য কোনো জোরদার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেখানে বিজ্ঞান নানা বস্তুর অস্তিত্ব প্রাথমিকভাবে স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে তাকে ভৌত জগতের বিষয় রূপে স্বীকার করেছে, অর্থাৎ তাদের ভৌত জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে পপারের দেওয়া দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। পপার বলের (force) ধারণা কীভাবে বিজ্ঞানের জগতে এসেছে, তা দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, আজ যদিও বিজ্ঞান বলকে (force) ভৌত জগতের বিষয় বলেই গণ্য করে, কিন্তু চিরদিন তা করত না। বলের ধারণা পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে অনেক পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জড় জগতের অন্যান্য বস্তু থেকে বলের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পপারের দাবী হল, জগতের অন্যান্য বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বলের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি বলের ধারণাকে পদার্থবিজ্ঞান ভৌত জগতের বিষয় রূপে গণ্য করতে পারে, তাহলে চেতনাকে কেন পারবে না।

আমাদের মস্তিষ্কেও তড়িৎচৌম্বকীয় বলক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে বলে বিজ্ঞান আজ মনে করে। আমাদের মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে পপার অচেতন মনের (unconscious mind) সঙ্গে তুলনা করেছেন। তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র ভৌত জগতের অংশরূপে বিজ্ঞানে স্বীকৃত, তাই তাকে মস্তিষ্কের অংশ রূপেই গণ্য করা হয়। পপার, বলের (force) সঙ্গে চেতনার নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলে মনে করেছেন। আবার বিজ্ঞান মনে করে, বল (force) ভৌত জগতেরও কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত । তাই পপার মনে করেছেন যে, এই বল ক্ষেত্র (force field) একইসঙ্গে ভৌত জগত এবং চেতন জগতের গুণসম্পন্ন হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজ করতে সক্ষম হবে। কার্তেসীয় দর্শনের প্রভাবে দেহ ও মনের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, যে কারণে তাদের মধ্যে কোনোভাবেই আর সেতুবন্ধন সম্ভব হচ্ছিল না, এই মস্তিষ্ক স্থিত বল ক্ষেত্র (force field) তাদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হবে। তাই এই তড়িৎচৌম্বকীয় বল ক্ষেত্রকে (electromagnetic force field) পপার ভৌত ও চেতন জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন। স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চেতনার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অচেতন মনের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সরাসরি চেতন জগতের উপর ক্রিয়া করতে পারে না বা চেতন জগত সরাসরি স্নায়ুতান্ত্রিক জগতকে প্রভাবিত করতে পারে না। এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে তড়িৎচৌম্বকীয় বল ক্ষেত্রটি উপস্থিত থাকে। স্নায়ুতান্ত্রিক জগত, অচেতন মনকে প্রভাবিত করে এবং অচেতন মন আবার চেতন মনকে প্রভাবিত করে। একইভাবে চেতন মন আবার অচেতন মনের মাধ্যমেই স্নায়ুতান্ত্রিক জগতের উপর ক্রিয়া করে। মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র অচেতন মন হিসেবে গণ্য হতে পারে কিনা, তা নিয়ে

প্রশ্ন জাগতেই পারে। কিন্তু, চেতন ও অচেতন মনের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে কীভাবে? অচেতন বা জড়ের মধ্যেই বা পার্থক্য করব কী করে— এরকম আরো অনেক প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে আমরা সার্লের চিন্তা অনুসরণ করে বলতে পারি যে চেতন হয়ে ওঠার সামর্থ্য যার আছে তাই অচেতন (Searle 2002, 152)। পপারের তত্ত্ব থেকে মনে হয় যে মস্তিষ্কের তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে চেতনার উদ্ভব ঘটে। ফলে, তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে যে চেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে, তা পপার মনে করতেই পারেন। পপারের এই বক্তব্য বিষয়ে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অবস্থান বিষয়ে বিজ্ঞান নিশ্চিত। শারীরবিজ্ঞানের জগতেও মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র বিষয়ে নানা গবেষণা হয়ে থাকে (McFadden 2002)।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে সার্ল এবং পপারকে অনুসরণ করে যদি আমরা চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্ক তন্ত্রে অনুভূত হয়। স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হলেও ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য যে চেতনায় উপস্থিত থাকে তা হয়তো কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। সার্ল যেভাবে এ প্রসঙ্গে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেতনার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেতনাকে যেভাবে অনুভব করা যায় তা বস্তুনিষ্ট ব্যাখ্যায় কখনোই ধরা পড়ে না। সে কারণেই চেতনার সত্তাগত

পর্যাবসান সম্ভব নয় বলে সার্ল মনে করেছেন। তাঁর মতে চেতনার স্বতন্ত্র সত্তা অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা থাকলেই যে তার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা থাকবে,— এই চিন্তা তিনি সমর্থন করেন না। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সার্লের মতে, কখনোই স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকাকে প্রতিপাদন করে না। যদিও আমরা দেখেছি, পপার চেতনার কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেছেন। মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে চেতনা এবং স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব বলেও তিনি মনে করেছিলেন । পপার মানস জগত হিসেবে চেতনার একটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করতে চেয়েছিলেন, যদিও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে ঐ জগতের ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া সম্ভব, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি।

সার্ল স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে চেতনার উৎপত্তি স্বীকার করেন। স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যতীত চেতনা কোনোভাবেই উৎপন্ন হতে পারে না, ফলে, অতীন্দ্রিয় চেতনার অস্তিত্ব কোনোভাবেই স্বীকার্য নয়। সার্ল তাই মনে করেন যে, চেতনা মস্তিষ্ক তন্ত্রেই উদ্ভূত হয় এবং সেখানেই অনুভূত হয়। মস্তিষ্কের বাইরে চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই। সার্ল চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন। চেতনার ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো গুণগুলি চেতনাকে অনন্য করে তুলেছে বলে তিনি দাবী করেন। সার্লের এই দাবী যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেহ-মনের সম্বন্ধের বিকল্প ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে সার্লের এই দাবীগুলি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করবে। তবে, সার্ল ব্যক্তিনিষ্ঠতা বা বিষয়মুখিনতার মতো ধর্মের ভিত্তিতেই চেতনার স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যদিও তার স্বকীয় কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি বিষয়ের সত্তা তার কার্যোৎপাদন সামর্থ্যের নিরিখেই

বিবেচিত বা নির্ধারিত হয়। যে বস্তুর কার্যোৎপাদন সামর্থ্য নেই, তার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় জাগে। তাই চেতনার অস্তিত্ব যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে তার স্বতন্ত্র কার্যোৎপাদন সামর্থ্য অবশ্যস্বীকার্য। দেহ-মনের সম্বন্ধের বিকল্প ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে আমরা তা দেখানোর চেষ্টা করব। সার্ল স্নায়ুতান্ত্রিক স্তরে চেতনার সত্তাগত পর্যাবসান স্বীকার না করলেও, কারণিক পর্যাবসান স্বীকার করেছিলেন। সার্লের এই চিন্তার মূল কারণ হল, সার্ল পদার্থবিজ্ঞানকে আদর্শ বলে মনে করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের কারণিক আবদ্ধায়নের নীতি রক্ষা করে তিনি চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানেরও যে কোনো কোনো বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, পদার্থবিজ্ঞানের দাবীগুলিকেও যে প্রশ্ন করা যায়, সে চিন্তা সার্লের তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেই নিজের তত্ত্বকে 'biological naturalism' বলে দাবী করেছেন এবং অনেকসময়ই নিজের তত্ত্বের সমর্থনে জীববিজ্ঞান থেকে উদাহরণও দিয়েছেন, অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে কথা বলার সময় কোনো যুক্তি ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞানকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। বিজ্ঞান বলতে যে কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানকে বোঝা উচিত নয়, আরও বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকেও যে বিজ্ঞানকে বোঝা যেতে পারে, পদার্থবিজ্ঞানের স্বয়ংসম্পূর্ণতাকেও যে প্রশ্ন করা যায়, তা আমরা আমাদের বিকল্প দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দেখার চেষ্টা করব।

একইসঙ্গে চেতনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পর্যাবসানই যে সম্ভব নয়, তাও আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। সার্ল অভিযোগ করেছিলেন যে, বিজ্ঞান তথা ভৌতবাদী মনোদর্শনের জগতও কার্তেসীয় জড় ও মনের দ্বিকোটিক বিভাজনের তত্ত্বের দ্বারা

প্রভাবিত। তিনি দাবী করেছিলেন যে, কার্তেসীয় এই দ্বিকোটিক বিভাজনমূলক চিন্তাই দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার পথে প্রধান অন্তরায়। তাই, তিনি এই দ্বিকোটিক বিভাজনের তত্ত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা সার্লের এই পরামর্শ মেনেই দেহ-মনের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করব।

পপারের তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, পপারও উদ্ভবতত্ত্বের সাহায্যে চেতনাকে বুঝতে চেয়েছেন। সার্ল উদ্ভবের ধারণা স্বীকার করলেও উদ্ভূত ধর্মের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয় কারণিক ভূমিকা স্বীকার করতে চাননি। তাই নিম্নমুখী কারণতার সম্বন্ধও সার্লের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পপারের তত্ত্ব অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, নিম্নমুখী কারণতার ধারণা একেবারেই অসম্ভব নয়। উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেও বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বচিন্তা সম্ভব। পরবর্তী অংশে পপারের চিন্তার সাহায্য নিয়ে সার্লের তত্ত্বের ত্রুটি অতিক্রম করে দেহ-মনের সম্বন্ধের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা আমরা অনুসন্ধান করে দেখব।

মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কস্থিত তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেই মনে করা হয়। এই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কোনো একটি পর্যায়ে হয়তো এমন একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়, যাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যা অন্য কোনো ভৌত বস্তুতে উপস্থিত থাকে না। এই গুণগুলি হল ব্যক্তিনিষ্ঠতা, বিষয়মুখিনতা প্রভৃতি। এই গুণগুলির উপস্থিতিই ঐ ধর্মটিকে অনন্য করে তোলে, এবং আরো অন্যান্য ভৌত ধর্ম যা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়, তাদের থেকে একে স্বতন্ত্র করে তোলে। ধর্মটি হল 'চেতনা', যা

কোনোভাবেই স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতায় পর্যবসিত হয় না, যদিও স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে।

মস্তিষ্কে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিজ্ঞানে স্বীকৃত। কিন্তু তার অতিরিক্ত চেতনার উপস্থিতি স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী – এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। এর উত্তর দেবার আগে আমাদের দেহে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে, তা সহজে এবং সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক। স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞানে (neuro-physiology) মনে করা হয় যে, বাইরের জগত থেকে আসা কোনো একটি উদ্দীপনা আমাদের দেহের কোনো অঙ্গকে যখন স্পর্শ করে তখন আমাদের দেহের ঐ অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ু (sensory neuron) উদ্দীপিত হয়। ঐ উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে তড়িৎ আয়নের (ion) আকারে এক স্নায়ু কোষ থেকে অন্য স্নায়ু কোষে বাহিত হতে হতে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। এখন, বাইরের জগতের উদ্দীপনাটি মস্তিষ্কে যে তথ্য বহন করে আনে, তা তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে জমা হয় ও তারপর তা সংশ্লেষিত ও সমন্বিত হয়ে প্রতিক্রিয়া রূপে বহিঃস্থ স্নায়ুর (motor neuron) মাধ্যমে আবার নির্দিষ্ট দেহাঙ্গে ফিরে যায়। মানবদেহের উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়া বিষয়ক শারীরবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক ব্যাখ্যাটি সর্বজনস্বীকৃত।

আপাত অর্থে, শারীরবিজ্ঞান প্রদত্ত এই স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে চেতনার উপস্থিতি ও তার কারণিক প্রভাবের সম্ভাবনা অর্থহীন বলেই মনে হয়, কারণ বাইরের জগত থেকে আসা উদ্দীপনা এবং মস্তিষ্ক প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া — সবই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। চেতনার মতো অতিরিক্ত একটি বিষয় স্বীকার

করা বা তার কারণিক প্রভাব এক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক এবং অর্থহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টির মধ্যে নিহিত জটিলতা নজরে পড়বে। বাহ্য জগত থেকে যে উদ্দীপনাটি গৃহীত হচ্ছে, তা অবশ্যই একটি ভৌত উদ্দীপনা, যা ভৌত তড়িৎ আয়ন (ion) রূপে, তথ্য আকারে স্নায়ু কোষের মাধ্যমে বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, তারপর সেখানে ঐ তথ্য সংশ্লেষিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া রূপে দেহাঙ্গে ফিরে আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় হল, যাওয়ার পথে যা নিছক ভৌত উদ্দীপনা হিসেবে মস্তিষ্কে গিয়েছিল, তা ফেরার পথে চেতন প্রতিক্রিয়া রূপে ফিরে আসে। এই চেতনার বোধ আমাদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকেরই হয়, একে অস্বীকার করা যায় না। এখন, আমাদের এই চেতন অভিজ্ঞতার বোধকে কেউ ভ্রম বলে মনে করতে পারেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, চেতনাকে কোনোভাবেই ভ্রম বলা যায় না। সার্ল সে কথা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, চেতনা এমন একটা বিষয়, যার ক্ষেত্রে সত্তা (reality) আর অবভাসের (appearance) মধ্যে পার্থক্য করা যায় না (Searle 2004, 122)। সত্তা আর অবভাস এক নয়। সূর্যাস্তের সময় মনে হয় সূর্য বুঝি সাগরে ডুবে গেল। কিন্তু আমরা জানি তা নিছক একটি দৃষ্টিভ্রম। প্রকৃত ঘটনা, আর যা প্রতিভাত হয় তা এক নয়। কিন্তু সার্ল মনে করেন চেতনার ক্ষেত্রে যা প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ যা অনুভূত হয় তাই সত্য। এর অতিরিক্ত কোনো সত্তা সেখানে থাকে না। চেতনার বিষয়টি ভ্রমাত্মক হতেই পারে কিন্তু চেতন অনুভবটি কখনোই ভ্রমাত্মক হতে পারে না। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে করে আমাদের যে ভয়ের অনুভব হয় সেক্ষেত্রে দড়ি বিষয়ক জ্ঞানটি মিথ্যা হলেও ভয়ের অনুভবটিকে কিন্তু কোনোভাবে মিথ্যা বলা যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে, চেতনার অস্তিত্ব যদি অস্বীকৃত

হয়, তার কোনো কারণিক ভূমিকা যদি আদৌ স্বীকার করা না হয়, তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, চেতনার কারণিক ভূমিকা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে আমাদের নৈতিক কর্মের বা নৈতিক দায়িত্ববোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

আমাদের যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা বোধ উপলব্ধ হয়। আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে 'আমি এই সিদ্ধান্তের (কর্মের) কর্তা' ।এই বিশ্বাস থেকে ঐ কর্মের বা সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের মনে একটা দায়িত্ববোধের অনুভুতি জন্মায়। এই অনুভূতি আমাদের পরবর্তী কর্মকে বা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। একটা সিদ্ধান্ত নিলে আবার তার অনুসারী অন্যান্য কিছু কর্ম করতে হয়, পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং এভাবেই মানব জীবনের কর্ম শৃঙ্খলটি চলতে থাকে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোধ যদি নিছক স্নায়ুতান্ত্রিক উদ্দীপনা হয়, তাহলে পরবর্তী কার্যে তার প্রভাব থাকতে পারে না। কিন্তু, আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বোধ আমাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বাসের অর্থাৎ চেতনার অস্তিত্ব যদি আমরা স্বীকার না করি, তাহলে একটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। আর তাছাড়া চেতনা স্বীকার না করলে নৈতিক বিচারের প্রশ্নই উঠবে না। যদি সবই নিছক যান্ত্রিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়, তাহলে কোনো কর্মের জন্য কাউকে প্রশংসা বা তিরস্কার করা যাবে না। যে কোনো প্রকার নৈতিক আলোচনাই অর্থহীন হয়ে যাবে।

সুতরাং, সঙ্গতভাবেই এই দাবী করা যায় যে, বাইরের জগত থেকে আসা তথ্য ভৌত উদ্দীপনা হিসেবে মস্তিষ্কের তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে পৌঁছয়, এবং তারপর সেই তথ্যটি অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়, সমন্বিত হয়। এই প্রক্রিয়ার কোনো একটি পর্যায়ে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত চেতনা ঐ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ প্রক্রিয়াকে কারণিক দিক থেকে প্রভাবিত করে। সেই কারণেই বাহ্য জগত থেকে পাওয়া নিছক ভৌত উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে যখন মস্তিষ্কে পৌঁছয়, তখন সেখানে কোনো চেতন ব্যক্তিনিষ্ঠতার বোধ সংযুক্ত থাকে না, কিন্তু যখন সংশ্লেষিত হয়ে প্রতিক্রিয়া রূপে তা বহির্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে ফিরে আসে, তখন সেখানে ব্যক্তিনিষ্ঠতা অনুভূত হয়। অতএব, আমাদের মানতেই হয় যে মস্তিষ্কের তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রে তথ্য সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো একটি পর্যায় চেতনা উৎপন্ন হয় এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিক্রিয়া নির্মাণে চেতনা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং, যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই দাবী করা যায় যে, মস্তিষ্কের তথ্য সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কোনো একটি পর্যায়ে অবশ্যই চেতনা সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। চেতনার প্রভাবেই ভৌত উদ্দীপনা চেতন প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিক্রিয়াটি চেতনাযুক্ত হলেও, তা কিন্তু তার ভৌত ধর্ম বিসর্জন দেয় না। যে তড়িৎ আয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দীপনাটি মস্তিষ্কে উপনীত হয়েছিল, সেই একই প্রক্রিয়াতেই কিন্তু তা আবার প্রতিক্রিয়া রূপে ফিরে আসে। অর্থাৎ চেতনা যুক্ত প্রতিক্রিয়ার ভৌত বৈশিষ্ট্য কিন্তু অক্ষুন্নই থাকে। ফলে, এক্ষেত্রে আমাদের মানতে হবে যে, জড় জগত ও চেতন জগতের মধ্যে দেকার্ত যে

বিভেদ বা বিচ্ছেদের কথা বলেছিলেন, তা বাস্তবে থাকে না। বাস্তবতঃ, চেতনা ভৌত জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়, শুধুমাত্র তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য কোনো ভৌত বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে চেতনা একটি উদ্ভূত ধর্ম, যা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন একটি বিষয়। তার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা থাকে। তা প্রত্যক্ষভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যুক্ত হয় এবং তাকে প্রভাবিত করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, চেতনা যদি স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র হয়, তাহলে কি তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্বীকার করা সম্ভব? দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই আপত্তিটিই ওঠে। দেহ এবং মন যেহেতু দেকার্তের মতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের অধিকারী, তাই তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আমাদের প্রস্তাবিত তত্ত্বের বিরুদ্ধেও সেই একই আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, চেতনা স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হবার অর্থ হল এই যে, তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্মতে নেই। পপার আমাদের দেখিয়েছেন যে, বলের (force) সঙ্গে চেতনার অনেক সাদৃশ্য আছে। ভৌত জগতের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বলকে যেমন ভৌত জগতের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি চেতনাকেও ভৌত জগতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ সত্তা হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না। চেতনা এই প্রকৃতি জগতেরই একটি বিষয়। একথা সত্য যে, তার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা এই জগতের অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে নেই, কিন্তু এমনও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে প্রকৃতি জগতের অন্য বস্তুর (যেমন- বল) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলে। সেই কারণেই তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব

নয়। চেতনা কোনো অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়, তাই চেতনার সঙ্গে অন্যান্য প্রাকৃত বস্তুর কার্যকারণ সম্বন্ধে বাধা থাকার কথা নয়।

সার্ল চেতনাকে উদ্ভূত ধর্ম রূপে গণ্য করলেও তাকে 'emergent-2' হিসেবে গণ্য করতে চাননি, কারণ তাহলে উদ্ভূত ধর্মের স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা তাঁকে স্বীকার করতে হত যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার করা। কিন্তু আমরা যদি চেতনার স্বতন্ত্র কার্যক্ষমতা স্বীকার করি অর্থাৎ, স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চেতনা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম বলে মনে করি, তাহলে সার্লের তত্ত্ব অনুসরণ করে আমাদের চেতনাকে 'emergent-2' বলে গণ্য করতে হবে। সার্ল স্পষ্টতই বলেছেন যে, 'emergent-2' ধর্ম কখনোই পদার্থবিদ্যার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে না, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে চেতনা যদি 'emergent-2' হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে থেকে কি মানস কারণতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, চেতনা যে আমাদের স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে তা আমরা আমাদের ব্যক্তি অনুভবে উপলব্ধি করি। ভৌত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সংশ্লেষিত হবার পর পরবর্তী পর্যায়ে যখন প্রতিক্রিয়া রূপে ফিরে আসে, তখন সেখানে চেতনার আবির্ভাব ঘটে কীভাবে? মস্তিষ্কে সংশ্লেষণের সময় নিশ্চয়ই সেখানে চেতনা প্রভাব বিস্তার করে, না হলে ঐ ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের কারণিক আবদ্ধায়নের নীতির সঙ্গে ভৌত জগত অতিরিক্ত চেতনার কারণিক ভূমিকা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি কোনো একটি ঘটনার কোনো একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, অথচ সেটি যদি প্রতিষ্ঠিত নীতির

বিরোধী হয়, তাহলে কি ঐ নীতিটি রক্ষার জন্য ঐ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা সমীচীন? নাকি নীতির সার্বিকতা বিষয়ে পুনর্বিবেচনা আবশ্যিক?

আমাদের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে হয়তো ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি উঠতে পারে, যেহেতু আমরা স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি নতুন ধর্মের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করছি। সার্লের বিরুদ্ধেও ধর্মদ্বৈতবাদ সমর্থনের আপত্তি ওঠে, তবে সার্ল তা অবশ্যই অস্বীকার করতে চান, কারণ তাঁর মতে, ধর্মদ্বৈতবাদীরা সবসময়ই চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন, কিন্তু, তিনি যেহেতু চেতনার স্বতন্ত্র কারণিক ভূমিকা স্বীকার করেন না, তাই ধর্মদ্বৈতবাদী রূপে তাঁকে গণ্য করা একেবারেই সঠিক নয়। সার্লের মতে, ধর্মদ্বৈতবাদ দ্রব্যের জগতে না হলেও ধর্মের জগতে দুটি স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধে ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে। জড় ধর্ম অতিরিক্ত একটি ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্য তা কোনোভাবেই দ্বৈতবাদের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারবে না। সার্লের মতে, জড় অতিরিক্ত কোনো বিষয় যদি কোনো তত্ত্বে স্বীকৃত হয়, তা সে দ্রব্যই হোক আর গুণই হোক, তাহলে তা কখনোই দ্বৈতবাদের সমস্যাকে এড়াতে পারবে না। তাই সার্ল ধর্মদ্বৈতবাদ পরিহার করতে ব্যগ্র। সার্ল বিজ্ঞান অনুসারে তত্ত্ব নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন আর বিজ্ঞান জড় অতিরিক্ত কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে কখনোই রাজি নয়। তাই সার্ল নিজের তত্ত্বকে ধর্মদ্বৈতবাদ হিসেবে কখনোই মেনে নিতে রাজি নন। (তৃতীয় অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

প্রথাগত কার্তেসীয় দ্বিকোটিক বিভাজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিন্তা করলে আমাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি করা খুবই সঙ্গত, কিন্তু আমরা এই

বিভাজনকেই অস্বীকার করতে চাই। ঐ চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত জড়বাদ ও দ্বৈতবাদের বিভাজন বিষয়েও আমাদের আপত্তি আছে, তাই আমাদের তত্ত্বে দেহ-মনের সম্বন্ধকে আমরা এই বিভাজনের বাইরে বেরিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। ফলে, আমাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে ধর্মদ্বৈতবাদের আপত্তি যথাযথ নয় বলেই মনে হয়। মস্তিষ্কে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি অবশ্যই একটি ভৌত বিষয়। বিজ্ঞান সে কথা স্বীকার করে। মস্তিষ্কের এই তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের কার্যকারিতার ফলে, এমন হতেই পারে যে, সেখানে এমন একটি গুণের উদ্ভব হল যা ভৌত জগতের অন্যান্য পূর্ব পরিচিত গুণ থেকে ভিন্ন। তার হয়তো এমন কিছু কার্যকারিতা আছে, যা ভৌত জগতের অন্য কিছুতে নেই। ঠিক যেমন, জড় ও রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণের ফলে যখন প্রাণের সূত্রপাত হল, তখন সেখানে এমন কিছু গুণের উদ্ভব হল যা জড় জগতের আর কোনো কিছুতে নেই। প্রাণের এমন অনেক ক্রিয়াশীলতা আছে, যা জড় জগতের অন্য কোনো পদার্থে নেই। জড়বাদী বিজ্ঞান তো প্রাণের উদ্ভবকে অস্বীকার করে না। প্রাণের উদ্ভব স্বীকার করতে যদি বিজ্ঞানের আপত্তি না থাকে, তাহলে চেতনার উদ্ভব মানতেই বা আপত্তি কোথায়? বিজ্ঞান, চেতনাকে অস্বীকার করতে চায়, তার মূল কারণ হল কার্তেসীয় জড়বাদী চিন্তা— 'চেতন হল তাই যা জড় নয়'। পদার্থবিদ্যার একাধিপত্যে নির্বিচারে বিশ্বাসী জড়বাদী চিন্তা কাঠামোতে তাই চেতনার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান যেহেতু স্বরূপতঃ প্রগতিশীল, তাই তার স্বীকার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কোনো সীমা টেনে দিলে তা বিজ্ঞানের স্বরূপকেই বিঘ্নিত করবে। পপারকে অনুসরণ করে আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে বিজ্ঞান একসময় বলের অস্তিত্ব স্বীকার করত না, অথচ আজ তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান জগতের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এই

তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ধারণাকেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবীনই বলা চলে। কিছু কিছু জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বিজ্ঞান এইসব ধারণাগুলোকে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বিজ্ঞান যদি তার প্রথাগত চিন্তা কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে এই নতুন নতুন বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তাহলে চেতনাকেই বা কেন বিজ্ঞান স্বীকার করতে পারবে না?

পৃথিবীর আদিকালে, পৃথিবীতে কেবলমাত্র জড় পদার্থ ছিল; রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ক্রমশ বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হল, এগুলি থেকে একদিন প্রাণের বিকাশও ঘটল। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই যে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে এই বিক্রিয়ার যে কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে জড় পদার্থ থেকেই এমন বিষয়ের উদ্ভব ঘটল যা তার উৎপত্তির আগে পূর্বাভাসযোগ্য তো ছিলই না, এমনকি একে কোনোভাবে তার উপাদান কারণে সম্পূর্ণভাবে পর্যবসিত করাও সম্ভব হল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান একে প্রাকৃতিক ঘটনা রূপেই স্বীকার করে নিয়েছে। ঠিক একইভাবে চেতনাও প্রাকৃতিক একটি গুণ, যা স্নায়ুতান্ত্রিক কার্যকারিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি অবধারিত তা হল, চেতনাকে প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে যদি স্বীকার করে নেওয়াও হয়, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, চেতনার সঙ্গে ভৌত জগতের যে সব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সাদৃশ্য আছে, সেগুলো তো সবই ভৌত বৈশিষ্ট্য তাই, চেতনা প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে যখন ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক ধর্মের উপর ক্রিয়া করে, তখন তা

মানসধর্মাবছিন্ন রূপে করে, নাকি ভৌতধর্মাবছিন্ন রূপে করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে অন্তর্মুখী স্নায়ু দ্বারা বাহ্যিক তথ্য মস্তিষ্কে সংশ্লেষিত হবার পর যখন বহির্মুখী স্নায়ুর (motor neuron) মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিক্রিয়া রূপে ফিরে আসে, তখন ঐ প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতার বোধ আমরা অনুভব করি। বাহ্য জগতের থেকে পাওয়া তথ্যে এই উপাদানটি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, মস্তিষ্কে ঐ তথ্যটি সংশ্লেষিত হবার কোনো একটি পর্যায়ে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব, আমরা দাবী করতেই পারি যে, চেতনা মানসধর্মাবছিন্ন রূপে স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া মানুষের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজ থেকে প্রমাণিত হয় যে নিছক ভৌত প্রক্রিয়া বলতে পদার্থ বিজ্ঞান যা বোঝায়, তার অতিরিক্ত কিছু বিষয় নিশ্চিতভাবে সেখানে যুক্ত থাকে। মানুষ যদি কেবলমাত্র যান্ত্রিক স্নায়ুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চালিত হত তাহলে নতুন কিছু সৃষ্টি করার চিন্তা কখনোই তার মধ্যে আসত না। নতুনত্ব বা অভিনবত্বের কোনো প্রসঙ্গই আসত না।

আবার প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি দুটি ধর্মের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ হয়, তাহলে স্নায়ুতান্ত্রিক এই দ্রব্যের জগত কীভাবে প্রভাবিত হয়? দুটি ধর্মের মধ্যে অর্থাৎ একটি চেতন ধর্ম ও একটি ভৌত ধর্মের মধ্যে যখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তখন চেতন ধর্মের প্রভাবে স্নায়ুতান্ত্রিক ভৌত ধর্মটির পরিবর্তন ঘটে। ধর্মের পরিবর্তনে ধর্মীও আবশ্যিকভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলে ভৌত স্নায়ুতান্ত্রিক যে উদ্দীপনাটি মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়েছিল, তা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়ে প্রতিক্রিয়ারূপে দেহাঙ্গে ফিরে যায়। এক্ষেত্রে আমাদের সার্লের পরামর্শ স্মরণে রাখতে হবে। কার্তেসীয় জড় ও

চেতনের দ্বিকোটিক বিভাজনের চিন্তাকে বর্জন করতে হবে, কারণ, তা না হলে দেহ-মনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা দুষ্কর হয়ে উঠবে।

দেহ-মনের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন দরকার। বিজ্ঞান যেমন বল বা বলক্ষেত্রের ধারণাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করেছে, প্রতিষ্ঠিত ভৌত বস্তুর সঙ্গে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভৌত বস্তুর সঙ্গে তার কারণিক সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনই চেতনার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের আরো কিছুটা নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। বলের ধারণা ভৌত জগতের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদার্থবিজ্ঞান যেমন তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে, তেমনি চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বিজ্ঞানের স্বীকার করা উচিত। এই কথা থেকে মনে হতে পারে যে, পদার্থবিজ্ঞানের জগতে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ার অর্থই হল চেতনাকে ভৌত জগতে পর্যবসিত করা, অন্যান্য ভৌত বস্তুর সঙ্গে চেতনার কোনো পার্থক্যকে অস্বীকার করা। কারণ পদার্থবিজ্ঞান তো কেবলমাত্র সেই সব বিষয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করে, যা ভৌত জগতের অধীন। চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পদার্থবিজ্ঞান কখনই অস্বীকৃত নয়, যদি এবং কেবলমাত্র যদি চেতনা ভৌত জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ভৌত জগতের নিয়ম নীতির দ্বারা তা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, ভৌত ধর্মের অতিরিক্ত তার অন্য কোনো ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য না থাকে। পদার্থবিজ্ঞানের এই দাবী যদি মেনে নেওয়া হয় অর্থাৎ, চেতনাকে যদি পদার্থবিজ্ঞানের কারণিক নীতির অনুসারী হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা জড় পদার্থে পর্যবসিত হবে, এবং তার যাবতীয় স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হবে। অন্যদিকে, চেতনা যদি পদার্থবিজ্ঞান স্বীকৃত নীতির অনুসারী না হয়, তাহলে তা বিজ্ঞানের জগতে ব্রাত্য হয়েই

থেকে যাবে; বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে চেতনার আলোচনা করা যাবে না। চেতনা সংক্রান্ত আলোচনা সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনুসারী দার্শনিক আলোচনার পরিমণ্ডলের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। এ এক অদ্ভুত সংকটময় চক্র। এর থেকে মুক্তি না পেলে মনোদর্শনের জগতে চেতনা বিষয়ক আলোচনা বা দেহ-মনের সমস্যার সমাধান কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

এই সংকটময় অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। আমাদের মনে হয়, এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের চিন্তার জগতে দুটি পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রথমত, কার্তেসীয় দ্বৈতবাদী চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। 'যা জড় তা চেতন হতে পারে না' — এই বিশ্বাসকে বর্জন করতে হবে। চেতনাও যে এই জগতের অন্যান্য বস্তুগুলোর মতোই একটি বিষয়, তা মেনে নিতে হবে। অন্যান্য ভৌত বস্তুর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো তার বৈসাদৃশ্য আছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্যও আছে, সেদিকেও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। চেতনা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। প্রকৃতি জগতের সব বিষয়কেই যে সবসময় জড় এবং অজড়র দ্বিকোটিক বিভাজনে বিভক্ত করা যাবে, এমন নয়। এ জগতে অনেক বিষয়কেই যেমন সাদা বা কালো রঙের কোটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, অনেক বস্তুই যেমন ধূসর এলাকাভুক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি দেহ-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও দ্বিকোটিক চিন্তা মুক্ত হয়ে আমাদের এমনই একটি ধূসর এলাকার অনুসন্ধান করতে হবে, যা দেহ ও মনের যোগসূত্র স্থাপনে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়তঃ পদার্থবিজ্ঞানকে আরো কিছুটা নমনীয় হয়ে নিজের গণ্ডিকে চিহ্নিত করতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান ভৌত আর অভৌতর যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তারও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

পদার্থবিজ্ঞান মনে করে যে, এই জগতের সব ঘটনার জড় ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। পদার্থবিজ্ঞান জড় অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বা এই জগতের কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অজড় প্রভাব থাকতে পারে বলেও মনে করে না। 'যা জড় তা চেতন হতে পারে না' — কার্তেসীয় এই দ্বিকোটিক বিভাজন মূলক চিন্তাই যে পদার্থবিজ্ঞানের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তাতে কোনো সংশয় নেই। তবে, এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল ভৌতবাদী চিন্তা বা পদার্থবিজ্ঞান অনুসারী চিন্তা যে কেবলমাত্র জড়-মনের বিভাজনের দ্বারাই প্রভাবিত, তা নয়। কার্তেসীয় দ্বৈতবাদ এই জগতে জড়-মনের দ্বিকোটিক বিভাজনের পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল, মানব-প্রকৃতির দ্বিকোটিক বিভাজন। দেকার্ত মনকে কেবলমাত্র মানব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, ফলে সমগ্র না-মানুষ প্রকৃতি জগতও তাঁর তত্ত্বে মনহীন বা চেতনাহীন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছিল। দেকার্তের এই চিন্তার পিছনে অন্যতম যে কারণটি কাজ করেছে, তা হল যান্ত্রিকতার চিন্তা। দেকার্ত মনে করতেন যে জড়জগত বিশুদ্ধভাবে যান্ত্রিকতার নিয়মের দ্বারা চালিত হয়, যদিও মনোজগত অযান্ত্রিক। যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক দ্বিকোটিক বিভাজন, জড় ও মনকে অতিক্রম করে মানব প্রকৃতির দ্বিকোটিক বিভাজনের পথ প্রশস্ত করেছে। দেকার্তের কাছে দেহ যন্ত্র এবং মন যন্ত্রী; দেহ জাহাজ, মন তার নাবিক। এই নিয়ম মেনে দেকার্ত না-মানুষ প্রকৃতিকে যান্ত্রিক এবং জড় বলে গণ্য করলেন। প্রকৃতি স্থিত মানব ভিন্ন জীবজগৎ তার কাছে 'natural automata' হয়ে গেল। সমগ্র প্রকৃতিতে মানুষই কেবলমাত্র চেতন, অযান্ত্রিক সত্তা রূপে চিহ্নিত হল। মনের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াশীলতা বা কর্মক্ষমতাই দেকার্তকে সম্ভবত এই ধরনের চিন্তায়

উৎসাহিত করেছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের মনের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভের ধারণা পরিস্ফুট হয়, আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তি অভিজ্ঞতাতেই তা অনুভব করি। তাছাড়া যখন আমরা কোনো কাজে সফল হই বা ব্যর্থ হই, অর্থাৎ উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হই বা বিফল হই, তখনও আমরা আমাদের কাজের বা চিন্তার পিছনে যে একটি উদ্দেশ্যের ধারণা লুকিয়ে ছিল, তা অনুভব করি। এখন, দেকার্তের মতে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া করার যোগ্যতা কেবলমাত্র চেতন বস্তুরই থাকতে পারে। জড় জগত তাঁর কাছে উদ্দেশ্যবিহীন যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা চালিত বলে বিবেচিত হয়েছে। দেকার্ত চেতনাকে মনের ধর্ম হিসেবে গণ্য করেছিলেন, আর মনকে মানবজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছিলেন, তাই সমগ্র প্রকৃতি জগত তাঁর দর্শনে মনহীন, চেতনাহীন, যান্ত্রিক জড় পদার্থে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞান কার্তেসীয় এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতিজগতকে জড় এবং যান্ত্রিক বলে স্বীকার করে নিল। বিজ্ঞান চিরদিনই যান্ত্রিকতার সমর্থক। উদ্দেশ্যমূলক কোনো কর্ম প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না কারণ, তা সব সময় ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় আর বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। কার্তেসীয় দেহ-মনের বিভাজন যান্ত্রিক-অযান্ত্রিকের দ্বিকোটিক বিভাজনকে যেমন দর্শনের জগতে নিয়ে এসেছে তেমনি বিষয়-বিষয়ীর (object-subject) ভেদকেও সুদৃঢ় করেছে। বিজ্ঞান সবসময়ই যান্ত্রিক বস্তুনিষ্ঠ জড়জগত নিয়েই কাজ করতে চায় এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ অযান্ত্রিক উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার দ্বারা চালিত সব বিষয়কেই তা 'অবৈজ্ঞানিক' শিরোনামে ভূষিত করে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিধির বাইরে তাদের স্থাপন করতে চায়। প্রকৃতিকে দেকার্ত জড় বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই ধারা মেনে আজকের বিজ্ঞানও প্রকৃতি জগতের সবকিছুকেই জড় রূপে গণ্য করে এবং দাবী করে

যে, যা কিছু প্রাকৃতিক তাই জড়। অজড় প্রাকৃতিক বিষয়ের সম্ভাবনাই বিজ্ঞানের জগতে স্বীকৃত নয়। বিজ্ঞান মনে করে, প্রাকৃতিক বিষয় মাত্রই জড় আর জড় মাত্রই উদ্দেশ্যবিহীন। তাই, বিজ্ঞান প্রকৃতি জগতের মধ্যে যেসব বিষয় উদ্দেশ্যহীন বলে প্রতীত হয়, সেই সব বিষয়কেই প্রাকৃতিক বিষয় রূপে গণ্য করেছে। মানব জগত বা মানব মনও যে প্রকৃতি জগতেরই অঙ্গ, তা বিজ্ঞান মানতে চায়নি। মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম যে অনেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, তা বলাই যায়, কিন্তু মানুষ যে প্রাকৃতিক একটি বিষয়, সে সম্পর্কে কি সংশয় প্রকাশ করা চলে? মানুষ উদ্দেশ্যমূলক চিন্তার অধিকারী হলেও মানুষের অনেক ধর্মই প্রকৃতি জগতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তাছাড়া কার্তেসীয় চিন্তাধারা মেনে বিজ্ঞান ধরেই নিয়েছে যে, প্রকৃতি জগতের কোনো উদ্দেশ্যমুখিনতা বা লক্ষ্যাভিমুখীনতা থাকতে পারে না, প্রকৃতির সৃজনী শক্তিকে তা নিছক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছে। বিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গিও তো প্রশ্নাতীত নয়। বিজ্ঞান যদি কার্তেসীয় এই দ্বিকোটিক বিভাজনমূলক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে প্রকৃতি জগতের বিষয় হিসেবে গণ্য করতে না পারে, প্রকৃতি জগতেরই কোনো কোনো বিষয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যমুখিনতা বা ব্যক্তিনিষ্ঠতার মতো ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করতে না পারে; বিজ্ঞান যদি তার পরিধিকে এত সংকীর্ণ করে রাখে, তাহলে এই জগতের অনেক বিষয়কেই তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

বিজ্ঞান জড় অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না কারণ, বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী। যান্ত্রিকতার তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণবাদের পৃষ্ঠপোষক। তাই নিয়ন্ত্রণবাদকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞান যান্ত্রিকতার তত্ত্বকে সমর্থন করে এবং কার্তেসীয়

যান্ত্রিক-অযান্ত্রিকের বিভাজনকে পরোক্ষে সমর্থন করে, এবং সেই কারণে অজড় অযান্ত্রিক মানস জগতকে বিজ্ঞান উপেক্ষা করতেই বেশি আগ্রহী।

কার্তেসীয় তত্ত্বে মন-প্রকৃতির দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার আরো কারণ আছে। মন বা মনের অধিকারী হিসেবে মানুষকে যদি যান্ত্রিক প্রকৃতি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়, তাহলে তাকে নৈতিক কর্তা হিসেবে গণ্য করা যায় না। নৈতিকতার প্রশ্নের সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার যোগ অনস্বীকার্য। যা নিছক যান্ত্রিক, তা কখনোই স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হতে পারে না। তাই তার কর্মের জন্য নৈতিকভাবে তাকে দায়ী করাও সম্ভব হয় না। মানুষ যদি যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা যাবে না। হয়তো সে কারণেই দেকার্ত মন বা মানুষকে প্রকৃতি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। দেকার্তের কাছে প্রকৃতি হল জড় আর মন বা মনের অধিকারী মানুষ হল অজড়, যদিও মানুষের নিরিখে বিচার করলে, মানুষের দেহ হল জড়, কেবলমাত্র মন হল অজড়।

দেকার্ত দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করার সময় স্বনির্ভর সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। ঈশ্বরকে মুখ্য দ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন তৎকালীন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় জগতকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তেমনি মনকে যুক্তিশীল-চিন্তাশীল দ্রব্য হিসেবে গণ্য করে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার পথও খুলে দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান যুক্তিশীল হয়েই জগতকে বা এই জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্তেসীয় দ্বিকোটিক বিভাজনের ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েই বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞান জড়বাদে

বিশ্বাসী, তাই দেকার্তের মতে, যা কিছু জড় তা বিজ্ঞানের আলোচনাভুক্ত হতে পারে, আর যা অজড় বা জড় জগতের অতিরিক্ত বিষয়, তা বিজ্ঞানের পরিসরে ব্রাত্য বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। বিজ্ঞান মনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছে অথবা তাকে জড় দেহে পর্যবসিত (reduce) করতে চেয়েছে। মনের স্বাতন্ত্র্য বিজ্ঞান কোনোভাবেই স্বীকার করতে রাজি হয়নি। এখন, বিজ্ঞান জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার কারণেই, এই জগতের কিছু বিষয়কে বিজ্ঞানের পরিসর থেকে বাদ দিতে হয়েছে। দেকার্তের তত্ত্ব মেনে মানব-প্রকৃতির বিভাজনকে যদি বিজ্ঞান আত্তীকরণ না করত, তাহলে এই জগতের সব বিষয়কেই প্রাকৃতিক ঘটনা (natural event) হিসেবে গণ্য করতে পারত। বিজ্ঞানের এখন সময় এসেছে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার। দেকার্ত যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তা তাঁর যুগোপযোগী হলেও, আধুনিক যুগের জন্য তা একেবারেই প্রযোজ্য নয়। জড়বাদ বা দ্বৈতবাদ — এই বিভাজনকেও ভেঙে ফেলা দরকার। পদার্থবিজ্ঞান তো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। প্রাকৃতিক বিষয় বলতে দেকার্তকে অনুসরণ করে বিজ্ঞান কেবলমাত্র জড়বস্তুকেই বোঝে, অজড় বস্তু বা জড়বস্তু বলতে সাধারণভাবে যা বোঝা হয়, তার থেকে কিছু ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তু যে প্রকৃতি জগতের অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে, তা যেন বিজ্ঞানের জগতে ভাবাই যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান যদি জড়বাদী দৃষ্টিকোণ বর্জন করে প্রকৃতিবাদী (naturalistic) দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করতে পারে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যাবে।

এই প্রকৃতি জগতে যা কিছু আছে, যা কিছুকে আমরা অভিজ্ঞতায় পেয়ে থাকি, যা কিছু এই জগত থেকে সৃষ্ট হচ্ছে, তাই প্রাকৃতিক বিষয়। প্রাকৃতিক যে কোনো

বিষয়ের সঙ্গে যে কোনো বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা যেতেই পারে। জড় আর অজড় বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি হয়, এক্ষেত্রে তা আর থাকবে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান যদি নিজের পরিধিকে প্রসারিত করে এবং সব প্রাকৃতিক বিষয়কেই নিজের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে সমস্যা কোথায়? এইভাবে চিন্তা করলে যদি বিজ্ঞানের জগতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, বরং বিজ্ঞান যদি এই জগতের বিভিন্ন ঘটনার সুসংহত ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাহলে জড়বাদ বর্জন করে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করাই বিজ্ঞানের পক্ষে বেশি যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো বিষয় প্রাকৃতিক হলেই কি পদার্থবিজ্ঞান তাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে? চেতনাকে যদি প্রকৃতি জগতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে কী সুবিধা হবে? পদার্থবিজ্ঞানের নীতি রক্ষা করে কি তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর নঞর্থক হওয়াই স্বাভাবিক। তাহলে চেতনাকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন কি? এতে সুবিধাই বা কি হবে? পদার্থবিজ্ঞান কেবলমাত্র সেইসব বিষয়কেই ব্যাখ্যা করতে চায় যা তার অন্তর্ভুক্ত। সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি নিজের প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত তত্ত্ব বা নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হয়, তাহলে তা সে করতে রাজি আছে। বলের (force) দৃষ্টান্ত দিয়ে পপার তা দেখিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান একসময় মনে করত যে আলো হল কতগুলো কণার সমাহার (photon particles) পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন আলোকে যদি কণার সমাহার হিসেবে না দেখে তরঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে আরো অনেক বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। পদার্থবিজ্ঞান এই যুক্তি অনুসরণ করে আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করল,

আলোর প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটাল। এখন পদার্থবিজ্ঞান কেন এই পরিবর্তন স্বীকার করে নিল? নতুন তরঙ্গতত্ত্বের দ্বারা এমন অনেক বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হল, যা এতদিন কণা তত্ত্বের দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না। পদার্থবিজ্ঞান ঐ অব্যাখ্যাত বিষয়গুলিকে নিজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে বলে, তাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়ও তার আছে বলে মনে করে এবং প্রয়োজনে সে নিজের তত্ত্ব বা নীতির পরিবর্তনেও পিছপা হয় না। সুতরাং চেতনাকে যদি পদার্থবিজ্ঞান নিজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে তাকে ব্যাখ্যা করার দায় সে অনুভব করবে এবং এই ব্যাখ্যার উপযোগী নীতিও প্রণয়ন করবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যপঞ্জী

1. McFadden, J. 2002. The Conscious Electromagnetic Information (Cemi) Field Theory : The Hard Problem Made Easy? *Journal of Consciousness Studies.* 9(8) : 45-60.
2. Popper, K. 1996. *Knowledge and the Body-Mind Problem : In Defence of Interaction.* London : Routledge.
3. Searle, J. R. 2002. *The Rediscovery of the Mind.* Cambridge, MA: MIT Press.
4. Searle, J. R. 2004. *Mind : A Brief Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

গ্রন্থপঞ্জী

Alexander, Samuel. 1920. *Space, Time and Deity.* New York : Dover Publication.

Aristotle. 1993. *De Anima.* D. W. Hamlyn. trans. Oxford : Clarendon Press.

Armstrong, D. M. 1968. *A Materialist Theory of the Mind.* London: Routledge.

Beckerman, A., Flohr. H. and Kim. J. eds. 1992. *Emergence or Reduction?: Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism.* New York : Walter de Gruyter.

Bedau, M. 1997. Weak Emergence. *Philosophical Perspectives*. 11:375-399.

Block, Ned. 1980. Troubles with Functionalism. in *Readings in Philosophy of Psychology.* Vol. 1. ed. Ned Block, 268-305. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Broad, C. D. 1925. *The Mind and Its Place in Nature.* London : Routledge and Kegan Paul.

Brooks, Eugene M. 2007. The Identity Theory and Refutation of Searle's Major Objections. *Imagination, Cognition and Personality.* 20 (1-2) : 117-138.

Campbell, D. T. 2013. Downward Causation in Hierarchically Organised Biological Sysem. *ECO Issue.* 15(3) : 139-151.

Carnap, R. 1991. Logical Foundations of the Unity of Science. in *The Philosophy of Science,* ed. R. Boyd, P. Gasper, J. D. Trout. 393-404. Cambridge : MIT Press.

Caston, Victor. 1997. Epiphenomenalism, Ancient and Modern. *The Philosophical Review.* 106(3) : 309-363.

Chalmers, D. 1997. *The Conscious Mind.* Oxford : Oxford University Press.

———. 2006. Strong and Weak Emergence. in *The Re-Emergence of Emergence.* eds. P. Clayton and P. Davis. 244-254. Oxford : Oxford University Press.

Churchland, Paul. 1998. *Matter and Consciousness.* Cambridge, MA : MIT Press.

Corcoran, K. 2001. Trouble with Searle's Biological Natualism. *Erkenntnis.* 55 :307-324.

Darwin, Charles. 1859. *On the Origin of Species.* Washington Square : New York University Press.

Davidson, D. 2013. Mental Events. in *Essays and Actions and Events.* 207-225. Oxford : Clarendon Press.

Dennett, D. C. 2017. *From Bacteria to Bach and Back : The Evolution of Minds.* New York : W. W. Norton & Co.

Descartes, R. 1986. *Meditation on First Philosophy with Selections from the Objections and Replies.* trans. John Cottingham. Cambridge : Cambridge University Press.

Dicker, G. 1993. *Descartes : An Analytical and Historical Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

Feigl, H. 1958. The 'Mental' and the 'Physical'. in *Concepts, Theories and the Mind-Body Problem.*Vol. 2. ed. H. Feigl, M. Scriven, G. Maxwell. Minessota : Minnesota Studies in Philosophy of Science.

Fodor, J. 1974. Special Sciences. *Synthese.* 28: 97-115.

Freeman, W. J. and Skarda, C. A. 1991. Mind/Brain Sciences : Neuroscience on Philosophy of Mind. in *John Searle and His Critics.* eds. E. Lepore and R. V. Gullick. 115-127. Oxford : Oxford University Press.

Garrett, B. J. 1995. Non-reductionism and John Searle's The Rediscovery of the Mind. *Philosophy and Phenomenological Research.* 55(1) : 209-214.

Halden, E. S. and G. R. T. Ross. 1955. *The Philosophical Works of Descartes.* USA : Dover Pub.

Hannay, A. 1991. Consciousness and the Experience in Freedom. in *John Searle and His Critics.* ed. E. Lepoire and R. V. Gulick. 129-139. Oxford : Blackwell.

Hare, R. M. 1952. *The Language of Morals.* Oxford : Oxford University Press.

Hemple, C. 1980. The Logical Analysis of Psychology. in *Reading in Philosophy of Psychology.* ed. Ned Block. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hornsby, J. 1993. Agency and Causal Explanation. in *Mental Causation.* J. Heil and A. Mele. eds. 161-189. Oxford : Oxford University Press.

———. 1997. *Simple Mindedness : In Defense of Naïve Naturalism in the Philosophy of Mind.* Cambridge, MA : Harvard University Press.

Horst, Steven. 2007. *Beyond Reduction*. Oxford : Oxford University Press.

———. 2008. Naturalism in Philosophy of Mind. *Philosophy Compass.* 4(1) : 219-254.

Huxley, T. H. 1898. *Method and Results : Essays by Thomas H. Huxley.* New York : D. Appleton and Company.

Hyslop, A. 1998. Methodological Epiphenomenalism. in *Australasian Journal of Philosophy* 76 : 61-70.

Jackson, F. 1982. Epiphenomenal Qualia. *Philosophical Quarterly.* 32 : 127-136.

———. 2002. What Mary Didn't Know. In *The Nature of Consciousness : Philosophical Debates.* ed. Ned Block, O. Flanagen, G. Guzeldere. 567-570. Cambridge, MA : Bradford Book.

Kim, J. 1984. Epiphenomenal and Supervenient Causation. *Midwest Studies in Philosophy*. 9:257-70.

———. 1989. The Myth of Nonreductive Materialism. *Proceedings and Address of the American Philosophical Association*. 63:31-47.

———. 1993. *Supervenience and Mind : Selected Philosophical Essays*. Cambridge : Cambridge University Press.

———. 1993. The Nonreductivist's Trouble with Mental Causation. in *Mental Causation*. J. Heil and A. Mele eds. 189-210. Oxford : Oxford University Press.

———. 1995. Mental Causation in 'Searle's Biological Naturalism'. *Philosophy and Phenomenological Research.* 55 (1) : 189-194.

———. 1996. *Philosophy of Mind.* Boulder : Westview Press.

———. 1998. *Mind in a Physical World : An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation*. Cambridge, MA : MIT Press.

———. 2006. Being Realistic about Emergence. in *The Re-Emergence of Emergence.* eds. P. Clayton and P. Davis. 189-202. Oxford : Oxford University Press.

———. 2008. Making Sense of Emergence. in *Emergence : Contemporary Readings in Philosophy and Sciences.* eds. M. Bedau and P. Humphreys. 127-153. London : MIT Press.

Kripke, S. A. 1980. *Naming and Necessity.* Cambridge, MA : Harvard University Press.

Leibniz, G. W. 1968. *The Monadology and Other Philosophical Writings.* Trans. Latta Robert. London : Oxford University Press.

Lindahl, B. I. B. and Arhem, P. 1994. Mind as a Force Field : Comments on a New Interactionist Hypothesis. *J. Theo. Biol.* 171 : 111-122.

Loemker, L. eds. 1969. *Philosophical Papers and Letters.* 2nd ed. Dordrecht : Reidel.

Marras, Ausonio. 1994. Nonreductive Materialism and Mental Causation. *Canadian Journal of Philosophy*. 24(3):465-493.

Mason, H. T. (ed. and trans.) 1967. *The Leibniz-Arnauld Correspondence.* Manchester : Manchester UP.

McFadden, J. 2002. The Conscious Electromagnetic Information (Cemi) Field Theory : The Hard Problem Made Easy? *Journal of Consciousness Studies.* 9(8) : 45-60.

McLaughlin, Brian P. 2008. The Rise and Fall of British Emergentism. in *Emergence : Contemporary Readings in Philosophy and Science*. eds. M. Bedau and P. Humphrey. 19-59. London : MIT Press.

Mill, J. S. 1843. *A System of Logic.* 8th Edition. London : Longmans, Green, Trench, Turbner and Co.

Moore, G. E. 1922. *Philosophical Studies.* London : Routldge.

Morgan, L. 1923. *Emergent Evolution.* London : William and Norgate.

Morris, M. and Parkinson, G. H. R. eds. and trans. 1973. *Philosophical Writings.* London : Dent.

Nagel, E. 1961. *The Structure of Science.* New York : Harcourt, Brace and World.

Nagel, T. 1974. What Is It Like to Be a Bat?. *The Philosophical Review.* 83(4) : 435-450.

———. 1986. *The View from Nowhere.* New York : Oxford University Press.

Nath, S. 2013. Resolution of Some Problems in the Identity Theory. *IQSR Journal of Humanities and Social Science.* Vol. 10(5).

Neurath, O. 1931. Physicalism : The Philosophy of Vienna Circle. in *Philosophical Papers 1913-1946.* eds. R. S. Cohen and M. Neurath. 48-51. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company.

Novotny, D. 2007. Searle on the Unity of the World. *Axiomathes.* 17 : 41-51.

Papineau, David. 2001. The Rise of Physicalism. in *Physicalism and Its Discontents*. eds. C. Gillett and B. Loewer. Cambridge : Cambridge University Press.

Place, U. T. 1954. The Concept of Heed. *British Journal of Psychology.* 45 : 243-255.

———. 1956. Is Consciousness is a Brain Process?. *British Journal of Psychology.* 47-50.

Plato. 1875. *Phaedo.* E. M. Cope. trans. Cambridge, MA : Cambridge University Press.

Popper, K. R. 1978. Natural Selection and Emergence of Mind. *Dialectica*. 32(3-4):339-355.

———. 1979. *Objective Knowledge : An Evolutionary Approach*. Oxford : Clarendon Press.

———. 1985. *The Self and its Brain.* London : Springer International.

———. 1996. *Knowledge and the Body-Mind Problem : In Defence of Interaction*. London : Routledge.

———. Lindahl, B. I. B, Arhem, P. 1993. A Discussion of the Mind-Brain Problem. *Theoretical Medicine*. 14 : 167-180.

———, K. R., Eccles, J. C. 1985. *The Self and its Brain*. London : Springer International.

Putnum, H. 1967. The Nature of Mental States. In *Art, Mind and Religion.* ed W. H. Capitan, D. D. Merill. USA : Pittsburg University Press.

Putnum, H. 1980. Brains and Behavior. In *Readings in Philosophy of Psychology.* ed. Ned Block. Vol. 1. ed. Ned Block, 24-36. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ryle, G. 1949. *The Concept of Mind.* London : Hutchinson.

Sabates, Marcolo H. 1999. Consciousness, Emergence and Naturalism. *Teorema.* 18(1):139-153.

Searle, J. R. 1983. *Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind.* Cambridge : Cambridge University Press.

———. 1990. Is the Brain's Mind a Computer Programme? in *Science Journal (USA).* 262(1) : 26-31.

———. 1995. Consciousness, the Brain and the Connection Principle : A Reply. *Philosophy and Phenomenological Research.* 55(1) : 217-232.

———. 1998. *The Mystery of Consciousness.* London : Granta Books.

———. 2002a. *The Rediscovery of the Mind.* Cambridge, MA : MIT Press.

———. 2002b. Why I Am Not a Property Dualist. *Journal of Consciousness Studies.* 9 (12) : 57-64.

———. 2003. *Minds Brains and Science.* Cambridge, MA : Harvard University Press.

———. 2004. *Mind : A Brief Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

Sellar, W. 1962. Philosophy and the Scientific Image of a Man. in *Frontiers of Science and Philosophy.* ed. Robert Colodny,35-78. Pittsburg : University of Pittsburg Press.

Sinari, R. 2001. Reflections on John Searle's Philosophy of Consciousness. *Journal of ICPR.* 18(3) : 91-106.

Smart, J. J. C. 1959. Sensation and Brain Process. *Philosophical Review.* 63: 141-156.

Smith, Barry. ed. 2003. *John Searle*. New York : Cambridge University Press.

Sosa, E. 1984. Body-Mind Interaction and Supervenient Causation. *Midwest Studies in Philosophy.* 9:271-81.

Sperry, R. 1969. A Modified Concept of Consciousness. *Psychological Review.* 76:532 – 536.

———. 1980. Mind-Brain Interaction : Mentalism, Yes; Dualism, No. *Neuroscience*. 5:195-206.

———. 1991. In Defense of Mentalism and Emergent Interaction. *The Journal of Mind and Behavior*. 12(2) : 221-246.

Spinoza, B. 1986. *Ethics and On the Correction of the Understanding*. Trans. Andrew Boyle. London : Everyman's Library.

———. 2016. *Ethics (1677) in the Collected Works of Spinoza*. ed. and trans. Edwin Curley. Princepton : Princepton University Press.

Strawson, P. F. 1959. *Individuals*. London : Routledge.

Taylor, R. 1963. *Metaphysics,* Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall.

Thomas, Janice. 2014. *The Minds of the Moderns : Rationalism, Empiricism and Philosophy of Mind*. New York : Routledge.

VanGulick, R. 1993. Who's in Charge Here? And Who's Doing All the Work? in *Mental Causation*. J. Heil and A. Mele. eds. 233-258. Oxford : Oxford University Press.

———. 2001. Reduction, Emergence and Other Recent Options on the Mind-Body Problem : A Philosophic Overwiew. *Journal of Consciousness Studies.* 8(9-10) : 1-34.

Walton, M. 1989. The Knowledge Argument Against the Knowledge Argument. *Analysis.* 49 : 158-160.

Watson, J. B. 1919. *Psychology from the Standpoint of a Behaviorist.* Philadelphia : Lippincott Co.

বসু, সৌতি। ২০১০। যান্ত্রিকতাবাদ ও মন/প্রকৃতির দ্বৈতবাদ : বিষয়মুখিনতাবাদীর প্রতিক্রিয়া। *দর্শনবীক্ষা*। ২০(২) : ১৭-২৮।

———। ২০১৭। নৈতিক জগতে বিমূর্ত নীতির সীমাবদ্ধতা। *রবীন্দ্রভারতী জার্নাল অব ফিলজফি।* ১৮ : ১৩৩-১৪৬।

মিত্র, চ্যাটার্জী ও সরকার সম্পা.। ২০০৩। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

চক্রবর্তী, সোমনাথ। ২০০৩। আচরণবাদের আচরণদর্শন। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

মুখার্জী, সুমিতা। ২০০৩। আচরণবাদ : ওয়াটসন। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।

মিত্র, পুষ্পা। ২০০৩। চরম আচরণবাদ এবং বি এফ স্কিনার। *মনোদর্শনঃ শরীরবাদ ও তার বিকল্প*। সম্পা. মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার। কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অসীমা প্রকাশনী।